ইতিহাস গ্রন্থমালা ৪

প্রধান সম্পাদক অশীন দাশগুপ্ত
সহযোগী সম্পাদক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম

একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

রমাকান্ত চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

ISBN 81-7215-504-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০.০০

ভূমিকা

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ আমি রাখতে পেরেছি বলে আমি কিছুটা সুখী। অথচ আত্মতৃপ্তি সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করা যায় না। বিষয়টি বেশ জটিল এবং কঠিন। বৈষ্ণব-তত্ত্ব-প্রসঙ্গ একবারও যদি আসে, তবে তা যেন আর শেষ হতে চায় না। অথচ, তত্ত্বও যে আপেক্ষিক তাও তো ভুলে গেলে চলে না। গৌড়বঙ্গে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। অথচ, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে এই মানুষকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। সমাজে সংসারে এ ধর্মের গতি-প্রকৃতি এবং তাৎপর্য-নির্ণয় গৌণ হয়ে পড়ে। ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্ররূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই গৌণ বিষয়টির দ্বারা আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এই গ্রন্থে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তার ঔচিত্য অনৌচিত্য ভাল-মন্দ বিচারের ভার পাঠকদের উপরেই রয়েছে। দশ বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে আমি ইংরেজি ভাষায় একটি বই লিখেছিলাম। এই বই ঠিক তারই সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ নয়। বিগত দশ বৎসরে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে দেশে বিদেশে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এই বইতে তার উল্লেখ যথাসম্ভব করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় নূতনভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রমাণকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই পাদটীকা দিতে হল। পাদটীকা যাতে কাঁটা না হয়ে ওঠে, তাও দেখতে হয়েছে। ঋণ করে তা যথাস্থানে যথাকালে স্বীকার না করা, কুম্ভিলক-বৃত্তি ঘৃণ্য অপরাধ। আমি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কোনও বিশেষ মতবাদকে, কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে হেয় করে তুলতে চাইনি। আমি সর্বদা তথ্যের পায়ে পায়ে চলতে চেষ্টা করেছি। কোনরূপ 'সাব্‌জেক্‌টিভ' অথবা অধ্যাত্মীয় মূল্যায়ন আমি করতে চাইনি। বৈষ্ণবধর্মের বেশ কিছু গৌণ ধারা ছিল। কয়েকটি এখনও আছে। অধুনা কয়েকজন গবেষক এ সব গৌণ ধারা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় গবেষণা করেছেন। কিন্তু লক্ষ করেছি, এ সব গৌণ ধারার নেতিরাচক মাত্রাগুলোকে তাঁরা তাঁদের মূল্যায়নের বাইরে রাখেন। আমি এইরূপ পদ্ধতির সমর্থক নই।

অধ্যাপক ড. অশীন দাশগুপ্ত, ড. উমা দাশগুপ্ত, এবং ড. রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় আমাকে এই রচনায় প্রবৃত্ত করেছেন। অধ্যাপক ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় বইটি লিখবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন। রচনাটির কিছু কিছু অংশ আমি শ্রীনিখিল সরকারকে, অধ্যাপক বাসব সরকারকে, অধ্যাপক ড. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে,

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তীকে, এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সীকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। অধ্যাপক ড. বিজিতকুমার দত্ত এই রচনাটি পড়েছেন, এবং কতগুলো ক্ষেত্রে দোষত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেছেন। তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড'—সংস্থা বইটির মুদ্রণের ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সংস্থাটিকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের দেশে বৈষ্ণবীয় গবেষণার পথিকৃৎ ছিলেন অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক শ্রীহরিদাস দাস। আমার এই সামান্য রচনাটি আমি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করি।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

কলিকাতা
মার্চ ১৬, ১৯৯৫

সূচি

প্রথম অধ্যায় :	প্রাচীন ও আদি মধ্যকালে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন মাত্রা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	চৈতন্যের আবির্ভাবের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত	২০
তৃতীয় অধ্যায় :	ভক্তির সামগ্রিক অর্থ এবং বঙ্গে ভক্তি প্রচারের পদ্ধতি	৩০
চতুর্থ অধ্যায় :	চৈতন্য সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য	৪১
পঞ্চম অধ্যায় :	প্রধান গোস্বামিগণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৫২
ষষ্ঠ অধ্যায় :	গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন	৫৮
সপ্তম অধ্যায় :	বৃন্দাবনে এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার : অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ এবং গোপালগণ	৭১
অষ্টম অধ্যায় :	খেতুরি উৎসব : পটভূমি, প্রস্তুতি এবং তাৎপর্য	৮৩
নবম অধ্যায় :	পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ	৯৬
দশম অধ্যায় :	পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ	১০৮
একাদশ অধ্যায় :	কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ	১১৮
দ্বাদশ অধ্যায় :	বৈষ্ণব গুরুবাদ এবং তার বিভিন্ন মাত্রা ও তাৎপর্য	১৩১
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	জাত বৈষ্ণব প্রসঙ্গ	১৪৩
চতুর্দশ অধ্যায় :	কীর্তনের ক্রমবিকাশ	১৫১
পঞ্চদশ অধ্যায় :	মূল্যায়ন	১৬৬
নির্ঘণ্ট		১৭৭

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ও আদি মধ্যকালে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন মাত্রা

প্রাচীনকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল। তার একাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কালে উৎকীর্ণ অন্তত পঁয়ত্রিশটি প্রত্নলেখতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ দেখা যায়।[১] কয়েকটি প্রত্নলেখ বিখ্যাত, যথা :

৩০০ খ্রিস্টাব্দ। রাজা চন্দ্রবর্মণের প্রস্তরলেখ। বাঁকুড়া।
৪৩২-৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ। ধনাইদহ তাম্রলেখ। রাজশাহী।
৪৭৬-৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ। দামোদরপুর তাম্রলেখ। দিনাজপুর।
৫০০ খ্রিস্টাব্দ, প্রথমার্ধ। মল্লসারুল তাম্রলেখ। বর্ধমান।
৫০৭ খ্রিস্টাব্দ। গুণাইঘর লেখ। ত্রিপুরা।
৮১২ খ্রিস্টাব্দ। খালিমপুর লেখ। মালদহ।
১০২৪ খ্রিস্টাব্দ। মূর্তিলেখ। বাঘাউড়া। ত্রিপুরা।
১০০০ খ্রিস্টাব্দ। দেওপাড়া লেখ। রাজশাহী।
১১০০ খ্রিস্টাব্দ। বেলাভা লেখ। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

বিবিধ নামমুদ্রায় বৈষ্ণবমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। বগুড়া জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুরের প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে কৃষ্ণলীলার বিবিধ ঘটনা উৎকীর্ণ হয়েছিল। বঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে বরাহ-অবতারের, বামন-অবতারের, মীন-অবতারের, পরশুরামের এবং বিষ্ণুর মূর্তি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বহু গ্রামে বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রত্নলেখসমূহে বিভিন্ন ব্যক্তির বৈষ্ণবীয় নামের উল্লেখ আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কালসীমায় রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট মাত্রারূপে প্রচলিত ছিল। গুপ্তবংশের সম্রাটগণ বঙ্গে ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ গঠনের সূত্রপাত করেন। পূর্বকাল থেকে প্রচলিত লোকধর্মের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণরাই বৈষ্ণব উপাসনাকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করেছিলেন। শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, এবং বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল। এ সব ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। 'পঞ্চোপাসনা' শব্দটির

অর্থ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য, গণেশ—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা। বঙ্গে পঞ্চোপাসনার শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রত্নলেখসমূহে ধৃত প্রমাণ থেকে আবার এমনও মনে হয় যে, পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় ছিল। রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপ্তি দুর্নির্ণেয়। দক্ষিণ বিহারে গয়া অবতার পূজনের একটি কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সব শ্রেণীর লোক বৈষ্ণবধর্মের সমর্থক কিংবা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজন্যবর্গ, বণিক্‌গণ, সরকারি কর্মচারিগণ বিশেষভাবে বিক্রমপুর পরগণার বারুজীবিগণ বিষ্ণুর অথবা তাঁর কোন অবতারের উপাসক ছিলেন। কোথাও কোথাও বিষ্ণুর পূজার জন্য বঙ্গের বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে আসা হয়েছিল।

অন্তত সেনবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালেও বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ভাব তেমন কিছু স্পষ্ট ছিল না। অথচ বল্লাল্‌ সেন[২] 'দানসাগর' গ্রন্থে 'ভাগবতপুরাণ'-এর উল্লেখ করেছেন। দৈত্যনিসূদন বিষ্ণুর পূজা গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার একটি উপাদানরূপে গ্রাহ্য ছিল। কখনও কখনও সুপ্রাচীন 'ব্যূহবাদ'-এর প্রভাব কিছুটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। 'ভাগবত'-ধর্মও অভিজাত মহলে অথবা শাসকশ্রেণীতে কিছুটা জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ত্রিপুরা জেলার ময়নামতিতে প্রাপ্ত রণবঙ্কমল্লের তাম্রলেখে ধর্মের অনুষঙ্গে "সহজ" শব্দটির ব্যবহার থেকে এমনও ভাবা যায় যে, সহজিয়া বৈষ্ণবতারও কোনও একটি ক্ষীণ ধারা ছিল। হয়ত বৌদ্ধ "সহজযান"-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ভাগবত মতবাদের সঙ্গে অবতারবাদের সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন প্রত্নলেখে বৈষ্ণব ব্যক্তি-নামের ব্যবহারে অবতারপূজন প্রমাণিত হয়। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লেখে [৮৭১ খ্রিস্টাব্দ] বামনাবতার উল্লিখিত হয়েছেন। ঢাকা জেলার তিন জায়গায় প্রাচীন বামনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃসিংহ-পূজনও জনপ্রিয় ছিল। এই পূজায় 'ভক্ত' প্রহ্লাদের পৌরাণিক কাহিনীর প্রেক্ষিতে, ভক্তির ভাব অনুমান করা যায়। ঢাকা, দিনাজপুর, এবং রাজশাহীতে নৃসিংহ-মূর্তি পাওয়া গেছে। সম্ভবত দশম থেকে দ্বাদশ শতকে বরাহাবতার পূজন জনপ্রিয় হয়। এ সময়ের বরাহমূর্তি পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গে, মুর্শিদাবাদে, এবং বর্ধমানে। পূর্বে উক্ত পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে কৃষ্ণলীলার কোনও কোনও ঘটনা উৎকীর্ণ হলেও, শাসকশ্রেণী কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে মনে হয় না। নারায়ণগঞ্জের কাছে বেলাভাতে প্রাপ্ত একটি লেখে "গোপীশতকেলিকার" কৃষ্ণ উল্লিখিত হয়েছেন। এই লিপির তারিখ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক। এখানে রাজা ভোজবর্মণ হরির "বন্ধু"-রূপে বর্ণিত হয়েছেন। তাতে পরবর্তীকালে প্রচারিত "সখ্য"-ভাব সামান্যভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ঢাকা জেলারই কেওর গ্রামে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ শতকের বিষ্ণুমূর্তি-লেখে "সালোক্য" শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়।

বৈষ্ণবরা বুদ্ধদেবকেও বৈষ্ণব-অবতাররূপে শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গে ধর্মীয় সমন্বয়ের আদর্শ জনপ্রিয় ছিল। বণিক-জ্যেষ্ঠ ঋভুগুপ্ত একই সময়ে বিষ্ণুর ও শিবের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লেখতে বুদ্ধ এবং বিষ্ণু বন্দিত হয়েছেন।

বিজয়সেন বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী ও পার্বতীর মূর্তি স্থাপন করেন। হরিহরমূর্তির পরিকল্পনায় এবং ধ্যানে বৈষ্ণব শৈব ধর্মীয় সমন্বয় সুস্পষ্ট।

এ সব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীন ও আদি মধ্যকালীন বঙ্গে বৈষ্ণবতা কিছুটা জনপ্রিয় হলেও কৃষ্ণের পূজা তেমন কিছু ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। "গোপীজনবল্লভ" কৃষ্ণ রাজাদের অথবা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা সর্বদা সমানভাবে পাননি। তাই লেখসমূহে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ নগণ্য। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য কিংবা অভিজাত-সংস্কৃতি "গোপীভর্তা" কৃষ্ণপূজনের অনুকূল ছিল বলে মনে হয় না।

২

কিন্তু ক্রমশ কৃষ্ণই অসামান্য হয়ে উঠলেন। তার কারণসমূহ কিছুটা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণেয়। যাকে "হিন্দু-বিশ্ব" বলা হয়, তাতে এক সময়ে জঙ্গীবাদ যথেষ্ট প্রবল ছিল। আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকে শুরু করে লক্ষ্মণসেনের পরাজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালে ভারতীয় উপমহাদেশে কত যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তার সংখ্যা স্থিরভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। অথচ বলা হয় যে, আধ্যাত্মিকতা, "শান্তরস", ভারতীয় "হিন্দু"-সভ্যতার প্রাণবস্তু! ক্রমশ জঙ্গীবাদের ঐতিহ্য দুর্বল হয়ে যায়। বহু রাজ্যের ও রাজবংশের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা প্রথমে লুণ্ঠনের, পরে রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এলেন। হিন্দু রাজারা এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারলেন না। জাতীয় জীবনে অবসাদের ছাপ পড়ল। বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্যে হয়তো তা কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মূল সুর নিয়ে এল।

মুসলমানদের আক্রমণের কালে সমাজব্যবস্থা ছিল স্থৈতিক। ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য। অথচ, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা গেল। ধর্মে যে কী সাংঘাতিক বিকার দেখা গেল, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন খাজুরাহোর কৃষ্ণ মিশ্র যতি তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক চমৎকার নাটকে। "ভারতীয় ফিউডাল ব্যবস্থা" যতই দৃঢ়মূল হল, ততই "বৈদিক" ব্রাহ্মণ্যতার সঙ্গে অবৈদিক ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠল।

অথচ যৌনতা-সংক্রামিত গুহ্য যোগ-সাধনা অভিজাতশ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পায়। পূর্বভারতে এই সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন "সিদ্ধ"রূপে পরিচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ। ধর্মের সঙ্গে অবারিত যৌনতা যে কী ভাবে মিশ্রিত হয়েছিল, তা খাজুরাহোর, কোণার্কের, ও পুরীর মন্দিরে নির্লজ্জ মিথুনশিল্পে দেখা যায়।

বহু কবি সুললিত সংস্কৃত ভাষায় দেবদেবীদের নৈশ জীবনের কাব্যিক বিবরণ দিলেন। জয়দেবের সমসাময়িক বঙ্গীয় কবি গোবর্ধন আচার্য সাত শত আদিরসাত্মক 'আর্যা' রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় এ-ধরনের এতো কবিতা

কোনও একজন কবি তাঁর পূর্বে রচনা করেননি। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে দৈত্যনিসূদন "চক্রস্বামী" বিষ্ণুর চেয়ে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের বেশি জনপ্রিয়তা সুনিশ্চিত ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত প্রসঙ্গত স্মরণীয় ; তিনি লিখেছিলেন :[৩]

> তখন আর্য্যজাতিব জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে...ভারত দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ...রাজপুরীসকলে নূপুরনিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের আলোচনার পরিবর্ত্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দের গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি।

এখানে 'আর্য্যজাতি'র স্থানে 'বাঙালি' পড়তে হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসরচয়িতা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় এটা দেখিয়েছেন যে, বর্ণাশ্রম-আদর্শ ক্রমশ দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছিল[৪]। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন কঠোরভাবে ধারানিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রেম ও বিবাহ-প্রাতিলৌম্য তত্ত্বদ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। 'মুক্ত প্রেম' নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাই 'ক্লাসিক্যাল' সংস্কৃত সাহিত্যে পৌরাণিক প্রেমকথা, দেবদেবীলীলা প্রধান্য পেতে থাকল। শ্রুতকীর্তি শিল্পরসিক ডব্লু. জি. আর্চারও অনেকটা এ রকম কথাই লিখেছেন।[৫] দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির মতে আদিরসের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে অভিজাত শাসকশ্রেণীর এক বিশেষ ভাবাদর্শের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।[৬] এই প্রসঙ্গে এ তথ্য অবশ্যই স্মরণীয় যে, প্রাকৃত ভাষায় যৌন ব্যঞ্জনাবহ বহু গাথা ও বজ্রা পূর্বে রচিত হয়েছিল।

কৃষ্ণ সুপরিচিত ছিলেন। মহাভারতে তিনিই প্রধান চরিত্র। কিন্তু কৃষ্ণের গোপিনী-প্রণয়িনী রাধা প্রথমে সামান্য ভাবে উল্লিখিত হলেন হাল-সংকলিত তিনটি প্রাকৃত গাথাতে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন :[৭]

> রাধা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যাহা কিছু প্রাচীন তথ্য রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় সাহিত্যকে অরলম্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার ; সাহিত্যাদি হইতে উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে রাধার ধর্মমতের ভিতরে প্রবেশ।

সেন-বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে রামানুজসৃষ্ট 'শ্রী'-সম্প্রদায় এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তার পূর্বেই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সেন-রাজারা কানাড়া থেকে বঙ্গে এসেছিলেন। এমনও হতে পারে যে, তাঁরাই দাক্ষিণাত্য থেকে নূতন বৈষ্ণব মতাদর্শ বঙ্গে নিয়ে আসেন। 'ভাগবতপুরাণ' তাঁদের রাজত্বকালেই বঙ্গে প্রচলিত হয়। এই পুরাণ বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়েছিল। অবশ্য রাঢ়ে বঙ্গে রামানুজের অথবা তাঁর মতাবলম্বী আচার্যদের চিন্তাধারার প্রচলনের কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস নেই। কিন্তু কবি জয়দেব যে নিম্বার্কের মতাবলম্বী গুরুপরম্পরায় স্থান লাভ করেন,

এরূপ প্রসিদ্ধি রয়েছে।

অবহট্ট সাহিত্যে কৃষ্ণকথা কিছুটা প্রচলিত ছিল। জয়দেব কি অবহট্ট সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেন ? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাঙালি রূপে পরিচিত হলেও কেউ কেউ ভেবেছেন যে তিনি উড়িষ্যার কিংবা মিথিলার কবি ছিলেন। তাঁর উপরে 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের প্রভাব, তাঁর কাব্যে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর প্রভাব, প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীকালে ভক্ত-বৈষ্ণবরা 'গীতগোবিন্দ'কে ভক্তিগ্রন্থরূপেই শ্রদ্ধা করেছেন। এই কাব্যে তাঁরা ভক্তির, এবং ভক্তি থেকে উৎসারিত মধুর রসের ব্যঞ্জনা দেখেছিলেন। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, জয়দেব আদিরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে রতিবন্ধ পর্যন্ত আভাসে উল্লিখিত হয়েছে।[৮]

জয়দেবের সময়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিবরণমূলক লোকগীতিও গাওয়া হত। একটি সুভাষিত শ্লোকে তার বিবরণ এইরূপ :[৯]

> খুব শীত পড়েছে ; রাস্তায় ধর্মার্থীরা শততালি-দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছে। ভোররাতে সুমিষ্ট সুরে তারা রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রেমের গীত গেয়ে নগরের মানুষদের ভোর বেলার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে।

অন্তত একাত্তরজন সুভাষিত রচয়িতার নাম আছে, যাঁরা বিষ্ণু, লক্ষ্মী, হরি, কৃষ্ণ, রাধা, এবং বিষ্ণুর অবতারদের সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করেছিলেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-সংকলনে কুলশেখর নামক কবি-রচিত বৈষ্ণবীয় সুভাষিতে ভক্তির ভাব সুস্পষ্ট। রূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' সংকলনে অভিনন্দ, গোবর্ধন আচার্য, চক্রপাণি, দাক্ষিণাত্য, পুরুষোত্তমদেব, লক্ষ্মণসেন, বনমালী, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের শ্লোকও রেখেছেন। অজ্ঞাতনামা বহু কবি বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং অবতারদের সম্বন্ধে শ্লোক লিখেছিলেন।

জয়দেবের প্রধান কৃতিত্ব এই ছিল যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে তিনি একটি সম্পূর্ণ এবং সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় ঐশ্বরিক ও মানবিক প্রেমের সংমিশ্রিত প্রকাশের কোনও প্রাচীনতর ঐতিহ্য ছিল না ; তাই 'গীতগোবিন্দ' প্রথমে প্রাকৃত ভাষায়, অথবা 'পাশ্চাত্য অপভ্রংশ' ভাষায়, কিংবা 'পুরাতন' রাংলা ভাষায় রচিত হয়। তাঁকে সমর্থন করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এটা নিতান্তই অলস অনুমান। 'পাশ্চাত্য' অপভ্রংশ, 'পুরাতন' রাংলা, এবং 'প্রাকৃত' গীতগোবিন্দ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। 'পবিত্র' সংস্কৃত ভাষায় আদিরসাত্মক অশ্লীল কবিতা কিছু কম লেখা হয়নি। এ বিষয়ে জয়দেব পুরাতন ধারার অনুবর্তন করেছেন।

৩

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বহু বৈষ্ণব উপপুরাণ রচিত

হয়। এ সব পুরাণের নাম 'আদি পুরাণ' 'কল্কিপুরাণ' 'ক্রিয়াযোগসার' ('পদ্মপুরাণ'-এর অন্তর্গত) 'নরসিংহপুরাণ' 'সাম্বপুরাণ' 'ভবিষ্যোত্তর' ('ভবিষ্যপুরাণ'-এর পঞ্চম অংশ) 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' 'বিষ্ণুধর্ম'।

এ সকল উপপুরাণ সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কিংবা হিন্দু ধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের সমর্থকগণ এ সকল পুরাণ রচনা করেন।[১০] বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্যকে তাঁরা মিশ্রিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অধিকারসমূহের পুনর্মূল্যায়ন এবং যথাসম্ভব সংস্থাপন তাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব ধর্মকে এবং বৈষ্ণবীয় জীবনধারাকে সামাজিক সমন্বয়ের পদ্ধতিরূপে নির্বাচিত করা হয়েছে। 'বিষ্ণুধর্ম'-এ লেখা হয়েছে যে, বস্তুবাদী এবং অবৈদিক মতাদর্শের প্রভাবে হিন্দুসমাজের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল; শূদ্রদের প্রভাব বেড়েছিল। অব্রাহ্মণরা ধর্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখতে পারছিলেন না। বৌদ্ধ হেতুবাদ হিন্দুদের সংস্কারসমূহকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এই অবস্থায় বৈষ্ণব 'যোগ'-এর প্রচার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

সম্ভবত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হেতুবাদের উপপ্লবকে রোধ করার জন্যই বৈষ্ণব উপপুরাণ সমূহে পূজা, ব্রত, আচার-অনুষ্ঠানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা *acculturation*-এর, অথবা সাংস্কৃতিক উপযোজনের সমর্থক ছিলেন।[১০ক] বৈষ্ণব ধর্মকে এই উপযোজনের পদ্ধতিরূপে ব্যবহার করা হয়। 'ভবিষ্যোত্তর পুরাণ'-এ বহু ব্রতানুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মে আদ্যন্ত কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায়। তার ব্যতিক্রম কিছুটা 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ দ্রষ্টব্য। কিন্তু 'ভাগবতপুরাণ'-এ ভক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। একাধিক বৈষ্ণব উপপুরাণে 'দাস্যভাব' গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অর্বাচীন 'আদি পুরাণ'-এ 'মধুর ভাব' প্রচারিত হয়েছে। সম্ভবত এ সব 'ভাব'-এর মৌল উৎস ছিল 'ভাগবতপুরাণ'।

পৌরাণিক বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রচারিত হল। অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ বৈষ্ণব পূজন পদ্ধতি সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। বল্লাল সেনের গুরুরূপে প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অনিরুদ্ধ ভট্ট রচনা করেন 'ভাগবততত্ত্বমঞ্জরী'। হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর দুইটি রচনা; একটি 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'; অপরটি 'বৈষ্ণবসর্বস্ব'। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য রচিত হয়েছিল 'বেদবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত রহস্য'। এমনও ভাবা হয়েছে যে, একটি বিশিষ্ট আর্য-ধর্মরূপে বৈষ্ণব ধর্ম শ্রীহট্টে এবং অসমে প্রচারিত হয়।

মুসলমানদের আগমনের আগে এবং তার কিছু পরেই, পূর্বভারতে যেমন ছিল ধর্মসমন্বয়ের ভাবনা, তেমনই ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা। বৌদ্ধ 'কালচক্রতন্ত্র'-এ, এবং তার 'বিমলপ্রভা' নামক টীকায়, বৌদ্ধ দেবতা কালচক্রের নেতৃত্বে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে হিন্দু-বৌদ্ধ একতার প্রস্তাবনা দেখা যায়। অথচ,

'নিষ্পন্নযোগাবলী' নামক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক নিবন্ধে প্রধান হিন্দু দেবদেবীদের বৌদ্ধ দেবতাদের পদতলেই স্থান দেওয়া হল।[১১] ওদিকে শৈবরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য লোককল্যাণমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি পৃষ্ঠপোষকতার উপরে নির্ভরশীল ছিল; পৃষ্ঠপোষকতার আঞ্চলিক চরিত্রও ছিল। ধনী জমিদারগণ শৈব-শাক্ত ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক। বৈশ্যরা বৌদ্ধ ধর্মকে সমর্থন করেন। লোকসংস্কৃতিতে কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী সমানভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিলেন। পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্য ধর্মীয় সহাবস্থানকে অর্থপূর্ণ করে। একটি মত অনুসারে শাক্ত তন্ত্র থেকেই বৈষ্ণব ধর্মে মাতৃদেবতা রাধার রূপকল্পনা আসে।[১২]

৪

দ্বাদশ শতক থেকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পর্যন্ত কালে পূর্বভারতে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের প্রধান উৎস সমকালীন সাহিত্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, মূর্তিশিল্প ও স্থাপত্য থেকে এ সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।[১৩]

প্রথমে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কথা আলোচ্য। একটি প্রামাণিক সংকলনে বিদ্যাপতি-রচিত ব্রজবুলি পদের সংখ্যা ৯৩৩।[১৪] এ সকল পদের বিষয় প্রেম, রাধাকৃষ্ণ, এবং শিবপার্বতী। সুকুমার সেনের মতে বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতির ভাষা ব্রজবুলি বিদগ্ধ বৈষ্ণব কবিতার এবং প্রেমের কবিতার ভাষা হয়ে উঠেছিল। অসমে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের কালে (১৪৪৯-১৫৫৮), এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের শাসনকালে (১৫০৪-১৫৩২) সেই দুই প্রদেশে ব্রজবুলি প্রচলিত হয়। জন্মসূত্রে মৈথিল হলেও বিদ্যাপতি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিলেন। ব্রজবুলিকে বঙ্গীয় ভাষারূপে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার ও কবিতার ইতিহাসে বিদ্যাপতির স্থান অতি বিশিষ্ট।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন কি না, এমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এমন ধারণা ছিল যে, তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন। তাঁর পদাবলিতে 'কৃষ্ণ' শব্দটি মাত্র একবার দেখা যায়। 'মাধব' শব্দটি আছে ১৭৫টি পদে। ৪৯৮ এবং ৪৯৯ সংখ্যক পদে রাধা নিজের প্রেমিককে 'পতি' এবং 'সামি' রূপে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মনে হতে পারে যে, বিদ্যাপতি মাধবের পরকীয়া রতি শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করেননি। অথচ, রাধাই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত নায়িকা। কোনও কোনও পদে মাধব পরমেশ্বর। অথচ, শিবপার্বতীও অবহেলিত হননি। পদাবলীতে সংস্কৃত অলঙ্কারের অথবা কান্তিবিদ্যার প্রভাবও সুস্পষ্ট। পৌরাণিক প্রভাবও রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, বিদ্যাপতির 'রাধা' ছিলেন মিথিলার রাজাদের শুদ্ধান্তঃপুরের কোনও সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা, অথবা যুবতী রমণী। বিদ্যাপতির ভাষায় এবং কবিতার গঠনে ব্রাহ্মণ্যতা এবং আভিজাত্য সুস্পষ্ট। নিছক প্রেমের কবিতারূপেও বিদ্যাপতির কোনও কোনও রচনা খুব সুন্দর। "কত মধু যামিনী

রভসে গমাওল/না বুঝল কৈসন কেল/লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল/তেও হিয় জুড়ন না গেল ॥" এই বিখ্যাত পদ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য :[১৫]

> প্রেমের দুরবগাহ মহিমা ও আকর্ষণের সুরটি এই কবিতায় যেরূপ আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিসমূহের মধ্যে স্থানলাভের উপযুক্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে 'ভাগবতপুরাণ'-এর একটি প্রাচীন পুথি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে 'বিদ্যাপতের্লিপিরীয়ম্'। এটা বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতার একটি প্রমাণ হতে পারে ; কিন্তু তা প্রশ্নাতীত প্রমাণ নয়। প্রশ্নাতীত প্রমাণ বার্ধক্যে কবির প্রার্থনা :

> মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
> দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
> দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥

প্রকৃত বৈষ্ণব না হলে মাধব ও হরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদনমূলক এমন ভাবালু পদ রচনা করা সম্ভব হত না।

বিদ্যাপতির কালে অন্যান্য মৈথিল কবিরা ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন। জয়দেব শ্রীরাধার কতগুলো বিশেষ অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন। ব্রজবুলি পদাবলীতে শ্রীরাধার অবস্থার, এবং অবস্থা অনুসারে প্রকৃতির বৈচিত্র্য অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল। তাতে নিশ্চয় অভিজাত কান্তিবিদ্যার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণের একটি কাব্যিক 'আর্কিটাইপ্', আদিমরূপ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সুস্পষ্ট হল। এই আদিম রূপের উৎস ছিল লোকসংস্কৃতি। অভিজাত কান্তিবিদ্যা, এবং 'ভাগবতপুরাণ'-এ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত, এই পুরাণের শ্রীধর স্বামী-রচিত ভাষ্যে প্রকটিত, এবং ক্রমশ প্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করল।

৫

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের দুইটি প্রধান মাত্রা ছিল। একটি মাত্রা ছিল পঞ্চোপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈষ্ণবীয় কর্মকাণ্ড ; অপর মাত্রা ছিল বৈষ্ণব গান ও কবিতা।

বৈষ্ণবীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানা রকমের দার্শনিক মতের এবং ধর্মশাস্ত্রের সংযোগ ছিল। পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান বিষয় ছিল অনুষ্ঠান। ব্যতিক্রম ছিল 'ভাগবতপুরাণ'। কেউ কেউ সূত্রাকারে ভক্তির তত্ত্বও লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'নারদ' নামক পৌরাণিক চরিত্র এবং শাণ্ডিল্য।

ইতিহাসের আলোচনায় বৈষ্ণব গান ও কবিতা উপেক্ষণীয় নয়। সাধারণ লোক

'কানুর গীত' গাইত। সম্ভবত রাই আর কানুর প্রেম নিয়ে পুতুলনাচও দেখানো হত। গ্রামের নাম ছিল 'রামকেলি', 'কানাইনাটশাল'। যে রাই-কানু মাটির কাছাকাছি ছিল, তাদের নিয়ে রচিত ধারাবাহিক গীতিকাব্যের একটি বড় উদাহরণ বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই কবির কাল ও পরিচয় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কাল ধরে বিতর্ক চলেছে। এক সময়ে এই ধারণা ছিল যে, এক চণ্ডীদাসই অনেক হয়ে বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হওয়ার পরে সে ধারণা আর রইল না।[১৬] তারপরেও যাঁরা এক এবং অভিন্ন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের তত্ত্বটিকে ধরে রইলেন, তাঁদের সঙ্গে পাণিনির তুলনা করে বলা হল :

> [অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে। শ্বানম্ যুবানম্ মঘবানমাহ ॥]
> অশেষবিৎ পাণিনি একই সূত্রদ্বারা কুকুরকে, যুবককে, এবং ইন্দ্রকে বুঝিয়েছেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আবিষ্কৃত পুঁথিটির প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও তার ভাষাকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "Early middle Bengali" রূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৭] বিদ্যাপতির পদাবলীতে যে বিদগ্ধতা পরিস্ফুট, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ তা দেখা যায় না। এখানে কৃষ্ণ এক দর্পিত গ্রাম্য তরুণ ; রাধা সরলা গ্রাম্য তরুণী। রচনাটির গ্রাম্যতা পরবর্তীকালের বিদগ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা এই কীর্তনকে অবহেলা করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁরা এই কীর্তনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের বাসুলীপূজার সংযোগ দেখিয়েছেন। বাসুলী অবৈষ্ণব তান্ত্রিক দেবী। বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে বঙ্গে কোথাও কোথাও এমন তান্ত্রিক পূজন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যাতে রাধাকৃষ্ণের মিলনের বর্ণনামূলক আদিরসাত্মক গান গাওয়া হত। বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছেন :[১৮]

> অঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।
> গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে ॥
> কপট কোপ করী রাধা নাগরী গোআলী।
> বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী ॥
> যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে
> রাধাঞ্চ করিল এবেঁ তেহেন দুগুণে ॥
> মনমথ বঁসে রাধা তেজিল লাজে ॥

যৌনমিলনের বর্ণনা স্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে। নিষিদ্ধ যৌন-সম্পর্ক নিয়ে রচিত "কৃষ্ণধামালী" উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের গান গাওয়ার ধর্মীয় অনুষঙ্গ একাধিক তন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু গানকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন, এবং 'দান', 'নৌকা', 'ভার', 'বিরহ' প্রভৃতি পালায় তাদের পারম্পর্য বজায় রেখেছিলেন। এ সব পালা পরবর্তী পদাবলীতেও দেখা যায়।

ব্রজবুলি এবং বাংলা ভাষায় যখন রাধাকৃষ্ণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন,

তখন কৃষ্ণলীলার বর্ণনামূলক সংস্কৃতকাব্য 'হরিচরিতকাব্যম' রচনা করেছিলেন চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য।[১১] তেরোটি সর্গবিশিষ্ট এই কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে 'ভাগবতপুরাণ'-এর শ্রীধর স্বামী-রচিত ভাষ্যে ব্যাখ্যাত ভক্তি ক্রমশ সঞ্চারিত হয়। তাঁরা লোক-সাহিত্যের এবং তান্ত্রিক-পৌরাণিক সাধনা-সম্মত কৃষ্ণকে ভক্তির আলোকে নূতন ভাবে দেখলেন। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি মালাধর বসু-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে অথবা 'ভাগবতপুরাণ'-এ বর্ণিত ঘটনাবলীর বাংলা ভাষ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[১০] বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামের মালাধর বসু সুলতান রুক্নুদ্দীন বরবক্ শাহের [১৪৫৯-১৪৭৪] দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতান তাঁকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়েছিলেন। "ভাগবতপুরাণ"-এর সংস্কৃত ভাষা বেশ শক্ত ; তা পড়ে বোঝার ক্ষমতা সাধারণ বাঙালিদের ছিল না। অথচ এই পুরাণটির প্রচলন শিক্ষিত বৈষ্ণবগণ চেয়েছিলেন। মালাধর তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। তবে সকলেই যে ভক্তির তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, এমন তথ্য নেই। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :[২১]

গীতা ভাগবত যে যে জনে পড়য়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

রামায়ণও জনপ্রিয় ছিল। বঙ্গীয় রামায়ণরচিয়তা কৃত্তিবাসের কাল সম্পর্কে বিতর্ক আছে। এখনকার কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে সশ্রদ্ধ ভক্তির ভাব দেখা যায়, মূল রচনায় তার কতটুকু ছিল তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার (১৭৭৫-১৮৬৪) কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংশোধন করেন। এখন সেই সুমার্জিত রামায়ণই বাজারে চলে।

সূত্রের উল্লেখ

১· বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Ramaranjan Mukherjee, Sachindra Kumar Maity, ed. *Corpus of Bengal Inscriptions* (Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967); S. C. Mukherjee, *A Study of Vaisnavism in Ancient and Mediaeval Bengal* (Calcutta, Punthi Pustak, 1966); Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal: 1486-1900* (অতঃপর VIB) (Calcutta, Sanskrita Pustak Bhandar, 1985); Shyamacharan Chakravarti *The Vaisnava Cult* [Rajshahi, Varendra Research Society Monograph No. 4, July, 1930]; জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পঞ্চোপাসনা' (কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০) ; Ramesh Chandra Mujumdar, ed. *The History of Bengal,* Vol. I Hindu Period (Patna, N.V. Publications Reprint 1971) pp. 400 ff. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal* (Calcutta, Indian Studies, Past and Present, 1967)

২· Bhavatosh Bhattachaya, ed. *Danasagara of King Vallala Sen,* [Calcutta, The Asiatic Society, 1956] Fasciculus 4, pp. 1-21; আলোচনা : রমাকান্ত চক্রবর্তী, "শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষাপট" ; জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চৈতন্য-প্রসঙ্গ' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১-৩০

৩· যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২, (কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২য় সং, ১৩৬৩) পৃ. ৯০৫

৪· Surendranath Dasgupta, Sushil Kumar De, ed. *A History of Sanskrit Literature: Classical Period* (Calcutta University, Calcutta, 1962) Introduction, p. *xxxii*

৫· W. G. Archer, *Loves of Krishna* [London, George Allen And Aunwin, 1957) p. 73

৬· D.D. Kosambi, V.V. Gokhale ed. *Subhasitaratnakosa of Vidyakara* (Cambridge, Massachusetts, 1957) দ্রষ্টব্য : "Introduction"

৭· শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' (কলিকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ৩য় সং ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১০৩

৮· জয়দেব, 'গীতগোবিন্দম্' (বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৯) ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' (কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৬, ২৪-২৫, ৬৮-৭০ ; Sunitikumar Chatterji, *Jayadeva* (New Delhi, Sahitya Akademi, 1973)

৯· *Subhasitaratnakosa,* উপরে উক্ত, শ্লোক ৯৮০ ; রচয়িতা, কবি ডিম্বোক।

১০· R.C. Hazra, *Studies In the Puranic Records on Hindu Rites and Customs* [Delhi, Motilal Banarsidas, 2nd ed. 1975); R.C. Hazra, *Studies In the Upapuranas,* 2 Vols. [Calcutta, Calcutta Sanskrit College, 1958-63)

১০ক· লৌকিক ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যে স্থান দেওয়া এইরূপ উপযোজনের একটি উদ্দেশ্য ছিল।

১১· Biswanath Banerjee, ed. *Sri Kalacakra Tantraraja* (Calcutta, The Asiatic Society, 1985) : "লোকধাতুপটলঃ"—শ্লোক, ১৫৯-১৬০, ১৬২-১৬৬ ; B. Bhattacharya, ed. *Nispaanayogavali* (Baroda, Gaekwad Oriental Series, 1949), Introduction, pp. 20-22

১২· R.S. Sarma, "Material Milieu of Tantricism", *Indian Society: Historical Probings: Essays in Honour of D. D. Kosambi,* R.S. Sarma, ed. (New Delhi, People's Publishing House, 1974) pp. 188-89

১৩· Rakhaldas Banerjee, *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* (Delhi, Archaeological Survey of India, New Series, Vol. 47) p. 127

১৪· খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, 'বিদ্যাপতি পদাবলী' (কলিকাতা, সনৎকুমার মিত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)

১৫· তদেব, পৃ. ৪৭২-৭৩

১৬· বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা-৫৮, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

১৭· Sunitikumar Chatterji, *Origin and Development of the Bengali Language* (London, George Allen & Unwin, Ltd. 2nd ed. 1970) Vol. I pp. 128-29; সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, 'পদকল্পতরু' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ) ৫, পৃ. ৮৯-১০৭ ; সুকুমার সেন, 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' (কলিকাতা, রূপা এন্ড কোং, ১৯৭০) পৃ. ১৭০-২০০

১৮· 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', পৃ. ২৯১-৯২

১৯· Sivaprasad Bhattacharya, ed. *Haricaritam of Caturbhuja* (Calcutta, The Asiatic Society, 1967). চতুর্ভুজ গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে বাস করতেন।

২০· মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪)

২১· বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' [অতঃপর চৈ-ভা] (কলিকাতা, সুচারুকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস, ষষ্ঠ সং, ১৩৫৬ বঙ্গীব্দ) পৃ. ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্যের আবির্ভাবের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

চৈতন্যের আবির্ভাবকালে সাধারণভাবে বঙ্গের এবং বিশেষভাবে নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক অবস্থা এখন আলোচ্য। ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা চৈতন্যকে "ঐতিহাসিক" ব্যক্তিরূপে বিচার করেন না। তাঁদের মতে চৈতন্য ছিলেন মানুষের রূপধারী ঈশ্বর। কিন্তু ইতিহাসকে বাদ দিলে চৈতন্যকে বোঝা যায় না। তাঁর ইতিহাস প্রধানত সাংস্কৃতিক-সামাজিক ইতিহাস।

প্রথমেই ধর্মের কথা আসে। পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসও জনপ্রিয় ছিল। তান্ত্রিক সাধনা ব্যাপকভাবে জনসমর্থন লাভ করে। বঙ্গীয় তান্ত্রিকদের "গৌড়" সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ ছিল। নেপাল থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তান্ত্রিক পরিমণ্ডল "বিষ্ণুক্রান্তা"রূপে পরিচিত ছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণ জগদানন্দ শর্মা রচিত 'কৌলিকার্চনদীপিকা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "গৌড়মার্গ" আঠারোটি দেশে প্রচলিত ছিল। "বিষ্ণুক্রান্তা" শব্দটির ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে।[১] কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্ভবত চৈতন্যের সমকালীন নবদ্বীপের এক বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃহৎ তন্ত্রসার'-এ তান্ত্রিক ধর্মের পূর্ণ বিবরণ আছে। এখানে বৈষ্ণব ধর্মেরও এমন একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে যা তান্ত্রিকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। বিশেষভাবে তান্ত্রিক ভাবানুসারে মূর্তির রূপ কথনের জন্য এ গ্রন্থ এখনও সমাদৃত হয়। যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল এই যে, 'বৃহৎ তন্ত্রসার'-গ্রন্থে বামাচারভিত্তিক সাধনার, এবং ভৈরবীচক্রের বিবরণ সামান্য ভাবেই আছে ; তার কোনওরূপ প্রাধান্যের কথা বলা হয়নি। নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সম্ভবত বামাচারী পঞ্চ 'ম'-কারাত্মক তান্ত্রিকতা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়নি। কিন্তু জনসমর্থিত বিভিন্ন 'কাল্ট' (Cult) তান্ত্রিক ভাবধারা ও ক্রিয়াকাণ্ডদ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রমাণস্বরূপ পূর্বোক্ত বাসুলী পূজনের উল্লেখ করা যায়। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন ;[২]

বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল ॥

নবদ্বীপ নগরে বহু জায়গায় তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দেবীর অথবা মাতার পূজা করা হত। এ সব জায়গার বিবরণ দিয়েছেন কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, এবং কুমুদনাথ মল্লিক।[৩]

মনসা, চণ্ডী, ধর্ম— এই তিনটি ছিল সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় 'কাল্ট'। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে বিপ্রদাস নামক কবি 'মনসাবিজয়' রচনা করেন।[৪] মনসার সঙ্গে চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। মনসা, চণ্ডী এবং লক্ষ্মী সুকুমার সেনের মতে এক সময়ে এক দেবী ছিলেন। পুরোহিতদের বাদবিতণ্ডার ফলে তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন।[৫] মনসা ও চণ্ডীর মতো মঙ্গলচণ্ডীও গৃহস্থদের দ্বারা পূজিত হতেন। ধর্মের অথবা ধর্মরাজের আসল পরিচয় বিতর্কিত।[৬] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্ম ছিলেন লোকস্তরে বুদ্ধাবতার। শরৎচন্দ্র রায় ভেবেছেন যে, ধর্ম ছিলেন সৌর দেবতা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ধর্ম ছিলেন কূর্ম। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধর্মকে বরুণ ভেবেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, ধর্মের উপাসনা ছিল আদিম সূর্যোপাসনা। ধর্মকে গ্রামাঞ্চলের আরক্ষক দেবতারূপেও দেখা যেতে পারে। তৃণমূলস্তরে ধর্মের কোনও শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যতা ছিল না। সাধারণত ডোম জাতির 'পণ্ডিত'রাই ধর্মপূজায় পৌরোহিত্য করতেন। চণ্ডীর পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য উপাসনায় এ সব লোকধর্মের বিরোধিতা করা হয়নি। তার কারণ ছিল এই যে, লোকধর্ম বর্ণব্যবস্থার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। হিন্দু সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই তৃণমূলস্তরে যাদু বিশ্বাস ভিত্তিক গ্রামদেবতাদের পূজা পঞ্চদশ শতকে যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। স্মার্ত পণ্ডিতরাও তখন সাংস্কৃতিক উপযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। জীমূতবাহন অশ্লীল "শবরোৎসব"কেও তাঁর 'কালবিবেক' নামক নিবন্ধে স্বীকার করেন। শূলপানি তাঁর 'দুর্গোৎসববিবেক'-নিবন্ধে এই অশ্লীল ধর্মাচারকে মেনে নেন। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ কুক্কুটী মর্কটী, সূতিকাষষ্ঠী, পিপিতকী প্রভৃতি অবৈদিক ব্রতানুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেন। তার কারণরূপে ব্রাহ্মণদের আর্থিক স্বার্থ উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু আর্থিক স্বার্থের উপরেও ছিল সাংস্কৃতিক উপযোজনের কিছু প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিত ছিল ইসলাম ধর্ম-প্রচার। উপযোজনের দ্বারা অবৈদিক 'কাল্ট'কে, ব্রতানুষ্ঠানকে, হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হল।

২

চৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তী জীবনীলেখকগণ সর্বদা এটাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর আবির্ভারের একটি সামাজিক কারণ ছিল। তাঁদের এইরূপ ধারণার অবশ্যই একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল। হিন্দু সদাচার তান্ত্রিক কৌলাচারের অভিঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। হিন্দুসমাজের নৈতিক বাঁধন যতই দুর্বল হয়ে পড়ে, ততই নব্যস্মৃতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এটাও সত্য যে, সচেতনভাবেই নব্যস্মৃতির প্রধান সংকলক ও ভাষ্যকার রঘুনন্দন কোনও কোনও

ক্ষেত্রে স্মৃতির বিধানকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা শিথিল করেন। কিন্তু স্মার্ত কর্মকাণ্ড একটুও শিথিল হয়নি। বিস্ময়কর ঘটনা হল এই যে, বাংলার সুলতানগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিগণ স্মার্ত হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেননি। স্মার্ত কর্মকাণ্ড এবং সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন একে অপরের পরিপূরক ছিল বলে মনে হয়। নবদ্বীপের মুসলমান কাজির সঙ্গে যে স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দুদের সুসম্পর্ক ছিল, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।[৭] এই অবস্থাতেই স্মার্ত কৃত্যের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, এবং ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে ধনী হিন্দুদের উদ্বৃত্ত অনুপার্জিত অর্থ ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন :[৮]

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥

নবদ্বীপের সংস্কৃতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক মাত্রা ছিল নব্যন্যায়। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে নব্যন্যায়ের অধ্যাপকগণ 'পাষণ্ডী'-দের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। নব্যন্যায়চর্চামূলক জীবনধারায় নব্যস্মৃতির প্রতি আনুগত্য থাকলেও বৈষ্ণবীয় ভক্তির কোনও স্থান ছিল না। নব্যন্যায়ের উদ্ভাবক ছিলেন মিথিলার পণ্ডিত উদয়নাচার্য। তাঁর 'কিরণাবলী' গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি ন্যায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে মিশ্রিত করেছেন। ১৪৩০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ত্রিশজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ন্যায়নিবন্ধ রচনা করে নব্যন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উন্নত গণিতের সঙ্গে নব্যন্যায়ের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু তার পরিভাষা ছিল দাঁতভাঙ্গা, যথা :[৯]

শক্যার্থ ; তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ; বাপ্যব্যাপকত্ব ;
প্রতিপক্ষভাবনা ; পূর্ণাহন্তাবিমর্শ ; স্বসমানাধিকরণদুঃখপ্রাগভাবা—
সমানকালীকত্ব ; সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষ ; জন্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতা ;
স্বাশ্রয়ধ্বংসব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিযোগিমাত্রবৃত্তি দুঃখত্ব ॥

অবশ্য এটা ঠিক যে নব্যন্যায়ে বাস্তবতা অগ্রাহ্য হয় না, এবং নব্যন্যায় চর্চায় বৈচারিক বুদ্ধি ক্ষুরধার অর্জন করে। আস্তিক্যই নব্যন্যায়ে প্রস্তাবিত হয়েছে। নব্যন্যায় নানাবিধ দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু তাতে অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপিত

হয়নি। নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে যাঁদের বিশিষ্ট অবদান স্বীকৃত হয়েছে, তাঁদের কি কোনও বিজ্ঞানচেতনা ছিল ? ভক্তির যুক্তি নব্যন্যায়ে স্বীকৃত না হলেও বর্ণজাতিভেদের অযৌক্তিকতা নব্যন্যায় মেনে নিয়েছে। ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে নব্যন্যায় কোনও প্রশ্ন তোলেনি। এমন বিশ্বাসও ছিল যে, নব্যন্যায়ে ব্যুৎপত্তি না থাকলে অর্থবহ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করা যায় না। নব্যন্যায়ে কোনও সামাজিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩

ইসলম ধর্মাবলম্বীগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলেন। তার ফলে পূর্বকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের যে প্রতিপত্তি ছিল, তা আর রইল না। একটা উল্লম্ব গতির [Vertical Mobility]-র চিহ্ন সুলতান শাসিত বঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তার ফলে শূদ্রদের "প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ এ তথ্য আছে যে, কোনও শূদ্র ধর্মীয় গুরুরূপেও বরণীয় হয়েছিলেন।[১০] গণেশের এবং জালাল্-উদ্-দীন্-এর সময় (১৪১৪-১৪৪১) থেকেই কায়স্থগণ আমলাতন্ত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। হোসেন শাহী সুলতানদের রাজত্বকালে ভূমির উপরে কায়স্থ ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল্ ফজল্-এর বিবরণ অনুসারে ষোড়শ শতকের শেষদিকে অনেক বঙ্গীয় ভূস্বামী ছিলেন কায়স্থ।[১১]

কায়স্থরা শূদ্র ছিলেন। তাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি যত বাড়ল, ততই ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়তো কমল। এইরূপ পরিস্থিতিতে রঘুনন্দন তাঁর 'শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্'-এ সদম্ভে ঘোষণা করলেন এক অদ্ভুত দ্বিজাতিতত্ত্ব।[১২] তিনি ঘোষণা করলেন,—কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অন্য কোনও বর্ণের অস্তিত্ব মানা যাবে না। শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার থাকবে না। ব্রাহ্মণদের অথবা "দ্বিজ"দের "শুশ্রূষা" করাই শূদ্রদের প্রধান ধর্মীয় কৃত্য হবে। অন্য এক স্মার্ত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার লিখলেন,— ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রা রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে ব্রাহ্মণের কোনও দোষ হবে না ; কিন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিবাহ করে, তবে শূদ্রের কঠিন শাস্তি হবে।[১৩] শূদ্ররা গুরু হতে পারবেন না, কিন্তু গোপালের ও শিবের পূজা করতে পারবেন। শূদ্রদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের দানগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রদের ক্রিয়াকাণ্ডে যোগদান করলে ব্রাহ্মণ "শূদ্রযাজী"রূপে পতিত হতেন। উনিশ শতকের শেষ দিকেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারও কারও এইরূপ শূদ্রবিরোধী মনোভাব ছিল।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে স্ত্রীলোকদের মানবিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি।[১৪] জীমূতবাহন স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি বিক্রয়ের কিংবা বন্ধক রাখার অধিকার মানেননি। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে স্ত্রীলোকরা সম্পত্তির অধিকার পেতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সম্পত্তি নিছক উপহাররূপে গণ্য হত। রঘুনন্দন অবশ্য সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন না। স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র পাঠের অধিকারও ছিল

না। অথচ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পরিত্যাগ করা যেত। পিতৃকেন্দ্রিক ও পুরুষের সার্বভৌমত্বসূচক পারিবারিক সংগঠনে "পাতিব্রত্য"ই ছিল বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম। "পাতিব্রত্য"-এর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এইরূপ :[১৫]

> পতিব্রতা স্ত্রী সকালে-উঠে শাড়ি বদ্‌লে সর্বপ্রথম
> স্বামীকে প্রণাম করে স্তবপাঠ করবেন। তার পর গৃহকার্য
> সেরে স্নান করবেন। স্নানান্তে শুচিবস্ত্র পরিধান করে
> সাদা ফুল দিয়ে ভক্তিভরে স্বামীকে পূজা করবেন।
> স্বামী স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরে উচ্চাসনে বসলে
> স্ত্রী আহ্লাদপূর্বক তাঁর চরণদুটি ধুয়ে দেবেন এবং
> কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা, সর্বাঙ্গে
> সুগন্ধ দ্রব্য মাখিয়ে যথাসম্ভব পাদ্য অর্ঘ্য উপচার
> ও অমৃতোপম ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করতে দেবেন...
> অতঃপর ভক্তিভরে পান করবেন স্বামীর পাদোদক।

৪

চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল সমগ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। 'আদি' নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। এমনও ভাবা হয়েছে যে, চৈতন্য যে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তার অনেক অংশই এখন গঙ্গা নদীর গর্ভে রয়েছে। নবদ্বীপের কাছে ছিল বিখ্যাত বন্দর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র সপ্তগ্রাম। তার সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন বিপ্রদাস, ভ্রমণকারী রাল্ফ্ ফিচ্, এবং সির্জার্ ফ্রেডারিক্।[১৬] ষোড়শ শতকের মধ্যভাগেই সপ্তগ্রাম বন্দর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু নবদ্বীপ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি।

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। নিম্নজাতির মানুষরা ছিলেন প্রাথমিক উৎপাদক। বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের শাঁখারী, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, বাদ্যকর, সর্পদংশনের চিকিৎসক মালো বৈদ্য, ভাট, এবং বণিকদের উল্লেখ করেছেন।[১৭] নাগরিকদের মধ্যে অব্রাহ্মণদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। নবদ্বীপের নগরবিন্যাসে পাড়ায় পাড়ায় যেমন নিম্নজাতির বাস ছিল, তেমনটি গ্রামেও ছিল। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ তা উল্লিখিত হয়েছে। তার সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বোধ হয় এই ছিল যে, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে গ্রামে নগরে মানুষদের মধ্যে কোনও সামাজিক সংহতি প্রকৃত অর্থে ছিল না। কেবল হাটে-বাজারেই উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের লেনদেন-এর সম্পর্ক ছিল। তাদের সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড একই রকমের ছিল না। প্রসঙ্গত একটি তথ্য উল্লেখ্য। জ্ঞাতিত্ব এবং আত্মীয়তার বন্ধন দুরতিক্রম্য হলেও, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত পরিবার সম্ভবত একান্নবর্তী পরিবার ছিল না। বহু আত্মীয়স্বজন থাকলেও চৈতন্যের পরিবারটি ছিল ক্ষুদ্র।

ধনীদের অর্থ প্রধানত ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে খরচ করা হত।

বৃন্দাবনদাস এক ধরনের সঙ্কীর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন :[১৮]

> জগৎ প্রমত্ত ধনপুত্র বিদ্যারসে।
> দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে ॥
> তারে বলে সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
> দশ বিশ জন যার আগে পাশে চলে ॥
> দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে।...
> বিবাহাদি কর্মে সে আনন্দ করি মরে ॥

"বিবাহাদি কর্মে আনন্দ" অবশ্যই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতা ছাড়া লাভ করা যেত না। তাই পুরোহিতদের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায়। দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতা বেড়ে যায়। কারও কারও মতে তার প্রধান কারণ ছিল মুসলমানদের উপপত্নী রাখার প্রথা, এবং তান্ত্রিক বামাচার। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন ; জগাই এবং মাধাই ব্রাহ্মণ হলেও ছিলেন মাতাল এবং দুশ্চরিত্র। পরিব্যাপ্ত কুসংস্কারের একটি উৎস ছিল নব্যস্মৃতি ; সেখানে শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্য বহু রকমের বিধান দেওয়া হয়েছে। নব্যস্মৃতি এবং নব্যন্যায় কোনও ভাবেই পুরাতন সমাজব্যবস্থায় এবং ব্যক্তির জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করতে পারেনি, কোন নূতন অর্থ সৃষ্টি করতে পারেনি। কোনও স্মার্তপণ্ডিত বর্ণভেদকে শিথিল করে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেননি।

৫

এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বঙ্গে মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হিন্দু-সমাজে যে ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দেয়, তার নিরসনের জন্যই নব্যস্মৃতি রচিত হয়। এ ধারণা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা এখন সংক্ষেপে বিচার্য। বঙ্গে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তুর্কী-আফগান্‌দের আগমন হয়েছিল। তার ফলে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ইসলামের প্রচার ও প্রসার। ফলত সমাজে, জীবনাচরণে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই পরিবর্তনের স্বরূপ অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়।

অধুনা বিভিন্ন তথ্যের আলোকে দেখানো হয়েছে যে, ভারতে তথা বঙ্গে সুলতানরা পূর্বকাল থেকে প্রচলিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে, কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে, কৃষির ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেননি।[১৯] অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা dominant continuity রূপে বিরেচিত হয়েছে, সুলতানি আমলে তা সর্বাংশে ভেঙে পড়েনি। তখন বঙ্গের বহির্বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়। নবদ্বীপের উপরে যে রমার অথবা লক্ষ্মীর "দৃষ্টি" পড়েছিল, তা বৃন্দাবনদাস সানন্দে আমাদের জানিয়েছেন।[২০]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভেবেছেন যে তুর্কী-আফগান্‌রা যখন বঙ্গে এসেছিলেন, তখন বাঙালি সংস্কৃতির ও বাঙালি মানসিকতার ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত

ছিল।[২১] তাকে ভেঙে ফেলার ইচ্ছা অথবা ক্ষমতা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ছিল না। কোনও সুলতান বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করেননি। তাঁদের মধ্যে যে কেউ কেউ সে ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাও অনস্বীকার্য। ধর্মান্ধ পীর ও মুসলমান পুরোহিতদের প্রভাব সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দু সমাজে ইসলামি সংস্কৃতির অথবা ভাবধারার প্রচার সুলতানি আমলে সর্বদা সমানভাবে চলেনি, কারণ সব সুলতানই এ বিষয়ে সমানভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন না।

মানতেই হবে, বহু বাঙালি হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজা 'কান্স্' অথবা রাজা গণেশের বিরুদ্ধেও সাম্প্রদায়িক কারণে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করার অভিযোগ করা হয়।[২২] প্রসঙ্গত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে যে সব বাঙালি সুলতানি আমলে নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁরা আদৌ প্রযৌক্তিক অর্থে "হিন্দু" ছিলেন কি না, তা নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়।[২৩] অর্থাৎ, নিম্নবর্ণের "হিন্দু"দের মধ্যে যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস "হিন্দু" ছিল কি? অনেক বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁরাও কি "হিন্দু" ছিলেন? অধ্যাপক সরকারের এই ধারণাও ছিল যে, যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও দুর্নির্ণেয়। সে কারণে ধর্মান্তরণের মাত্রাও দুর্নির্ণেয়। একটি আধুনিক হিসাব অনুসারে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে বঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ, এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪১ লক্ষ।[২৪] তাঁদের মধ্যে বহিরাগত হিন্দু ও মুসলমানরাও ছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা সম্পূর্ণভাবে "হিন্দুত্ব" বর্জন করেছিলেন কি না, হিন্দু জীবনধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কি না, সে প্রশ্নও তোলা যায়।

এটাও সত্য যে, অনেক জায়গায় অনেক সময়ে পীর, গাজী, এবং আমলারা হিন্দুদের উপরে খুব অত্যাচার করেছেন। স্বৈরতন্ত্র কদাচিৎ সদাচারী হয়। অত্যাচার— ধর্মনিরপেক্ষভাবে অত্যাচার—ভারতীয় স্বৈরতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। হিন্দু আমলারাও অত্যাচার করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, স্বয়ং গৌড়েশ্বর সনাতনের "বড় ভাই"-এর বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ আনেন :[২৫]

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥
জীব পশু মারি কৈল চাক্‌লা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥

বঙ্গীয়, মৈথিল, এবং উড়িষ্যার স্মৃতিশাস্ত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়াতে হিন্দুদের আর্থিক পুঁজি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পেল। স্মার্ত মতাদর্শের সাহায্যে ইসলামের শক্তিশালী অভিঘাতের মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব ছিল কি না, তা বিচার করা হয় না। নিম্নবর্গের হিন্দুরা যাতে মুসলমান না হন, তার

জন্য কোনও যুক্তিগ্রাহ্য এবং লোকগ্রাহ্য ব্যবস্থা বঙ্গীয় স্মৃতিতে নেই। রঘুনন্দন শুধুমাত্র ধর্মান্তরিতা অথবা ধর্ষিতা হিন্দু স্ত্রীলোকদের সহজে শুদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ সকল তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্ণবিভাগের কঠোরতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বর্ণজাতি ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, হিন্দু-মুসলমান অভিজাতদের স্বার্থপরতা এবং ঐহিকতা, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নব্যন্যায়ের শুষ্কতা, চৈতন্যের আবির্ভাবের মুহূর্তে বাঙালি সমাজে একটি মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছিল। প্রচলিত বিবিধ ধর্মবিশ্বাসে সংকট থেকে পরিত্রাণলাভের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই সংকটের কতকগুলি লক্ষণ মুসলমানদের অধিকার স্থাপনের পূর্বেই ঘনীভূত হয়। কাজেই, যাঁরা এই মনে করেন যে, মুসলমানদের বঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের ফলেই হিন্দু সমাজে সংকট দেখা দেয় এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই চৈতন্য বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলন শুরু করেন, তাঁরা সমগ্র অবস্থাটির একটি আংশিক চিত্র আঁকেন। চৈতন্যের মধ্যকালীন জীবনীসমূহে মুসলমানদেরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে হিন্দুদের নানারকমের দুর্বলতার উপরে।

৬

মুহম্মদ এনামুল হক্ লিখেছেন :[২৬]

> The message of eliminating cast, and creed, so loudly preached by Chaitanya Deva... is another important Vaisnava dogma that betrays the influence of Islam and its Sufis on Chaitanya Deva and the movement he launched.

তাঁর মতে বৈষ্ণবদেব 'প্রেম' সম্বন্ধে ধারণা, বৈষ্ণব কীর্তন, বৈষ্ণবদের 'রাধা' ভাবের 'দশা', এ সবই সূফী ধর্ম থেকে ধার করে আনা হয়। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন :[২৭]

> (বৈষ্ণবধর্মের) নবত্বের কারণ, মুসলমান ধর্মের প্রভাব। মুসলমান ধর্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম, এ কথা কে না জানে?

ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মাচারে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেই এক ধর্ম অন্য ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। চৈতন্যের সঙ্গে কোনও সূফী সাধকের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ কোথায়? নবদ্বীপে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হিন্দু সমাজে থেকে চৈতন্যের পক্ষে সূফীবাদ জানা কিংবা শোনা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তা ছাড়া মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বেও ভক্তির মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যের ইসলাম থেকে ভক্তি শেখার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বৃন্দাবনের কাছে এক জায়গায় চৈতন্যের সঙ্গে "কাল বস্ত্র"

পরা এক পীরের ধর্মসম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার বিবরণ দিয়েছেন। সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে মোমতাজুর রহমান তরফদার লিখেছেন যে, চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে সূফী-প্রভাব সুপ্রমাণিত হয়নি ঃ[২৮]

Thus the influence of Sufi-ism on the Vaisnavism of Shri Chaitanya is a point which is yet to be investigated.

সূত্রের উল্লেখ

১. রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'কৌলিকার্চনদীপিকা' বুতুনী, মাণিকগঞ্জ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৭
২. চৈ.ভা, পৃ. ১২
৩. কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, 'নবদ্বীপ মহিমা' (কলিকাতা, দি বুক-কম্পানি, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৮-৮৬ ; কুমুদনাথ মল্লিক, 'নদীয়া কাহিনী', মোহিত রায় সম্পাদিত (কলিকাতা, পুস্তক বিপণী, ৩য় সং, ১৯৮৬), পৃ. ২২৭-৯৬
৪. বিপ্রদাস, 'মানসাবিজয়', সুকুমার সেন সম্পাদিত (Calcutta, The Asiatic Society, তারিখ নেই)
৫. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১, পূর্বার্ধ (কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৫ম সং ১৯৭০), পৃ. ২২৬।
৬. Amiyakumar Banerjee, ed. *West Bengal Dstrict Gazetteers, Bankura* (Calcutta, Government of West Bengal, 1968), pp. 210-13
৭. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (অতঃপর চৈ-চ), শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কালনা, ১৩৩০ সাল] পৃ. ১৭৬ : "হেনকালে পাষাণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল", ইত্যাদি।
৮. চৈ.ভা. পৃ. ১১
৯. ন্যায়ের পরিভাষার এবং তার প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য : গৌরীনাথ শাস্ত্রী, 'উদয়নাচার্যকৃত কিরণাবলী', ২ খণ্ড (কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯০) ; প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : প্রথম খণ্ড : বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)
১০. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', মূল ও অনুবাদ (কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, ২য় সং ১৯০৭), অধ্যায়-১৯, শ্লোক : ৯-১০, ১২-১৪, ১৬
১১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* Translated by H.S. Jarrett, ed. J.N. Sarkar (Calcutta, the Asiatic Society, 1948-49), Vol. II. pp. 143-45.
১২. রঘুনন্দন, 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি'। বেণীমাধব দে সম্পাদিত (কলিকাতা), "শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্", পৃঃ ৪৪১ ; "শুদ্ধিতত্ত্বম্"। পৃ. ৩৫৬
১৩. ঝণী চক্রবর্তী, 'সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন' (কলিকাতা, লেখিকার দ্বারা প্রকাশিত, ২য় সং, ১৯৭০) পৃ. ১৪৭-৪৮, ২৪৯-২৫১
১৪. বাণী চক্রবর্তী, পৃ. ২৩৭, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী' (কলিকাতা, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮১-৮২, ১৯০-৯১
১৫. আবদুস সামাদ, 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১), পৃ. ১৩৩-৩৪ : "পতিব্রতোপদেশ"।
১৬. বিপ্রদাস, 'মনসাবিজয়'। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-৪৩ ; Samuel Purcbas, *Purchas His Pilgrims,* Vol, 10 (Glasgow, 1905), p. 114; ননীগোপাল চৌধুরী, 'বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত' (কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪) পৃ. ৯৭-১০৪
১৭. চৈ.ভা, পৃ. ৯৪, ১৪৫ ; চূড়ামণি দাস, 'গৌরাঙ্গবিজয়', সুকুমার সেন সম্পাদিত (Calcutta, The Asiatic Society. 1957), পৃ. ৩০-৩১ ; বিজয় গুপ্ত, 'মনসামঙ্গল', বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (কলিকাতা, বাণীনিকেতন, তারিখ নেই), পৃ. ৪, ৫৯-৬১
১৮. চৈ.ভা, পৃ. ৩৬

১৯. Tapan Raychaudhuri, Irfan Habib ed. *The Cambridge Economic History of India,* Vol. I (Cambridge, Cambridge University-Press, 1982), Preface, pp. Lx-XVI.
২০. চৈ.ভা, পৃ. ১১ : "নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে", ইত্যাদি।
২১. Sunitikumar Chatterji, *Origin and Development of the Bengali Language,* পূর্বোক্ত, Vol. I. pp. 209-210; দ্রষ্টব্য : Rokeya Kabir, "Sultans of Bengal; Charge of Religions Intolerance", *Nalinikanta Bhattasali Commemoration Volume* (Dacca, Dacca Museum, 1966); জগদীশনারায়ণ সরকার, "মধ্যযুগে বাঙ্গালায় হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক", 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ ১ পৃ. ১-৭০
২২. Jadunath Sarker ed. *The History of Bengal: Muslim Period* (Patna, Janaki Prakashan, 1977) pp. 123-128
২৩. বিনয়কুমার সরকার, 'বাংলায় দেশীবিদেশী : বঙ্গসংস্কৃতির লেনদেন' (কলিকাতা, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং, ১৯৪২), পৃ. ২১-২২
২৪. E.C. Dimock, "Hinduism and Islam in Mediaeval Bengal"/ Rachel Van M. Baumer, ed. *Aspects of Bengali History and Society* (New Delhi, Vikash Publishing House, 1976), p. 10; Joseph T. O'connell, "The word 'Hindu' in Gaudiya Vaishnava Texts", *Journal of the American Oriental Society* 93.3.(1973), p. 342: "For the Vaisnavas whose texts we are using, it is cetain that the serious religious concern is devotion (*bhakti*) to Lord Krshna, not commitment with the Hindu people nor any view of the Sacred held in common by all Hindus." দ্রষ্টব্য J. T. O' Connell, "Vaishnava Perceptions of Muslims in Sixteenth century Bengal', Milton Israel and N.K.Wagle ed. *Islamic Society and Culture: Essays in Honour of Professor Aziz Ahmad* [Manohar, 1983), pp. 289-313.
২৫. চৈ.চ, পৃ. ৪৪০-৪১ : সনাতনের কোনও জ্যেষ্ঠভ্রাতা, "বড় ভাই", ছিলেন কি ? টীকাকার লিখেছেন : "বড় ভাই-শ্যালক। কোনও কোনও দেখে মুসলমানেরা শ্যালককে বড় ভাই বলে।" যদি তাই হয়, তবে এটা ধরে নিতে হবে যে, সনাতন বিবাহিত ছিলেন।
২৬. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism In Bengal* (Dacca, Asiatic Society of Bangaldesh, 1975) pp. 268-81.
২৭. তদেব, উদ্ধৃতি, pp. 272-73.
২৮. M.R. Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal: A Socio-Political Study* [Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1965), p. 228

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তির সামগ্রিক অর্থ এবং বঙ্গে ভক্তি প্রচারের পদ্ধতি

চৈতন্য এবং তাঁর ২৯০ জন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরিকর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের নিরসনের জন্য একটি মৌলিক নীতি পালনের কথা বলেছিলেন। এই নীতিকে বলা হয়েছে "ভক্তি"।[১] সমস্ত বিখ্যাত এবং বড় ধর্মমতেই ভক্তি অল্পবিস্তর দেখা যায়। এর মৌলিক উৎস ভগবৎপ্রীতিও হতে পারে, ভগবৎভীতিও হতে পারে। কাঁচাখেকো ভূতের মতো দেবতাদেরও ভক্তিভরে পূজা করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণবরা যে ভক্তির কথা বললেন, তাতে প্রাচীনকাল থেকেই ভাববাদের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদ মিশ্রিত ছিল।

বৈষ্ণবীয় ভক্তিসূত্র রচনা করেছিলেন নারদ এবং শাণ্ডিল্য। 'ভাগতপুরাণ'-এর ভক্তিবিষয়ক শ্লোকসংকলন 'ভক্তিরত্নাবলী' প্রস্তুত করেছিলেন বিষ্ণুপুরী নামক তিরহুতের এক সন্ন্যাসী।[১ক] পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী রচনা করেন 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী রচনা করেন 'ভক্তিসন্দর্ভ'। 'শাণ্ডিল্যসূত্র'-এর বল্লভাচারী বৈষ্ণব-ব্যাখ্যা আছে 'ভক্তিমার্তণ্ড' নামক সন্দর্ভে। বিখ্যাত বাঙালি বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী 'ভগবদ্ভক্তিরসায়ণ' লিখেছিলেন। ভক্তিসাহিত্যে নারদের উচ্চস্থান। 'পদ্মপুরাণ'-এর একটি বিচিত্র কাহিনী অনুসারে পুরুষ নারদ এক সময়ে স্ত্রী হয়ে যান। কৃষ্ণ "স্ত্রী"-নারদকে উপভোগ করেন।[২]

দাক্ষিণাত্যে রামানুজ-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় 'নারদভক্তিসূত্র'কে অনুসরণ করতেন। নিম্বার্কমতাবলম্বীগণ 'শাণ্ডিল্যসূত্র'কে অনুসরণ করতেন। এই দুই সূত্রে বিবৃত ভক্তিতত্ত্বে একটা সাধারণীকরণের প্রক্রিয়া ছিল। তা বোধ হয় গৌড়ীয় গোস্বামীদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা বিশেষভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রচাবক ছিলেন। এই কারণে রূপ গোস্বামী ও জীবগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্তির তাৎপর্য বিচার করে যথাক্রমে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'ভক্তিসন্দর্ভ' রচনা করেছিলেন। প্রথম গ্রন্থটির টীকা 'দুর্গমসঙ্গমনী'। এটির রচয়িতা ছিলেন জীব গোস্বামী।

সমস্ত রকমেব ভক্তিসূত্রে এবং ভক্তিবিষয়ক নিবন্ধে সদাচারের উপরে খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। স্বার্থপরতা, অসৎসঙ্গ, কুৎসিত সম্ভোগ, আত্মম্ভরিতা, গর্ব, ঔদ্ধত্য, ভক্তের পক্ষে পরিত্যজ্য ঘোষিত হয়েছে। নারদের মতে জ্ঞান থেকে ভক্তি

আনে না। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। ভক্তির তত্ত্বে বৈদিক ধর্মের অনুশীলনের কোনও গুরুত্ব নেই। ভক্ত হবেন নির্দোষ, সত্যবাদী, পবিত্র, দয়ালু এবং বিশ্বস্ত। নারদের মতে ভক্তি "পরমপ্রেমরূপা"। শাণ্ডিল্যের বিচারে ভক্তি লাভের উপায় রূপে যোগাভ্যাস করতে হয়। ভক্তিতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ঐহিকতার বিরোধী। ধর্মের নামে ব্যভিচার ভক্তিতত্ত্বানুসারে পাপ। বৈষ্ণব ভক্তিতে যৌন যোগাচারের অথবা বামাচারের স্থান নেই। জীব গোস্বামীর মতে সমস্ত যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ভক্তিয়োগ। ভক্তির তত্ত্বে দয়া, মঙ্গলবোধ, সৌভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, সত্য, নৈতিক শৃঙ্খলা গভীর তাৎপর্যবহ। ভক্তি কর্মকাণ্ডবিরোধী হলেও তাতে সৎক্রিয়া পরিত্যজ্য নয়। আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বায়নের জন্য সৎক্রিয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়েছে। পাপস্খালন না হলে ভক্তির অভ্যাস ব্যর্থ হয়। 'ভাগবতপুরাণ'-এর চরিত্র অজামীল 'নারায়ণ' নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচারের পাপ থেকে মুক্তি পান।

নারদের মতে ভক্তি কখনই ভক্তকে অসামাজিক করে তুলতে পারে না। ভক্ত তাঁর সমস্ত সামাজিক এবং পারিবারিক কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। ভক্তের জীবনধারণের জন্য খাওয়া-দাওয়ার, কাপড় পরার প্রয়োজন আছে। শাণ্ডিল্যের মতে স্মৃতিশাস্ত্র থেকে ভক্তির লক্ষণসমূহ জেনে নিতে হবে। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাবলী'র মতে প্রকৃত ভক্ত নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের কথাও তাবার অবসর পান না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের দ্বারা এবং বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী-বৈরাগীদের দ্বারা সর্বদা পালনীয় কৃত্যের একটি তালিকা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।[৩]

তৃণ হৈতে নীচ হয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব কবিবে।
ভর্ৎসন-তাড়ন কারে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না রোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইবে ॥
নিরন্তর নাম লৈবে, যথালাভে সন্তোষ।
এমত আচার করি ভক্তিধর্ম পোষ ॥

তিনি আরও লিখেছেন :[৪]

বৈরাগী করিবে সদা নাম সঙ্কীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥
শাকপত্র ফলমূলে উদর ভরণ ॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।

অমানীমানদ সদা কৃষ্ণনাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানস করিবে ॥

কৃষ্ণদাসের কথায় একটুখানি স্ববিরোধ আছে ; তিনি প্রথমে বললেন বৈষ্ণবদের "অযাচিত বৃত্তি"র কথা ; পরে বললেন, "মাগিয়া খাইয়া করে জীবনধারণ"। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এ সব নির্দেশে বৈরাগী বৈষ্ণব ভক্তদের দারিদ্র্যবরণ করতে বলা হয়েছে। দারিদ্র্যবরণ করে বৈষ্ণবরা শুধু যে ভোগবাদী জীবনধারাকেই বর্জন করলেন তাই নয় ; তারা মাটির কাছাকাছি চলে এলেন। নিষ্কাম দরিদ্র বৈষ্ণবরাই দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাক্ষিণাত্যের ভক্ত শৈব কবি সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন। কবি বলেছেন :[৫]

বেদ পাঠ কেন কর ?
শাস্ত্রের কথা শোনার কী দরকার ?
প্রতিদিন সদাচারের ব্যাখ্যা করারই বা দরকার কী ?
জঙ্গলে ঘুরে কী হবে ? সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হবেটা কী ?
সন্ন্যাসী হয়ে জীবনকে দগ্ধে দগ্ধে শেষ করার কী প্রয়োজন ?
মাছই বা খাব না কেন ? মাংস কেন খাব না ?
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থই বা কী ?
উপোস কেন করব ? কেন অহরহ যন্ত্রণা ভোগ করব ?
পর্বতেই বা উঠতে হবে কেন ? সেখানে বসে তপস্যাই বা কেন করব ?
তাদেরই মুক্তি ! তাদেরই মোক্ষ লাভ !
যারা সর্বদা প্রভুর নাম করে !

সাধারণভাবে ভক্তি জাতপাতবিচারের বিরোধী ছিল। চণ্ডালও যে ভক্ত হতে পারে, ভক্তির তত্ত্ববিদ্‌গণ তা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :[৬]

নীচ জাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥

ভাগবতপুরাণ-এ ব্যাখ্যাত ভক্তি জাতীয় সংহতির নীতিরূপেই বিবেচিত হয়েছে। ভক্তির তত্ত্বে পার্থিব জীবন কখনই অবহেলিত হয়নি। মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। এই ছিল ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত। ওদিকে শাণ্ডিল্য ভক্তদের দ্বারা রাজাদের পূজন ও স্তবন ছোট করে দেখেছেন। মনের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তি বাসা বাঁধলে মনটাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ভক্তিতত্ত্বে বিবৃত সদাচারের ও নৈতিক সংযমের এটাই ছিল তাৎপর্য।

ভক্তি উপাস্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্যোতনা বহন করে। তাতে ক্রিয়াকাণ্ডের ও পৌরোহিত্যের প্রাধান্য নেই। কিন্তু গুরুর প্রয়োজনীয়তা

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'ভক্তিরত্নাবলী'তে ভক্তদের সাধুসেবনের নির্দেশ আছে। শাণ্ডিল্যের মতে গুরুই শিক্ষক। 'ভক্তিরত্নাবলী'তে এবং পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বে গুরু এবং ভগবান এক ও অভিন্ন। গুরুর নির্দেশ ছাড়া ভক্তের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

ভক্তি একই সঙ্গে জ্ঞানবাদ ও কর্মকাণ্ডকে ছোট করে দেখে। নারদ জ্ঞানার্জনপ্রচেষ্টা এবং অবৈধ যৌনসংসর্গের মধ্যে সমতা দেখতে পেয়েছেন। বস্তুবাদও পাপ। প্রকৃত ভক্তের ক্ষুধাতৃষ্ণাও থাকে না। এমনও বিশ্বাস ছিল যে, ভক্তি যখন সত্যই অত্যন্ত গভীর হয়, তখন ভক্তের তালু থেকে একটা 'রস' নির্গত হয়। সে রসের এক ফোঁটাও যদি পাকস্থলীতে আসে, তবে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি হয় ; ক্ষুধাতৃষ্ণাও থাকে না।[৭] কৃষ্ণ স্মরণে পাপ ও দুর্ভাগ্য দূর হয়, ঐশ্বর্য আসে, বুদ্ধি পবিত্র হয়, জ্ঞান বাড়ে, এবং মননের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা আসে। জ্ঞানার্জন চেষ্টার ফল মাত্র ; কিন্তু ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। ভক্তির নিরন্তর অনুশীলনে ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

প্রকৃত ভক্তরা ভক্তির ভাবাবেগে প্রক্ষুব্ধ হন। ভক্তি মানসিক প্রক্ষোভে পুষ্টি লাভ করে। রূপ গোস্বামী-সংকলিত 'পদ্যাবলী'তে বৈষ্ণব ভক্তদের দ্বারা বিরচিত বহু শ্লোকে ভাবাবেগের প্রকাশ দেখা যায়। তার কয়েকটি উদাহরণ এইরূপ[৮] :

[কবি অজ্ঞাতনামা]
ক. নানা রকমের ঔষধ খেলাম। নানা নিয়ম মেনে চললাম। মৌনী হলাম। বনবাসী হলাম। শাস্ত্রকথা শুনলাম। তীর্থে গেলাম। তবুও তো আমার কামনাবাসনা গেল না। অথচ সামান্য ভাবেও যখন গোবিন্দের পদকমলে মনঃসংযোগ করি, তখন থেকেই আমার কামনাবাসনা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে।
খ. [কবি মাধব]
নীতিবাগীশদের মতে আমি মোহগ্রস্ত। বেদবাদীদের মতে আমি ভ্রান্ত। বন্ধুদের বিচারে আমি বাজে লোক। আমাকে বোকা ভেবে আমার ভাইরা আমাকে ভালবাসে না। ধনীদের ধারণা আমি পাগল। বিবেকী লোকদের মতে আমি দাম্ভিক। [তবুও] আমার ভক্তি এত দৃঢ় যে, মুহূর্তের জন্যও আমি কৃষ্ণপদকমলের চিন্তা ছাড়া থাকতে পারি না।
[গ] [বাসুদেব সার্বভৌম]
কণাদের দর্শন পড়েছি। ন্যায়শাস্ত্র আমার জানা আছে। মীমাংসাও জানি। জানি সাংখ্য। যোগশাস্ত্রের সঙ্গেও পরিচয় আছে। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে বেদান্তের চর্চা করেছি। এ সবের কোনটাই আমার মনকে তেমনভাবে টানে না, যেমন টানে কোনও এক নন্দের ছেলের বাঁশরীর মাধুরী ধারা।
[ঘ] [বাসুদেব সার্বভৌম]
আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, যতিও নই। কিন্তু গোপীজনভর্তা কৃষ্ণ

নিখিল-পরমানন্দ-অমৃত-সিন্ধু-স্বরূপ। তাঁর পদকমলের যাঁরা দাস, আমি তাঁদের দাসানুদাস।

শেষ শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হল এই যে, ব্রাহ্মণাদি জাতি এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম মায়াকল্পিত। কৃষ্ণের দাস হয়ে থাকাই জীবের স্বরূপ। এই অবস্থাকেই মুক্তি বলা যায়। ভক্তিভাবপ্লাবিত এমন আরও বহু শ্লোকই 'পদ্যাবলী'তে আছে। বাসুদেব সার্বভৌম সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর শ্লোকে অসামান্য কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

২

অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ঘটনার অথবা ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনীতির সংযোগ থাকে, যেমন, পশ্চিম ইওরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে ষোড়শ শতকীয় প্রটেস্টান্ট্ ধর্মান্দোলনের সংযোগ ছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে চৈতন্যের আবির্ভাবকালে অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ভক্তি-আন্দোলনের সংযোগের বিষয়টি মোটেই স্পষ্ট নয়। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে ভক্তির যোগসূত্র কিছুটা স্পষ্ট। বিশেষ বিশেষ "জাতি" ভারতে ভক্তির প্রচারকদের সমর্থন করে। পূর্বে আলোচিত ভক্তিতত্ত্ব ছিল একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, যা প্রচলিত ভোগবাদী, প্রচলিত কর্মকাণ্ড ও নব্যন্যায় চর্চা ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমালোচনা রূপেই কোনও কোনও ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর বিচারে গ্রাহ্য হয়েছিল। চৈতন্যের ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ২৩৯জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন ছিলেন বৈদ্য, ২৯ জন ছিলেন কায়স্থ, এবং ২ জন মুসলমান ও ১৬ জন "স্ত্রীলোক" ছিলেন।[৯] পরবর্তীকালে "শূদ্র" বৈষ্ণবদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমেই পরিকরদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভক্তদের সংখ্যাধিক্য থেকে এ সিদ্ধান্তই করা যায় যে, নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের অনেক ব্রাহ্মণেরই চিন্তাধারা প্রচলনির্ভর ছিল না। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যতার স্মার্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেননি। নব্যন্যায়ের শুষ্ক চর্চা তাঁদের ভাল লাগেনি। নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের ব্রাহ্মণদের অন্তর্দ্বন্দ্ব চৈতন্যের ভক্তি প্রচারে সুপরিস্ফুট হয়।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে স্থানীয় বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড় থেকে শান্তিপুরে সমাগত বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত।[১০] শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে শ্রীহট্ট থেকে সমাগত বৈষ্ণবরাই ভক্তি সিদ্ধান্তের প্রধান সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে বহু পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ নির্মীয়মান মহানগর কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানত পৌরোহিত্য কর্মপ্রাপ্তির এবং নব্যধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা নিয়ে। মনে হয়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকেও বঙ্গের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র নবদ্বীপ সে ভাবেই শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদের আকর্ষণ করেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, শ্রীহট্টে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনায় অনেক ব্রাহ্মণ সেখান থেকে নবদ্বীপে চলে

আসেন।[১১] স্থানীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের ও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগণ।

নবদ্বীপের "শ্রীহট্টিয়া" বৈষ্ণবরা কেন এবং কীভাবে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তা জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরী নামক সাধুর কথা কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরী

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর ॥[১২]

মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে বৃন্দাবনে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। বল্লভাচার্য গোবর্ধন পাহাড়ে নূতন মন্দির বানিয়ে মাধবাচার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত গোপাল মূর্তিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সেবায়েত ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর গৌড়ীয় শিষ্যগণ।[১৩] মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন চব্বিশ পরগণার কামারহাটির ঈশ্বর পুরী। মাধবেন্দ্র অদ্বৈত আচার্যের গুরু ছিলেন ; নিত্যানন্দ অবধূতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ঈশ্বর পুরীর সান্নিধ্যে এসে পাণ্ডিত্যাভিমানী চৈতন্য ভক্তিভাবে প্রক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের এক শিষ্য ছিলেন বিষ্ণুদাস আচার্য ; তিনি নাকি মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র ছিলেন। গুরুপরম্পরা অনুসারে মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্যের পরমগুরু ছিলেন। অথচ, পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাঁর কোনও খোঁজ রাখলেন না। তার কারণ কি এই ছিল যে, মাধবেন্দ্র বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক কালে ঘনিষ্ঠ ছিলেন ?

নবদ্বীপ-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডবিরোধী ভক্তি প্রচার সহজ ছিল না। 'ভট্টাচার্যগণ বৈষ্ণবদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন :[১৪]

কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে।...
আর্যাতর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া...

ব্রাহ্মণরা ভক্তিমার্গকে ক্ষুদ্র ভাবতেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব মাত্রই ছিলেন উপহাসের পাত্র। অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণববিদূষণ আদৌ সহ্য করতে পারতেন না।[১৫]

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়নগোচর ॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া ॥

এই অবস্থায় চৈতন্যের অভ্যুদয় হল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে কৈল অন্তর্ধান ॥

কৃষ্ণদাসের 'প্রমাণ' অনুসারে চৈতন্যের আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ এবং তিরোধানকাল ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। সুখময় মুখোপাধ্যায় চৈতন্যের জীবনের কালক্রম এ ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন।[১৭]

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৪৮৬
প্রথম বিবাহ : ১৫০১-১৫০২
দ্বিতীয় বিবাহ : ১৫০৭
বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ : ১৫০৯
সন্ন্যাস : ২৫-২৬ জানুয়ারি, ১৫১০
পুরী-গমন : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫১০
দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ : এপ্রিল ১৫১০-এ শুরু
পুরীতে প্রত্যাগমন : ১৫১২
বৃন্দাবনে গমন : ১৫১৫
এলাহাবাদে আগমন : জানুয়ারি, ১৫১৬
বারাণসীতে আগমন : ১৫১৬
পুরীতে প্রত্যাবর্তন : মে, ১৫১৬
তিরোধান : ২৯ জুন, ১৫৩৩

চৈতন্য (সংসারাশ্রমে নাম গৌরাঙ্গ এবং নিমাই) ছিলেন সুদর্শন এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তিনি যখন ভক্তির প্রচারক হলেন, তখন বৈষ্ণবদের একটা বড় লাভ হল। তিনি শুরু থেকেই জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি-প্রচারের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন। চৈতন্য এবং তার পরিকরগণ পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলেননি। তাঁরা ভক্তির মতাদর্শের সঙ্গে 'ভাগবতপুরাণ'-এ বর্ণিত কৃষ্ণলীলা মিশ্রিত করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ কাহিনী যে জনপ্রিয় ছিল, তা তাঁরা জানতেন। ভক্তির প্রচারের জন্য চৈতন্য যে সব কাজ করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

১. চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে শান্তিপুরে প্রভাবশালী বৈষ্ণবগোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছিল। তাতে জাতবিচার ছিল না। চৈতন্য সম্ভবত মহান্তদের ও কীর্তন-গায়কদের সংগঠিত করেন।
২. তিনি "ঘরে ঘরে নাম" প্রচারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।
৩. আগে "পাষণ্ডী"দের ভয়ে বদ্ধগৃহে কীর্তন চলত। চৈতন্য বিশাল শোভাযাত্রাসহ নগরকীর্তন পরিচালনা করেন। তাতেও জাতবিচারের কোনও প্রশ্ন ছিল না।

৪. চৈতন্য উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হলেও স্বর্ণকার, মালাকার, শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্র, এবং পেশাভিত্তিক জাতিসমূহের লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করলেন।
৫. চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ ভক্তি-প্রচারের কৌশল রূপে কোনও প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা করেননি। বৃন্দাবনদাসের সুন্দর বিবরণ অনুসারে ধর্মরাজ, যম, শঙ্কর, গণেশ, ইন্দ্র, ব্রহ্মদৈত্য সংকীর্তন শুনে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলেন।
৬. নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই ও মাধাই নামক দুই জন কুক্রিয়াসক্ত দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে চৈতন্য 'উদ্ধার' করে ভক্তির মাহাত্ম্য স্পষ্ট করলেন।
৭. বিশাল শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তনের সংগঠন করে চৈতন্য "হিন্দুয়ানি" এবং কীর্তনবিরোধী নবদ্বীপের কাজীকে দমন করলেন।
৮. চৈতন্য বৈষ্ণবীয় নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজেও তাতে অভিনয় করেন।
৯. ভক্তি-প্রচারেব প্রধান মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হ'ল এই যে, ভক্তিভাবভাবিত চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এমন সব কাজ করেছেন, যা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরূপ :

১. চৈতন্য, "নিরবধি শ্লোক পঢ়ি করয়ে রোদন। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ ॥ কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয়ে। ভয়ে পলায়ে লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে ॥ রাত্রে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ রসে। বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে ॥" ..."আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। ক্ষণে বলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাবণ্ডীর মাথা ॥"[১৮]
২. নিত্যানন্দ, "হলধর ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥...মদ আন মদ আন বলি প্রভু ডাকে। হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে।"[১৯]
৩. নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের "জলকেলি" : "অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতুহলী। নির্ঘাত জল দিল করিয়া মহাবলী। দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে। মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥ নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ। কোথা হইতে মদ্যপের হইল উপস্থান ॥"[২০]

এক কথায় বলা যায়, এ সব অসামান্য মানুষরা যেন ইচ্ছা করেই এমন কাজ করলেন, যাতে তাঁদের কুখ্যাতি হয়। "ইহা সবা হৈতে হৈল অবশকাহিনী", এই ছিল নবদ্বীপের ভদ্রজনের মূল্যায়ন ; তাঁরা ভাবলেন : "ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল। নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥"[২১] কিন্তু এমন মনে হয় যে, তাঁদের অস্বাভাবিক ব্যবহার সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা বোধ হয় এটাই দেখাতে চাইলেন যে, ভক্তিমিশ্রিত এইরূপ প্রক্ষোভেই প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবন ধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো যায়, সহজ হওয়া যায়, উদার হওয়া যায়।

চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনীসমূহে অতিপ্রাকৃত কাহিনী কমই আছে। তাঁর নামকীর্তনে কোনও বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারই ছিল না। মনে ভক্তি নিয়ে শুধু নামগান করলেই যদি ভক্ত পরমার্থ লাভ করেন, তবে আর স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম এক নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে এক নূতন সামাজিক পরিবেশ। ভক্তির সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্য চৈতন্যের প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। জ্ঞান চর্চা মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; এটা এখনও দেখা যায়। বৈষ্ণবরা মনে করতেন : [২২]

দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধর্ম কভু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে ॥

বলা হল : লেখাপড়া করলেই পরমপ্রাপ্তি হয় না; "জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই ॥"[২৩] চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ ভক্তিকে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাতে "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়।"

৩

স্মার্ত মতাদর্শেও সদাচার প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিষয়ে বৈষ্ণব ভক্তদের ও স্মার্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবরা জ্ঞানমার্গের ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। ভক্তির অভ্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা জাতপাতের বিচারকেও অগ্রাহ্য করেছেন। ব্যক্তির জাতপাত-নির্বিশেষে ধর্মাচরণের অধিকার তাঁরা মেনেছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোজক পুরোহিতদের কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে তাঁরা মনে করেননি। স্ত্রীলোকদের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বন তাঁদের বিচারে দূষণীয় ছিল না। বৈষ্ণবদের এই উদারতা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের পছন্দ হয়নি। বৈষ্ণবতা, ভক্তি একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক বিকল্প হয়ে উঠছে দেখে তাঁদের ভয় হল। তাঁরা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে অপপ্রচাব শুরু করলেন : [২৪]

এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥

শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্‌গিয়া।
নিশায় এগুলো খায় মদিরা আনিয়া ॥
এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র জপি পঞ্চকন্যা আনে ॥
নানবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন ॥
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।

বৈষ্ণবরা "অধ্যাপক" চৈতন্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনায় কৃতিত্ব সম্বন্ধে কাহিনী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের 'পড়ুয়া' অথবা ছাত্রদের মধ্যে চৈতন্য বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কিনা, সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত সেই 'পড়ুয়া'-রাই চৈতন্যের বিরুদ্ধে 'সমবায়' গঠন করে। [২৫] চৈতন্য নাকি বলেছিলেন : [২৬]

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে ॥

অশেষ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভাবশালী ভট্টাচার্যদের ও তাঁদের 'পড়ুয়া'দের আক্রোশের পাত্র হয়েই রইলেন। দুঃখিত, বিরক্ত চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধা মাতা এবং যুবতী স্ত্রীকে কাঁদিয়ে মস্তক মুণ্ডণ করে, কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য সন্ন্যাসী হলেন। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে, তিনি তাঁর বড় ভাই বিশ্বরূপের মতো নিরুদ্দেশ হননি; "মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব", বলেছিলেন তিনি। [২৭] পুরীতে গিয়ে সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের করুণ কাহিনী বাঙলার লোকসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। অগণিত সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় সুগভীর বেদনা অনুভব করেন। তার ব্যঞ্জনা আছে বাসুদেব ঘোষ বিরচিত কোন কোন কীর্তন-পদে। [২৮]

সূত্রের উল্লেখ

১. J.N. Farquhar, H.D. Griswold, *The Religious Quest of India* (Humphrey Milford, Oxford University Press, 1922), Book II, ch. V: "Ethical Implications of the Bhakti Movement," pp. 165-179; S. C. Malik, ed. *Dissent, Protest and Reform in Indian Civilization* (Simla, Indian Institute of Advanced Studies, 1977); Monika Thiel-Horstmann, ed. *Bhakti In Current Research*, 1979-1982 (Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1983)

১ক. Vishnu Puri, *Bhaktiratnavali*, Edited and Translated into English by "A.B." (Reprint, Delhi, Oriental Publishers, no date); Nandalal Sinha, ed. *Bhaktisutras of Narada and Sandilya Sutram* (Reprint, Delhi, Oriental Publishers, no date); রূপ গোস্বামী, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', সম্পাদক ও বঙ্গানুবাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস,

১৯৩৩) ; মধুসূদন সরস্বতী, 'ভক্তিরসায়নম্', দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত (কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ), জীব গোস্বামী, 'ভক্তি-সন্দর্ভ', সম্পাদক : রাধারমণ গোস্বামী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) ; রাধাগোবিন্দ নাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা' (কলিকাতা, প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩২৪-৩৩২

২. Bimanbehari Mazumdar, *Krsna in History And Legend* (Calcutta, University of Calcutta, 1969), p. 180; আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Ramakanta Chakrabarty, VIB, পূর্বোক্ত, pp. 71-90

৩. চৈ. চ, পৃ. ১৬৮

৪. চৈ. চ, পৃ. ৭৩৯-৪০

৫. Charles Leslie, ed. *Anthropology of Folk Religion* (New York, Vintage Books, 1960), pp. 117-118

৬. চৈ. চ পৃ. ৭১১

৭. Sashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults* (Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay, 2nd ed. 1962), pp. 241-42

৮. রূপ গোস্বামী, 'পদ্যাবলী', রামনারায়ণ গোস্বামী সম্পাদিত (বহরমপুর, রামদেব মিশ্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) : শ্লোক-৪, (পৃঃ ১৫-১৬ ;) শ্লোক ৮২, (পৃ. ৮৬) ; শ্লোক-১০০, (পৃ. ৯৮-৯৯) ; শ্লোক-৭২ (পৃ. ৭৬)

৯. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং ১৯৫৯), পৃঃ ৫৬৭

১০. অদ্বৈত আচার্যের জীবনী : লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস, 'বাল্যলীলাসূত্রম', মূল ও বঙ্গানুবাদ, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (শ্রীহট্ট, ১৩২২ বঙ্গাব্দ) ; ঈশান নাগর, 'অদ্বৈতপ্রকাশ', মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (কলিকাতা, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) ; হরিচরণ দাস, 'অদ্বৈতমঙ্গল', রবীন্দ্রনাথ মাইতি সম্পাদিত (বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩)

১১. দ্রষ্টব্য, VIB, পূর্বোক্ত, pp. 46-48; সুকুমার সেন, 'চৈতন্যাবদান' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৯২ রঙ্গাব্দ), পৃ. ২৭-২৮

১২. চৈ. চ, পৃঃ ৭৫৮

১৩. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য' (কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন ১৯৫৩), পৃ. ২৩৯ ; বিষ্ণুদাস আচার্য : দ্রষ্টব্য, হরিদাস দাস, 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, [নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর। ২য় সং ১৯৮৭), পৃ. ১৩৭২

১৪. চৈ. ভা, পৃ. ৩৬

১৫. চৈ. ভা, পৃ. ১৩

১৬. চৈ. চ, পৃ. ১৪৬ ; রাধাগোবিন্দ নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭-৪৩৬।

১৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' (কলিকাতা, জি. ভট্টাচার্য এন্ড কোং, ১৯৭৪), পৃ. ২৭-২৯

১৮. চৈ. ভা, পৃ. ১১৮, ১৩২

১৯. চৈ. ভা, পৃ. ১৪৬

২০. চৈ. ভা, পৃ. ২১৫

২১. চৈ. ভা, পৃ. ২০৫

২২. চৈ. ভা, পৃ. ১১৯

২৩. চৈ. ভা, পৃ. ১৯৭

২৪. চৈ. ভা, পৃ. ১০৫, ১৭২, ১৭৬

২৫. চৈ. ভা, পৃ. ২৯২ : "রাজা ত নহে তেঁহো মারিবেন কেনে। আমরাও সমবায় হও সর্বজনে ॥"

২৬. চৈ. ভা, পৃ. ২৯২

২৭. চৈ. ভা, পৃ. ২২২ : চৈতন্য জননীকে বলেছিলেন : "শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥ তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥ জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস। তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব। তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব ॥" দ্রষ্টব্য : চৈ. চ, পৃ. ২২১

২৮. মালবিকা চাকী সম্পাদিত, 'বাসু ঘোষের পদাবলী' [কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পঞ্চম স্তবক, সন্ন্যাসলীলা, পৃ. ৮৭-১২০

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

ত্রিদণ্ডীভিক্ষু ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ইংরেজি ভাষায় চৈতন্যের একটি জীবনী রচনা করেছিলেন[১]। তার প্রথম বাক্য : The Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is not a historical person.।[১] তাঁর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, ইতিহাসের, প্রত্নতত্ত্বের, এক কথায় বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে চৈতন্যকে বোঝার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

চৈতন্যকে ইতিহাসের বাইরে নিয়ে আসার এমন অপচেষ্টার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। তা এখানে আলোচ্য নয়। অথচ, যাঁরা এইরূপ চেষ্টা করেছেন তাঁরা সময় ও সুযোগ থাকলে বৈষ্ণবীয় রহস্যবাদের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট থেকেও পদে পদে ইতিহাসকেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। "Supreme Lord" চৈতন্যের পক্ষেও ইতিহাস দুরতিক্রম্য ছিল।

বিশাল পদাবলী-সাহিত্যে যে রাধাকৃষ্ণ চিত্রিত হয়েছেন, তাঁদের তো বিশিষ্ট ঐশ্বরিক চরিত্র নেই। তাঁরা সুপরিচিত তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা। কিন্তু যেই চৈতন্যের কথা আসে, তখনই বলা হয়, তিনি এক তুরীয় মহাজাগতিক পরমেশ্বর ; তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অথচ চৈতন্য নিজে তো এমন ভাবেননি। পুরীতে এসে একবার অদ্বৈত আচার্য সমবেত বৈষ্ণবদের বললেন[২]

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥

কিন্তু চৈতন্য সর্বদা নিজেকে "কৃষ্ণদাস" ভাবতেন। তাই যখন তিনি ভক্তদের "চৈতন্যবিজয়" কীর্তন শুনলেন, তখন

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসমণি ॥[৩]

চৈতন্য প্রশ্ন করেন :[৪]

অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন ॥

এই মৌলিক প্রশ্নের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছিল : চৈতন্যই ঈশ্বর ; তাঁর ইচ্ছাতে সব হয়।

২

চৈতন্য সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বিচার্য।

পূর্ব ভারতে কোনও স্থানীয় এবং স্বীকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল না। তাই চৈতন্য "তারতী"-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কারও কারও মতে তাঁর আসল গুরু ছিলেন ঈশ্বর পুরী। "ভারতী", "পুরী" প্রভৃতি উপাধি ছিল শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের উপাধি। সুশীলকুমার দে লিখেছেন :[৫] ...the indications are strong that Caitanya formally belonged to the Dasanami order of Samkara Samnyasins, even though the ultimate form which he gave to Vaisnava Bhakti had nothing to do with Samkara's extreme Advaita-vada''. মনে হয়, ইসলামের অভিঘাতে শৈব এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং মৌল মতবিরোধকে চাপা দিয়ে রাখে। "পুরী" সন্ন্যাসী হলেও মাধবেন্দ্রের মেঘদর্শনেই কৃষ্ণদর্শন হত।[৬] কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্যও এক সময়ে নিজেকে শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত "মায়াবাদ"-এর সমর্থকরূপে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং বলেছিলেন :

...মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।[৭]
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥

'মায়াবাদ' যে তাঁর ভাল লাগেনি, এই উক্তি থেকে তা বোঝা যায়।

আমাদের দেশে চৈতন্যই ছিলেন প্রথম 'সামাজিক' সন্ন্যাসী। অসামান্য ছিল তাঁর মাতৃভক্তি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ পড়ে মনে হয়, বৃদ্ধা অসহায় মাকে ছেড়ে এসে মার জন্য চৈতন্য সর্বদা দুঃখবোধ করেছেন। তিনি না কি বলেছিলেন :[৮]

তার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম নাশ ॥..
নীলাচলে আছি মুই তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে তিনি থাকেননি। লোকালয়

থেকে দূরে থাকলে তাঁর দ্বারা প্রচারিত ভক্তির কোনও সামাজিক তাৎপর্য থাকত না। বলা হয়েছিল, "জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী"। মানুষের প্রতি মমত্ববোধই চৈতন্যের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তার জন্যই তাঁর তথাকথিত "মায়া" বিষয়ক শাঙ্কর তত্ত্ব ভাল লাগেনি। মানুষকে এবং পৃথিবীকে নিতান্তই "মায়া" ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সমাজে ছিলেন বলেই চৈতন্য সন্ন্যাসীরূপে খুব সাবধানে থাকতেন। রামানন্দ রায়কে তিনি বলেন :[৯]

...আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায় ॥

তিনি এক সুন্দরী বিধবা যুবতীর শিশু সন্তানকে ভালবাসতেন বলে তাঁরই এক অন্তরঙ্গ পরিকর তাঁকে কথা শুনিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[১০] অর্থাৎ, সমাজে থাকার জন্য তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক স্নেহকেও চেপে রাখতে হয়েছে। বহু ভক্ত-পরিকর নবদ্বীপ থেকে পুরীতে এসে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হতেন। কিন্তু সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া কখনই পুরীতে আসেননি। চৈতন্য নিজেই শান্তিপুরে গিয়ে মাকে দেখে এসেছিলেন। নবদ্বীপ ছেড়ে আসার পরে চৈতন্য পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কখনও একটি কথা বলেননি। তাঁর সন্ন্যাসধর্মে পত্নীর কোনও স্থান ছিল না। চৈতন্যের মানসে কী চিন্তা ছিল, তা তো জানার উপায় নেই।

চৈতন্যের অনুচর ছোট হরিদাস এক বৃদ্ধার কাছ থেকে চাল এনে তাঁকে রেঁধে খাইয়েছিলেন। তা জানতে পেরে চৈতন্য তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করেছিলেন। তা শুনে চৈতন্য বলেন : "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্", অর্থাৎ মানুষকে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে।[১১] রাধাকৃষ্ণের নিরন্তর লীলা যে ধর্মবিশ্বাসের প্রাণবস্তু, তার অভ্যাসে চারিত্রিক দুর্বলতা যাতে না দেখা দেয়, তার জন্য চৈতন্য তাঁর অনুগামীদের বার বার সাবধান করেছেন। অথচ, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর সঙ্গেই তিনি তত্ত্বালোচনা করেছিলেন। কিন্তু রামানন্দের "দেবদাসী" ছিল :[১২]

এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন ॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥

রায় রামানন্দ যে-কোনও ঐতিহাসিকের বিচারে এক বিরাট সমস্যা।[১২ক] তাঁর

দেবদাসী সংসর্গ কোনই সমস্যা নয় ; এটা কোনও ঘটনা নয়। সমস্যা হল এই যে, যে চৈতন্য প্রায় বিনাদোষে ছোট হরিদাসকে "স্বকর্মের ফল ভোগ" করতে বাধ্য করলেন, সে চৈতন্যই দেবদাসীর গুহ্যাঙ্গদর্শী ও স্পর্শী রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করেন। তত্ত্বালোচনা করার জন্য চৈতন্যের মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কি আর কোনও লোককে খুঁজে পেলেন না ! রামানন্দ রায়ের দেবদাসী-সহবাসের বিশদ বিবরণ কেন যে কবিরাজ-গোস্বামী দিলেন, তাও স্পষ্ট নয়। ব্যাপারটা আপত্তিজনক ছিল বলেই কি তিনি তার বিশদ বিবরণ দিলেন ? রামানন্দের "ভাবোদ্গম"-শিক্ষণ-প্রণালী কী তাঁর পছন্দ হয়নি ? চৈতন্যের ব্যবহারে কেন এই স্ববিরোধ ? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর নেই। রামানন্দ রায় চৈতন্যকে গান শুনিয়েছিলেন :[১৩]

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল...
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥

রাধাগোবিন্দ নাথের মতে এই গীতে কৌশলে রাধাকৃষ্ণের বিবর্তবিলাস অথবা বিপরীত রতি ব্যঞ্জিত হয়েছে।[১৪] চৈতন্য এই গান শুনতে শুনতে রামানন্দ রায়ের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরেন ; কিন্তু রাধাগোবিন্দ নাথ এই বিবর্তবিলাসের অথবা বিপরীত রতির দার্শনিক ও নান্দনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সতের পৃষ্ঠা ধরে। তাঁর হাস্যকর সিদ্ধান্ত :

"প্রেম বিলাস-বিবর্তের মূর্ত্তরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর"।[১৫]

রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের কথা বলার এই হল পরিণাম। তিনি বিপরীত-রতি-বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। তিনি ঘরবাড়ি জননী স্ত্রীকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিবর্ত-তত্ত্বে কোথায় তলিয়ে গেল।

৩

একদিন চৈতন্যবিদূষক রামচন্দ্র পুরী চৈতন্যের ঘরে এসে বহু পিঁপড়ে দেখে বিচিত্র শ্লোক আবৃত্তি করলেন :[১৬]

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো ! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্মুত্থায় গতঃ ॥

[রাতে এ ঘরে গুড়ের/চিনির মিঠাই ছিল। তাই এখানে এত পিঁপড়ে ঘুরছে। অহো ! বিষয়ে বিরক্ত সন্ন্যাসীদের এমন ইন্দ্রিয়লালসা ! এই বলতে

বলতে উঠে চলে গেলেন।]

এই ঘটনার একটি কৌতূহলোদ্দীপক নৈয়ায়িক ব্যাখ্যাও আছে। রামচন্দ্র পুরী যা বলেছিলেন, তা ছিল "বাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের আরোপ।" যদি আগুন না থাকে, তবে ধোঁয়া থাকে না। যদি মিঠাই না থাকে তবে পিঁপড়ে থাকে না। আগুন আছে বলেই ধোঁয়া আছে। মিঠাই আছে বলেই পিঁপড়ে আছে। এ ভাবে "দোষ না থাকিলেও তর্কদ্বারা দোষেব আরোপ করে।"

চৈতন্য রামচন্দ্র পুরীর অভিযোগ শুনে খুব দুঃখিত হলেন। "প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মন", লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। চৈতন্যই বলেছিলেন :[১৭]

বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদরভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

এখন 'ঐক্ষব" ভোজনের অভিযোগ শুনে চৈতন্য তাঁর অনুচর গোবিন্দকে বললেন :[১৮]

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥

অর্থাৎ জগন্নাথের পিণ্ডভোগের এক চতুর্থাংশ "পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন" সহ তিনি খাবেন। তা থেকেও আবার প্রসাদ রেখে দিতে হবে। অর্থাৎ, চৈতন্য প্রায় উপোস করেই থাকবেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেক জায়গায় খাদ্যদ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন।[১৯] চৈতন্য-জীবনীর অনুষঙ্গে এ সব তালিকা গভীর অর্থবহ। সন্ন্যাসী চৈতন্যের নিজের তো কোনই রোজগার ছিল না। ভক্তবৃন্দ তাঁকে দেখতেন, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চৈতন্যের নিজস্ব কোনও 'নিয়ম' ছিল কি না, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না ; তবে তাঁর সঙ্গে ভক্তবৃন্দ না থাকলে হয়তো "শাকপত্র ফলমূলে উদরভরণ"-ই দুর্নিবার হত। তিনি "জিহ্বার লালসে ইতিউতি" ধাওয়ার মতো ক্ষুদ্র, সামান্য মানুষ ছিলেন না। মুস্‌কিল তখনই হয়, যখন ভক্তবৃন্দ রকমারি বৈষ্ণবীয় রান্না করে তাঁকে সব খাওয়াতে চান। একবার বাসুদেব সার্বভৌম তিন মণ ঘৃতসিক্ত ভাত সহ তেত্রিশ-চৌত্রিশ রকমের ব্যঞ্জন ও মিষ্ট বানিয়ে চৈতন্যকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তপশ্চর্যায় কৃশ চৈতন্যের পক্ষে নিশ্চয় তিন মণ ঘি-ভাত খাওয়া সম্ভবই ছিল না। তবুও সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ বলেন :[২০]

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বারোজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥

"নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা"। চৈতন্যের পরিকরদের সংখ্যা কম ছিল

না। তাঁরাও এসব খেতেন। চৈতন্য কীর্তনিয়াদের খাওয়াতেন[২১] ; কখনও কখনও কাঙালি ভোজনও করাতেন, ভোজনরত কাঙালিদের সামনে এসে বলতেন : "হরিবোল" ; "হরিবোল বলি কাঙাল প্রেমে ভেসে যায়।"[২২] কিন্তু ভক্তবৃন্দের অনুরোধে বেশি খেয়ে চৈতন্যের আমাশয় বোগ হয়। আবার তা সারাবার জন্য রাঘব পণ্ডিতের ভক্তিমতী ভগ্নী দময়ন্তী সুদূর পাণিহাটি থেকে চৈতন্যের জন্য যে "ঝালি" পাঠালেন, তাতে নানাবিধ লাড়ু, সন্দেশ, মণ্ড, এবং কাসন্দি ছিল।[২৩] চৈতন্য সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপেই পূজিত হতেন। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তিনি একটু ছুঁয়ে দিলেও তা ভক্তদের "প্রসাদ" হয়ে যেত। চৈতন্যের পক্ষে সমস্ত কিছু ভক্ষণ করা যখন আদৌ সম্ভব ছিল না, তখন ভক্তরা মাঝে মাঝে তাঁকে দিয়ে "প্রসাদ" করিয়ে ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করতেন। এই "প্রসাদ" করেও তাঁর আমাশয় হয়। বৈষ্ণবরা যে অতিমানব ছিলেন না, এ সব ভোজনের বৃত্তান্তে তা সুস্পষ্ট। চৈতন্যও যে স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, তার একটা প্রমাণ হল এই যে, "রাঘবের ঝালি"তে শুধু তিনিই ইচ্ছা হলে হাত দিতেন। এক বৎসর ধরে খেতেন। "টোটা", অথবা 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক উদ্যানে ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যের বনভোজনেরও উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণদাস।[২৪]

মানুষ চৈতন্যই আমাদের মন ভরে রাখেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :[২৫]

> মুখ-শিট্‌কান বিকট মূরতি দেখিলে উপজে ভয়।
> তপস্য ততটুকুই ভাল যতটুকু দেহে সয় ॥

চৈতন্য "মুখ-শিট্‌কান বিকট মূরতি" ছিলেন না। চৈতন্যের ভক্তির উদ্দেশ্য ছিল মানবজীবনকে সমৃদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ করে তোলা ; জীবনকে অস্বীকার করা তাঁর আদর্শ ছিল না। সংখ্যাতীত ভক্তদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন ; তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কীর্তনে যোগ দিয়েছেন, নৃত্য করেছেন। যবন হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরতে তাঁর বাঁধেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সামাজিকতা ও রসবোধ অক্ষুণ্ণ ছিল। মানুষকে তিনি ভুলে যাননি। গুণীকে মর্যাদা দিয়েছেন ; গুরুজনদের সম্মান করেছেন ; এমন কী নিতান্ত বালক কবি কর্ণপূরকেও তিনি আদর জানিয়েছেন। এই মানুষ চৈতন্যই আমাদের মনটাকে টানেন ; তাঁর উপরে আরোপিত ঈশ্বরত্ব বহুলাংশে দুর্বোধ্য মনে হয়। সর্বদাই তিনি ঈশ্বর হয়ে থাকেননি। তাঁর দিন যাপনের বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ :[২৬]

> ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
> যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥
> কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর-জন।
> কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য প্রকটন ॥
> কভু রামচন্দ্র পুরীর হন ভৃত্য প্রায়।
> কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণ প্রায় ॥

চৈতন্য যখন পুরীতে থাকতে শুরু করলেন তখন সেখানে "পঞ্চশাখা" উড়িয়া বৈষ্ণবগণ সক্রিয় ছিলেন।[২৭] পঞ্চশাখা চৈতন্যকেও গুরু ভাবতেন। তাঁদের সাহিত্যে চৈতন্যের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা তাঁকে অবতার বলে ভাবতেন। পঞ্চশাখার বৈষ্ণব ঈশ্বরদাস 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। তাতে চৈতন্য ঈশ্বর রূপে বর্ণিত হয়েছেন। পঞ্চশাখার ঐতিহ্য অনুসারে রাজা প্রতাপরুদ্র পঞ্চশাখাকে আমল দিতেন না। কিন্তু চৈতন্য নিজে উড়িয়া ভাষায় 'ভাগবতপুরাণ'-এর অনুবাদক জগন্নাথ দাসকে এবং উড়িয়া ভাষায় রামায়ণ রচয়িতা বলরামদাসকে শ্রদ্ধা করতেন। ঐতিহ্য অনুসারে চৈতন্য জগন্নাথদাসকে "অতিবড়ি" আখ্যা দিয়েছিলেন। পঞ্চশাখার বৈষ্ণবতত্ত্বে শ্রীরাধার গুরুত্ব ছিল না। উড়িয়া কবি বলরামদাসের মতে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক ছিল ভাইবোনের সম্পর্ক। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ-বলরামের মাঝে ভগ্নী সুভদ্রার দারুমূর্তি এই সম্পর্কের ব্যঞ্জনা বহন করেন।

ক্রমশ পঞ্চশাখার সঙ্গে বঙ্গীয় অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতবিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর দাস চৈতন্যকে বুদ্ধের অবতাররূপে বর্ণনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বুদ্ধকে মেনে নিতে পারেননি। পঞ্চশাখার বৈষ্ণবদের সঙ্গে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের কলহ চৈতন্যের বিরক্তি উৎপাদন করে। একটি মত অনুসারে এই জন্যই চৈতন্য সর্বদা নিজের ভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন। দিবাকরদাস-রচিত 'জগন্নাথচরিতামৃত' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অভিমান করে পুরী থেকে যাজপুরে চলে যান। তাঁদের পুরীতে ফিবিয়ে নিয়ে আসার জন্য চৈতন্যও যাজপুরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন "অতিবড়ি" জগন্নাথ দাস। ফলে কোনও মীমাংসা হয়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা চৈতন্যকেও বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। চৈতন্য তাঁদের অনুরোধ না শুনে পুরীতেই ফিরে এলেন। (বৃদ্ধা মাতাকে নবদ্বীপে রেখে সুদূর বৃন্দাবনে গিয়ে থাকা চৈতন্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না।) সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন :[২৮]

> With whatever pinch of salt one should take these narratives, this at least was true that there was a parting of ways and Shri Chaitanya had to encounter a desertion...The parting of ways actually resulted from some basic difference in attitude.

যদিও "অতিবড়ি"-বৈষ্ণবদের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ ঘৃণাক্ষরেও আলোচনা করেন না, তবুও তা নিঃসন্দেহে পুরীতে চৈতন্যের শেষ দিনগুলির উপর আলোকপাত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের "অন্তলীলা"ভাগে ১৬ থেকে ১৯ পরিচ্ছেদে যে তথ্য আছে, তা পড়ে মনে হয় যে, চৈতন্য মনোবেদনায় বড় কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর এই বিষাদের অভিব্যক্তি দেখা যায় তাঁর বিরহবেদনাময় "রাধাভাব"-এ; তাঁর গম্ভীর আত্মনিমগ্নতায়, এবং শেষ পর্যন্ত "যমুনাভ্রমে" গভীর রাত্রিতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ায়। কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁকে

যে সব বৈষ্ণবরা ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁদেরই কর্তব্যে অবহেলার জন্য বঙ্গের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান, সুমহান সাধক চৈতন্য গভীর রাত্রিতে সাগরে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন। সম্ভবত সাগরের সফেন তরঙ্গমালায় দুর্বল চৈতন্যের অকালে সলিল সমাধি হয়েছিল। অথচ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, তারপরেও চৈতন্য বেঁচে ছিলেন। এটা বিশ্বাস করা শক্ত। আত্মহননের প্রবণতা চৈতন্যের আগেও দেখা গেছে।[২৯] রাধাগোবিন্দ নাথ লিখেছেন: যে ভাবেই হউক, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন।[২৯ক] অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে চৈতন্যের মৃত্যু হয়নি, অন্তর্ধান হয়েছে। এমন বিরাট লোক প্রয়াত হলেন; সেই মহাপ্রয়াণের প্রকৃত বিবরণ জানাই গেল না। এটাও নিঃসন্দেহে এক অদ্ভুত ঘটনা।

৫

যে বিশাল জটিল তত্ত্বমঞ্জরী চৈতন্যের নামকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়, তার কোনও প্রতিবিম্ব কিন্তু চৈতন্যের "অষ্টশিক্ষাশ্লোক"-সমূহে দেখা যায় না। এ সব শ্লোকে ভক্তি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, ভক্তির গভীর তত্ত্ব, কিংবা কৃষ্ণলীলার তত্ত্ব তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ সব কবিতা সরল এবং প্রাণের কথায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই আটটি শ্লোক উদ্ধৃত হল:[৩০]

১. চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনং ॥

(শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করে। ভবের মহা দাবাগ্নিকে নিবিয়ে দেয়। যেমন চন্দ্রালোকে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, তেমন শ্রেয় বোধকে পরিস্ফুট করে। বিদ্যারূপিণী বধূকে প্রাণবতী করে। মনে আনন্দসাগরকে উদ্বেলিত করে। পদে পদে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদন দিয়ে হৃদয়কে মাতিয়ে দেয়, এবং সমগ্র আত্মাকেই যেন সুধারীধারায় স্নান করায়। এমন যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন, তারই বিজয়।)

২. নাম্নামকারিবহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥

(ভগবন্! জীবের মঙ্গলের জন্য আপনি বহুবিধ নামের প্রকটন করে সে সব নামে আপনার সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সে সকল নাম-স্মরণেরও

নিয়মিত কোনও কাল নেই। আপনার এমন কৃপা! অথচ আমার এমনই দুর্দৈব যে, আপনার নামে আমার অনুরাগ নেই।)

৩. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(তৃণ থেকে নিচু হয়ে, গাছের চেয়েও সহিষ্ণু হয়ে, সম্মান লাভের বাসনা পরিত্যাগ করে, মাননীয় ব্যক্তিকে সম্মান করে কৃষ্ণনাম করতে হয়।)

৪. ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

(জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরীসান্নিধ্য, কবিতা,— এ সব চাই না। জন্মে জন্মে আমার ঈশ্বরে নিষ্কারণ ভক্তি হোক্।)

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত
ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

(নন্দপুত্র! আপনারই দাস আমি। বিষয় ভবসাগরে নিপতিত আমাকে আপনি কৃপা করে আপনার পদকমলের ধূলা ভাবুন।)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ
কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

(আপনার নামগ্রহণ কালে কবে আমার দুই নয়ন অশ্রুবর্ষণ করবে, বদন গদ্‌গদস্বরে রুদ্ধ হবে, শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হবে?)

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

(গোবিন্দর বিরহে যেন এক এক মুহূর্ত আমার এক এক যুগ। চোখ থেকে যেন বরষা ঝরে। সমস্ত জগত শূন্য হয়ে যায়।)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

(আমি চরণের অনুরাগিণী ; আমাকে আলিঙ্গন করে লম্পট আমাকে পেষণ করুন ; আমাকে দেখা না দিয়ে আমাকে মর্মপীড়া দিন ; তাঁর যা ইচ্ছা তাই করুন। তবুও অন্য কেউ নয়, তিনি আমার প্রাণনাথ)

একটি প্রাসঙ্গিক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল এই যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কামিনীকাঞ্চনে বিরক্ত সন্ন্যাসী চৈতন্যের দ্বারা দুই বার আবৃত্তি করিয়েছেন একটি সুগভীর আদিরসাত্মক শ্লোক। শ্লোকটি উদ্ধৃত করি :[৩১]

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপাস্
তে চোন্মীলিতমালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বনিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতল্লে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

[যে রেবানদীর তীরে বেতসীতরুতলে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল এখন সে আমার বিবাহিত স্বামী। যে চৈত্ররাতে সে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল, আজও তেমনই চৈত্রের রজনী। কদম ফুলের গাছ দুলিয়ে, ফোটা মালতী ফুলের গন্ধ নিয়ে সে রাতের বাতাস আজও বইছে। আমিও সেই নায়িকাই আছি। কিন্তু সুরতের জন্য (ঘর নয়) সেই রেবানদীর তীরে বেতসীতরুতলে যাওয়ার জন্যই আমার চিত্তে প্রবল উৎকণ্ঠা।]

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়,— কামিনীকাঞ্চনে বিরক্ত, ভক্তিমূলক সদাচারের প্রচারক চৈতন্য কৌমার্যহরণ বিষয়ক এমন আদিরসাত্মক শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের সাহায্যে তারও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

সূত্রের উল্লেখ

১. Tridandi Bhiksu Bhakti Pradip Tirtha, *Sri Chaitanya Mahaprabhu* (Madras, Gaudiya Mission, 2nd ed. 1947) p.1
২. চৈ. ভা, পৃ. ৪১৪
৩. চৈ. ভা, পৃ. ৪১৫
৪. চৈ. ভা, পৃ. ৪১৬
৫. Sushil Kumar De, *Early History of the Vaisnava Faith And Movement In Bengal* (Calcutta, firma K.L. Mukhopadhyay, 1961), p. 15; Stuart Elkman, *Jiva Gosvamin's Tattvasandarbha: A Study of the Philosophical and Sectarian Developments of the Gaudiya Vaisnava Movement* (Delhi, Motilal Banarsidass, 1986) pp. 1-20; A.K. Majumder, *Caitanya: His Life And Doctrine* (Bombay, Bharatiya Vidyabhavan, 1969)
৬. চৈ. ভা পৃ. ৫৫ ; দ্রষ্টব্য : Friedhelm Hardy, "Madhavendra Puri : A Link Between Bengal Vaisnavism and South Indian Bhakti" *[Journal of Royal Asiatic Society*, London, 1974]
৭. চৈ-চ, পৃ. ২৮৩
৮. চৈ-চ, পৃ. ৩৮৭
৯. চৈ-চ, পৃ. ৩৪৮

১০. চৈ-চ, পৃ. ৬৯৪
১১. চৈ-চ, পৃ. ৬৯০-৯৩
১২. চৈ-চ, পৃ. ৭২১-২৩
১২ক. Joseph T. O' Connell, "Were Chaitanya's Vaisnavas Really Sahajiyas? The Case of Ramananda Raya", Tony K. Stewart ed. *Shaping Bengali Worlds, Public and Private* (East Lansing, Michigan, 1989), pp. 11-22.
১৩. চৈ-চ, পৃ. ২৯২
১৪. রাধাগোবিন্দ নাথ, প্রাগুক্ত, "প্রেমবিলাস বিবর্ত", পৃ. ২২৩-২৩৯ ; বিপরীত রতির এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা বোধ হয় আর একটিও নেই।
১৫. তদেব, পৃ. ২৩৯
১৬. চৈ. ভা, পৃ. ৭৫৭-৫৮
১৭. চৈ. ভা, পৃ. ৭৩৯
১৮. চৈ. ভা, পৃ. ৭৫৮
১৯ চৈ. ভা, পৃ. ২১৭-২১৯, ৩৭০-৩৭১ ; ৩৯৫-৩৯৬, ৭৩৮, ইত্যাদি।
২০. চৈ. ভা, পৃ. ৩৯৭
২১. চৈ. ভা, পৃ. ৩৭০
২২. চৈ. ভা, পৃ. ৩৭১
২৩. চৈ. ভা, পৃ. ৭৬৮-৬৯
২৪. চৈ. ভা, পৃ. ৭৭২-৭৩
২৫. সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মৃতিকথা' [কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯] পৃ. ১০৫-১০৬ ; দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রয়াণের কিছুকাল পূর্বে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন।
২৬. চৈ. ভা, পৃ. ৭৬১
২৭. Prabhat Mukherjee, *The History of Mediaeval Vaisnavism in Orissa (New Delhi, Asian Educational Services, 1981) Ch. 6, pp. 73-91; Ch. 9, pp. 123-147;* Chittaranjan Das, *Balaram Das* (New Delhi, Sahitya Akademi, 1982) pp. 61-82; চিত্তরঞ্জন দাস, "অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চশাখা ধর্ম" (বিশ্বভারতী, ১৯৫১)
২৮. Chaittaranjan Das, উপরিউক্ত, p.80; Prabhat Mukherjee, p. 140.
২৯. যথা, চৈ. ভা, ২২৯-২৩০ ; প্রফুল্লকুমার সরকার এই অনুমান করেছেন যে, চৈতন্যের "সমুদ্রে পতনের ফলেই দেহত্যাগ হইয়াছিল"। প্রফুল্লকুমার সরকার, 'শ্রীগৌরাঙ্গ' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮১ সাল)। পৃ. ১৪২ দ্রষ্টব্য।
৩০. দ্রষ্টব্য, চৈ-চ, অন্ত্যলীলা, পরিচ্ছে-২০
৩১. চৈ. চ, পৃ. ১৮৭-৮৮ ; ৬৬৪ ; 'পদ্যাবলী', শ্লোক ৩৮৬; পৃ. ৩৬৪-৬৫। মহিলা কবি শীলভট্টারিকা রচিত এই শ্লোকটি বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য : বিশ্বনাথ কবিরাজ, 'সাহিত্য দর্পণ' (বেনারস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৫৫), পৃ. ১৫ ; নারায়ণরাম আচার্য কাব্যতীর্থ, 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্' (বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৫২) "অসতীচরিত্রম্", পৃ. ৩৫৩, শ্লোক-৪২ ; বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান গোস্বামিগণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বৈষ্ণব ভক্তির তাত্ত্বিক রূপ বৃন্দাবনে পরিস্ফুট হয়েছিল। যাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম" একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীরূপে অদ্যাবধি সুবিখ্যাত। তাঁরা হলেন সনাতন গোস্বামী, তাঁর ভাই রূপ গোস্বামী, তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথভট্ট গোস্বামী এবং রঘুনাথদাস গোস্বামী। শেষোক্ত ছিলেন শূদ্র'। অন্য গোস্বামিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। রঘুনাথদাস গোস্বামীর মতো এক বিশিষ্ট শূদ্র তত্ত্বাচার্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা ছিল। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামও স্মরণীয়।

সনাতন গোস্বামী ছিলেন সুলতান হোসেন শাহ্‌র "দবীর খাস" অর্থাৎ ব্যক্তিগত সচিব। রূপ গোস্বামী ছিলেন "সাকর মল্লিক" অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সুদূর কর্ণাটক থেকে বঙ্গে এসেছিলেন। যশোহর জেলার যুসুফ্‌পুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণা এই ভাইদের অধিকারে ছিল; এ জন্য তাঁরা যৎকিঞ্চিৎ রাজস্বও দিতেন। অবশ্যই তাঁরা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ছাড়াও আরবী ফার্সি ভাষা জানতেন। এমন সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ধনী, উচ্চপদস্থ দুই ভাই কেন যে চৈতন্য-প্রচারিত ভক্তিকে সমর্থন করে দেশত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন, তা স্পষ্ট নয়। লোকশ্রুতি অনুসারে গৌড়নগরের প্রান্তে অবস্থিত রামকেলিতে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক হলেও নবদ্বীপের প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিত সমাজে সম্ভবত "যবন"দের সঙ্গে থাকার জন্যই রূপ-সনাতনের কোনও স্থান ছিল না। চৈতন্যই তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী চূড়ান্ত দরিদ্রের জীবন বরণ করেন :[১]

অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক শয়ন ॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥
কড়োয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্তন উল্লাস ॥

কোনও এক অনির্দেশ্য আলোকে রূপ-সনাতনের প্রাণের প্রদীপ জ্বলেছিল; তাই তাঁরা গাছের তলায় থেকে শুষ্ক রুটি চানা চিবিয়ে খেয়ে কৃষ্ণকথা-কৃষ্ণনামে নর্তন উল্লাসে আনন্দে ভেসেছেন। প্রায় অনাহারে থেকেও সনাতন গোস্বামী লিখেছিলেন 'বৃহৎভাগবতামৃতম্', 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী'; বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপ গোস্বামী লিখেছিলেন 'লঘুভাগবতামৃতম্', 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা', 'বিদগ্ধমাধবম্', 'ললিতমাধবম্', 'দানকেলিকৌমুদীভণিকা', 'হংসদূতম', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি'; এবং সম্পাদনা করেছিলেন 'পদ্যাবলী' সংকলনটির। জীব গোস্বামীর অজস্র সৃষ্টি; তার মধ্যে বিখ্যাত 'ষট্ সন্দর্ভ'; 'গোপাল চম্পূ', এবং 'মাধবমহোৎসবম্'। গোপালভট্ট গোস্বামী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ; তিনি কখনও বঙ্গে এসেছিলেন কি না জানা যায় না। সম্ভবত, সনাতন গোস্বামীর সাহচর্যে তিনি 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করেন। রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ছিলেন বারাণসীর তপন মিশ্রের পুত্র। তিনি এক সময়ে পুরীতে এসে চৈতন্যের কাছে থাকেন। তিনি খুব ভাল রান্না করতে পারতেন : "রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ/ যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম ॥" —লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি বিখ্যাত ভাগবত পাঠক ছিলেন :[২]

রূপ গোসাঞীর সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তাঁর মন ॥
অশ্রু কম্প গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের খাজনা-সংগ্রাহক ধনী "মজুমদার" পরিবারের সন্তান। তিনি যৌবনে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হন। পুরীতে এসে পচে যাওয়া ভোগের প্রসাদ জল নুন দিয়ে খেতেন তিনি : "আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন"। বঙ্গীয় "শূদ্র"-দের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয়, তবে তাতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে থাকবে। তিনি লিখেছিলেন 'স্তবাবলী', 'মুক্তাচরিত্রম্', এবং 'দানকেলি চিন্তামণি'। সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল।

নবদ্বীপে এবং পুরীতে চৈতন্য নিজে তো কখনই "জ্ঞান"-এর উপরে জোর দেননি। "দানেকুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই"—লিখেছেন মহাকবি বৃন্দাবনদাস।[৩] কিন্তু তবুও কেন বৃন্দাবনের প্রতিভাশালী গোস্বামীরা, বিশেষ ভাবে জীব গোস্বামী, রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর অদ্যাবধি পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আনুমানিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ একাধিকবার লিখেছেন যে, এ বিষয়ে চৈতন্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। প্রয়াগে মহাপ্রভু চৈতন্য রূপ গোস্বামীকে সব শিখিয়েছিলেন :[৪]

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল
সর্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল।

কৃষ্ণদাস একথার প্রমাণরূপে কবি কর্ণপূরকে সাক্ষি করেছেন।

বৈষ্ণবীয় ভক্তিপ্রচারে ব্রাহ্মণদের বিদ্যাচর্চা ব্যাহত হয়নি। প্রথমে নামকীর্তন ও নগরকীর্তন জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু নবদ্বীপের ভট্টাচার্য-সংস্কৃতির উপরে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ভট্টাচার্যদের এবং তাঁদের "পড়ুয়া"দের বিরোধিতা ছিল দুরতিক্রম্য। তার ফলে চৈতন্যকে ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে হয়। তা থেকে এটা বোঝা গেল যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তির যদি কোনও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা না থাকে, সংস্কৃত ভিত্তি না থাকে, তবে তা প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের বিচারে কখনই গ্রাহ্য হবে না। তাই গোস্বামীদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলিতে প্রমাণসহ আলোচিত হল পৌরাণিক তত্ত্ব, দর্শন, কান্তিবিদ্যা, এবং ব্যাকরণ। রচিত হল সংস্কৃত কাব্য, নাটক, এবং প্রামাণিক বৈষ্ণব স্মৃতি। স্মার্তপণ্ডিতগণ এবং নব্যনৈয়ায়িকগণ যখন শুধু সীমাবদ্ধ বিষয় নিয়ে রাশি রাশি পুথি লিখেছেন, তখন বৈষ্ণব গোস্বামীরা সৃষ্টির প্রাচুর্যের দ্বারা বঙ্গে সংস্কৃতচর্চাকে অসমান্য সমৃদ্ধি দান করেছেন। যদুনাথ সরকারের মন্তব্য স্মরণীয় :[৫]

> A revived and widespread study of Sanskrit among all castes...has vivified and sweetened Bengal's intellectual life, no less than the spiritual and greatly broadened the basis of our culture.

২

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্'-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন প্রতিভার জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লেখেননি। যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন যে, ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে অকৃতদার তরুণ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস লিখেছেন : বর্ধমান জেলায় ঝামটপুর গ্রামে তাঁর বাড়িতে একদা সংকীর্তনকালে নিত্যানন্দের অবমাননা করা হয়। সে রাতেই

...স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।

নিত্যানন্দ স্বপ্নেই তাঁকে বলেন :

অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্বলভ্য হয় ॥[৬]

নিত্যানন্দের আদেশে তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। সেখানে

রূপ-সনাতনের কাছে পেলেন আশ্রয় ; সনাতনের কাছ থেকে পেলেন ভক্তির সিদ্ধান্ত ; রঘুনাথ দাসের কাছে পেলেন "শ্রীস্বরূপআশ্রয়" ; আর শ্রীরূপের কাছে পেলেন "রসভাবপ্রান্ত"। তবুও অসাধারণ তাঁর বিনম্রতা :[৭]

জগাইমাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ ॥

রাধাগোবিন্দনাথের মতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন রঘুনাথভট্ট গোস্বামী।

অথচ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন কৃষ্ণদাসের গবেষণার প্রধান নির্দেশক। তাঁর কাছ থেকে কৃষ্ণদাস চৈতন্য সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন কারণ, নীলাচলে অবস্থানকালে তিনি চৈতন্যের "একান্ত সচিব" স্বরূপ দামোদরের প্রিয় পরিকর ছিলেন। স্বরূপ দামোদরের যে আসল "কড়চা" হারিয়ে গেছে, তা কৃষ্ণদাস পড়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের শিক্ষাদীক্ষা বৃন্দাবনে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়লে বোঝা যায়, বঙ্গের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অসংখ্য বঙ্গীয় বৈষ্ণবের খবর তিনি রাখতেন ; কোন্ বঙ্গীয় বৈষ্ণবের সাধনার কী বৈশিষ্ট্য ছিল, তা তাঁর জানা ছিল। তাই অনুমান করি, চৈতন্যের জীবনী-রচনার প্রয়োজনে উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে "ক্ষেত্রকর্ম" করেছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের "শাখা-নির্ণয়" বেশ দুরূহ ছিল। কৃষ্ণদাসকৃত "শাখানির্ণয়" অদ্যাবধি অপরিবর্তনীয়।

আরও অনুমান করি, সংস্কৃতে এবং বাংলায় কবিতা লেখার অভ্যাস কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল ধরে করেছেন। তিনি লিখেছেন :[৮]

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥

আমরা বিস্মিত হই না, কারণ আমরা বুঝি যে, রচনার অথবা সর্জনার অপ্রতিহত অভ্যাস না থাকলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'গোবিন্দলীলামৃত' লেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, নিজেকে পুরীষের কীট হতেও লঘিষ্ঠ ভেবে কৃষ্ণদাস তাঁর তথ্যসংগ্রহপ্রক্রিয়ার এবং অন্যান্য রচনার কোনও নিদর্শন রেখে যাননি। তাতে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল যে; সহজিয়া বৈষ্ণবরা তাঁর নাম ব্যবহার করে তাঁদের বেশ কিছু অবাচীন পুথি গ্রামে-গঞ্জে প্রচার করলেন, এবং দলীয় স্বার্থে তাঁর পবিত্র চরিত্র পর্যন্ত হনন করলেন। "ব্যক্তি" কৃষ্ণদাস অজ্ঞাত হয়ে রইলেন ; কেউ বললেন না, "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতার ইতিহাস চেতনায় দীপ্তিমান্। চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা এই মহাকবির রচনার গুণে যেন চোখের সামনে ভাসে। কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-ও ইতিহাস বিষয়ক এক মহাগ্রন্থ।

'চৈতনভাগবর্ত'-এর চেয়ে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ব্যাপকতর এবং গভীরতর। 'চৈতন্যভাগবত' সুনিশ্চিতভাবে চৈতন্যলীলার "নিত্যানন্দবাদী" ভাষ্য। আর 'চৈতন্যচরিতামৃত' সুনিশ্চিতভাবে সেই লীলার "বৃন্দাবনী গৌড়ীয়" ভাষ্য। দ্বিতীয় ভাষ্য প্রথম ভাষ্যের পরিপূরক; দু'টি ভাষ্যই রচয়িতাদের ইতিহাস চেতনায় ভাস্বর।

বড়ই দুঃখের বিষয় সুশীলকুমার দে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শুধু স্ববিরোধ, শুধু ভ্রান্তি, শুধু অনৈতিহাসিক বিচার, এবং প্রায়শ কুম্ভিলকত্ব দেখতে পেয়েছেন।[৯] এই মহাগ্রন্থের এমন নেতিবাচক বিচার করার পূর্বে কতগুলি যুক্তির বিচার অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। আমরা এখন যে ভাবে ইতিহাসকে দেখি, ঐতিহাসিকতার মান নির্ণয় করি, ইতিহাসের গবেষণায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করি, ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদাসের কালে তা তো জানা ছিল না। কৃষ্ণদাস প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। কৃষ্ণদাসের দ্বারা ব্যবহৃত প্রমাণ আমরা মানব কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর। তখন ভাসমান ঐতিহ্য থেকে আহৃত তথ্য, এবং শ্রদ্ধেয় গুরু এবং ধর্মাচার্যদের দ্বারা কথিত তথ্য এবং লিখিত বাক্যাবলি প্রামাণিক তথ্যরূপে গ্রাহ্য ছিল। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, চৈতন্যের জীবনী কেবলমাত্র এক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনীরূপে বিচার্য ছিল না; চৈতন্যজীবনীর সঙ্গে জড়িত ছিল এক অশেষ তাৎপর্যময় ধর্মতত্ত্ব, এবং প্রায় সর্বাংশে ভাববাদী এক ধর্মীয় মতাদর্শ। চৈতন্য নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও তো স্পষ্ট ভাবে লেখেননি। অতএব, তাঁর কথা যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে যাঁরা সেকালে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁদের উপরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজসহ সমস্ত চৈতন্য-জীবনী-রচয়িতাদের সর্বদা নির্ভর করতে হয়েছে। একারণেই চৈতন্যের জীবনী সমূহে তথ্যের এবং তথ্যবিচারের বিভিন্নতা দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্য রচনাই যখন ছোট বড় বঙ্গীয় কবিদের কাব্য রচনার প্রধান কাব্যাদর্শ, তখন কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে রচনা করলেন একটি বিশিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের, একটি নির্মীয়মান বৈষ্ণব-সংস্কৃতির, এক বাঙালি মহাজীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এই সুকঠিন, জটিল, বহুতত্ত্বখচিত, বহুস্তরবিশিষ্ট বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণদাস যে বাংলা ভাষার ব্যবহার করেছেন, বলা যায়, উদ্ভাবনা করেছেন, তার তো তুলনা নেই। তাঁর দ্বারা রচিত পরিভাষাসমূহ, এবং পরিভাষাসমূহের প্রযোগ-পদ্ধতি অদ্যাবধি আদর্শরূপে বিবেচিত হয়।[১] পরিভাষাকে তিনি এক অসামান্য কৌশলে সুমধুর কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে এক অলৌকিক মহাপুরুষরূপে দেখেছিলেন। হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশু চৈতন্যও তাঁর "প্রভু"। মহাকবি কৃষ্ণদাস চৈতন্যকে প্রথম থেকেই একটি "তত্ত্ব"রূপে বিচার করছেন। চৈতন্য যেহেতু সুমহান ও সুপ্রাচীন তত্ত্বেরই মানবরূপ, তাই চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিও আদ্যন্ত একটি অখণ্ড, একটি পূর্ণ তত্ত্বের ধারাবাহিক পর্যালোচনারূপে পরিকল্পিত হয়েছে। জীবনের সঙ্গে তত্ত্বকে মিশ্রিত করে কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবতাকে এক প্রামাণ্য মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেরূপ কাব্যরচনার দ্বারা রসানুভূতির মূর্তিস্বরূপ চৈতন্যকে স্পষ্ট করে তোলা যায়,

কৃষ্ণদাস সেরূপ কাব্যই লিখেছেন। কেবলমাত্র সুন্দর শব্দের মালা গাঁথাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য বিষয়ক যে কোনও তত্ত্ব, যে কোন কথা মৌলিকভাবে রসাত্মক এবং ভাবমধুর। আরও যে তথ্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এই যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যখন তাঁদের অজস্র রচনায় শুধু কৃষ্ণতত্ত্বের আর কৃষ্ণলীলার বিবরণ রচনা করলেন, তখন বৃদ্ধ কবি কৃষ্ণদাস সেই তত্ত্বে, সেই লীলায় চৈতন্যকে উপস্থাপিত করলেন :[১০]

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর ॥

এই বিচারধারাকে বলা যায় *catechism*, অথবা প্রশ্ন বা জেরা করে পরীক্ষা করা। "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।" কৃষ্ণদাস এইরূপ বিচারধারাদ্বারাই চৈতন্যের জীবন জিজ্ঞাসাকে উপস্থাপিত করে "কৃষ্ণানুশীলন"কে অর্থবহ করে তুলেছেন।

সূত্রের উল্লেখ

১. চৈ-চ. পৃ. ৪৪৮
২. চৈ. চ. পৃ. ৭৯০
৩. চৈ. ভা. পৃ. ১৯৭
৪. চৈ. চ. পৃ. ৪৪৬
৫. Jadunath Sarkar, ed. *The History of Bengal: Muslim Period* (Patna, Janaki Prakashan, 1977), P. 222
৬. চৈ. চ. পৃ. ৯০-৯২
৭. চৈ. চ. পৃ. ৯২
৮. চৈ. চ. পৃ. ২১৪
৯. *Vaisnava Faith And Movement, পূর্বোক্ত, pp. 55-56, মূলাংশ এবং পাদটীকা*
১০. *চৈ. চ. পৃ ২৭২*

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান না থাকলে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। এই কারণে এই অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি পর্যালোচিত হচ্ছে।[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন "প্রমাণ"-এর উপরে ব্যবস্থিত। এই "প্রমাণ" শ্রুতি অথবা বেদ-প্রমাণ। গৌড়ীয় মতে এই প্রমাণই স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, কারণ তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপাদন করতে পারে। শ্রুতি-প্রমাণের সঙ্গে স্মৃতির, পুরাণের ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। এই প্রমাণ কলিযুগে দুর্বোধ্য। তাই তার ব্যাখ্যার জন্য ইতিহাস ও পুরাণ রচিত হয়। অথচ পুরাণ সমূহে বহু দেবদেবীর উপাসনা বিবৃত হয়েছে। কলিযুগে, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক পুরাণের অস্তিত্ব অনুমিত হয়েছে। আবার এটাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে 'ভাগবতপুরাণ'-ই শব্দ-প্রমাণের সব চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা, অথবা বিবৃতি। যেহেতু এই পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই প্রধান দেবতা, তাই কলিকালে কেবলমাত্র কৃষ্ণই পূজনীয়। যদিও 'প্রমাণ'-এর এরূপ ব্যাখ্যায় বহু রকমের ত্রুটি রয়েছে, তবুও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তা মেনে নিলেন।

"ভক্তি" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "ভক্তি" সাধারণ বিষয় নয়। ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুভব করা যায়। এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক অতীন্দ্রিয়, অতএব অনির্বচনীয়। ভক্তি ছাড়া ঈশ্বরের ধারণাই হয় না। ভক্তি বৈধী এবং রাগানুগা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :[২]

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ ধরে ভক্তভাব ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন বৈধী কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ। রাগানুগা ভক্তিতে ভক্তের ঈশ্বরানুরাগ অসহনীয় ভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। অনুরাগের অভিঘাতে ভক্ত ঈশ্বরেই ডুবে যান। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ভক্তের ব্যক্তিস্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। ভক্ত 'তটস্থ' হন। ঈশ্বর যেন সীমাহীন

মহাসাগর ; ভক্ত রাগানুগা ভক্তিতে তাঁর 'তটস্থ'। কৃষ্ণদাসের সুন্দর ভাষায়,

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগে স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ ॥[৩]

রাগানুগা ভক্তি যাঁর থাকে, তিনি পাগলের মতো হয়ে যান। তিনি শাস্ত্র এবং স্মৃতি না মানলেও দোষ হয় না। বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। রাগানুগা ভক্তিতে ভক্তের প্রকৃতি অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 'ভাব' হতে পারে। এসব বিষয় নিয়ে তর্ক চলে না ; "বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর।"

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ", বলেছেন 'ব্রহ্মসংহিতা',[৪] তবুও গৌড়ীয় মতে,

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।[৫]

কৃষ্ণের গোপবেশ ; হাতে বাঁশী। কৃষ্ণ "নবকিশোর নটবর"। এই মানুষ-কৃষ্ণই "নিত্যলীলার হয় অনুরূপ"। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই অখণ্ড আনন্দময়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আনন্দের ঘনীভূত প্রকাশ। সেখানে কৃষ্ণের অনেক সঙ্গী ও সঙ্গিনী আছেন। তাঁরা কৃষ্ণের আনন্দচেতনার মূর্তি। কৃষ্ণের নরবপু অক্ষয়, অব্যয়, সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক, এবং সে অর্থে বস্তুর দ্বারা গঠিত নয়। কৃষ্ণ সৎ, অথবা পরম অস্তিত্ব ; কৃষ্ণ চিৎ, অথবা পরম চৈতন্য ; কৃষ্ণ আনন্দ, অথবা পরমানন্দ। পরমানন্দই কৃষ্ণ-ব্রহ্মণ্-এর আসল স্বরূপ। সৎ এবং চিৎ সেই আনন্দস্বরূপের দু'টি গুণ অথবা লক্ষণ। কৃষ্ণের তিনটি শক্তি আছে। প্রথম "স্বরূপশক্তি" ; দ্বিতীয় "মায়াশক্তি", এবং তৃতীয় "জীবশক্তি"। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, এবং চিদংশে সম্বিৎ—এ সব শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির তিনটি রূপ।[৬] কৃষ্ণ উপনিষদে বর্ণিত "রস", অথবা "আনন্দ"-এর নরবপুধারী প্রকাশ। তাঁর স্বরূপ "সচ্চিদানন্দপূর্ণ"। এ সর শব্দ সম্পূর্ণভাবে পারিভাষিক ; তাদের ব্যাখ্যার উপরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। স্বরূপশক্তির জন্য কৃষ্ণ লীলা করতে পারেন। কৃষ্ণের মায়াশক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব বিধৃত থাকে। কৃষ্ণের জীবশক্তিতে জীবনধারা অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণের জীবশক্তি তাঁর স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির উপরে নির্ভরশীল। স্বরূপশক্তি থাকার জন্যই কৃষ্ণ পরকীয়া লীলা করতে পারেন।

যোগতত্ত্বানুসারে ব্যক্তির আত্মা ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে মিশে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এইরূপ মিশ্রণের তত্ত্বটিকে বর্জন করেন। তাঁরা ঈশ্বর হতে চান না, ঈশ্বরের অংশও হতে চান না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের সুগভীর প্রীতিকে তাঁরা মোক্ষ থেকে অনেক বড় ভাবেন। তাঁদের বিচারে মুক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় এইরূপ বিচার একটি বিশিষ্ট অবদানরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের প্রীতির কোনও "হেতু" থাকে না ; নোয়াখালির নমশূদ্র বৈরাগী গান করেন : "খামাখা (অহেতুক) গৌরাঙ্গ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়"। ভক্তের ঈশ্বরপ্রেমে, কৃষ্ণপ্রেমে, গৌরাঙ্গপ্রেমে স্বার্থের নামগন্ধ নাই। এই নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত ভালবাসার উদ্দেশ্য কখনই মোক্ষলাভ নয় : "স্বর্গমোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক

করি মানে।" ভক্তের ঈশ্বর-প্রীতি "অনিমিত্ত, ফলাভিসন্ধিশূন্য", স্বাভাবিক, সরস। কৃষ্ণের বৃন্দাবনধাম থেকে এক অদৃশ্য; অধরা, শক্তিশালী প্রেমপ্রবাহ কোনও এক অদৃশ্য, অধরা মহাজাগতিক মাধ্যমে ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করে। এই প্রেমধারা জড়বাদী মানুষকে বাঁচায়।

নিবিড় ভক্তি থেকে উৎসারিত, ঈশ্বরে কৃষ্ণে নিবেদিত, প্রেমের ছয়টি স্তর আছে। এই সব স্তর হল ব্রহ্মানন্দ, শান্তরতি, প্রেমভক্তি অথবা দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, এবং মধুর রতি। ব্রহ্মানন্দী বিনীত ভক্ত কৃষ্ণ-ব্রহ্মণ্-এর অতিপ্রাকৃত রূপের ভাবনায় ডুবে যান। শান্তরতির অথবা পরমাত্মস্ফূর্তির স্তরে ভক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণের মানসিক পূজনে শান্ত হন। প্রেমভক্তিতে ভক্ত নিজেকে কৃষ্ণের দাস ভাবেন। তাঁর মনে কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্ভ্রমবোধ থাকে। সখ্যরতিতে ভক্ত কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অথবা বন্ধু। বাৎসল্যরতির তাৎপর্য সন্তানরূপে কৃষ্ণের উপাসনা। নন্দ এবং যশোদা সন্তানরূপেই কৃষ্ণের উপাসনা করেছেন। সর্বোচ্চ স্তর মধুররতি ; এতে কৃষ্ণ প্রেমিকরূপে পূজিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥[৪]

অর্থাৎ, প্রেমিকরূপে কৃষ্ণের উপাসনায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যরতি মিশ্রিত হয়।

কৃষ্ণ চিরকিশোর, চিরপ্রেমিক। কৃষ্ণপ্রেমে কাম দেখা গেলেও তাতে কাম থাকে না। গোপীদের মনেও কামভাব থাকে না। তাতে 'মহাভাব' থাকে। কৃষ্ণদাসের অনুপম ভাষায়

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥[৫]
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় মহাবল ॥ ...
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥[৬]

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা"তে "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির" কোনরূপ মাত্রা অথবা উপাদান থাকা সম্ভাব্য কি না, তা কৃষ্ণদাস বিচার করেননি। বিখ্যাত বৈষ্ণব গায়ক রেবতীমোহন সেন কৃষ্ণকেই তাঁর গান শোনাতেন। গান গাইবার সময়ে তাঁর নিজের কোনরূপ আনন্দ হত না ?

উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর রসস্বরূপ। "রস" শব্দটির বহু আভিধানিক

অর্থ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেক্ষিতে শব্দটির অর্থ "উপভোগ", "রতি", "প্রেমচিন্তা", "আনন্দ", "প্রক্ষোভ", এবং তরল রস মাত্র। জীবসত্তায় রাসনুভূতি হলেই জীবসত্তার বিকাশ পূর্ণ হয়। পূর্ণবিকশিত জীবসত্তায় ঈশ্বরানুভব হয়। এই অনুভব অনির্বচনীয়। 'ভাগবতপুরাণ' শ্রুতির রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা। কৃষ্ণই তুরীয় রসিক। ভক্তিও রস। কাব্যরসও আছে। কিন্তু ভক্তিরসে কৃষ্ণলীলার অনির্বচনীয় অনুভব থাকার জন্য তা কাব্যরসের চেয়ে অনেক ভাল। কাব্যরসে কবির মননক্রিয়া মাত্র প্রকাশিত হয় ; তার সঙ্গে রসস্বরূপ ঈশ্বরানুভূতির সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এইরূপ বিচার অনুসারে ভক্তিরসের রসিক রূপ গোস্বামী কাব্যরসের রসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের মতে রূপ গোস্বামী ছিলেন সাহিত্যসম্রাট, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন "কল্পনাবিলাসী প্রাকৃত কবি"। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাবিনোদের রবীন্দ্র মূল্যায়ন এইরূপ :[৯]

> পূরীষকণবাহী মক্ষিকা যেরূপ মধুমক্ষিকার সহজ সৌভাগ্যের প্রতিযোগিতা করবার জন্য আপনাকে মধুমক্ষিকা কল্পনা করে কাচভাণ্ডে সুরক্ষিত মকরন্দকে আপনার আয়ত্তবস্তু জ্ঞানে আস্বাদন করতে ধাবিত হয়, কিন্তু হায়, সে যেমন মকরন্দের মধুর আস্বাদ পায় না, কখনও পেতে পারে না, সেইরূপ চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের খণ্ড প্রতিফলিত ছলনাময়ী ছবিতে আত্মহারা প্রাকৃত কবি অপ্রাকৃতের কথা বুঝতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রীতি ভক্তের স্থায়ীভাব। এই প্রীতি থেকে ভক্তিরস প্রবাহিত হয়। মধুররস এবং মধুররতি আটটি পর্যায়ে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই পর্যায়গুলো হল রতি, প্রেমভক্তি, স্নেহ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, এবং মহাভাব। মহাভাবে দেহের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে যায়। চৈতন্যের এবং রাধার প্রায়শ মহাভাব হত। মহাভাবের উপরেও রয়েছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। কেবলমাত্র রাধাই দিব্যোন্মাদিনী হয়েছেন। কৃষ্ণের রাসোৎসবে মহাভাবেও দিব্যোন্মাদনা প্রকাশিত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে মুক্তির অথবা মোক্ষেরও কতগুলো স্তর আছে। সেগুলো হল 'সার্ষ্টি' [সমানৈশ্বর্যপ্রাপ্তি], 'সারূপ্য' [সমানরূপপ্রাপ্তি], 'সামীপ্য' [সমীপে অবস্থিতি], 'সালোক্য' [সমান লোকে বাস], এবং 'সাযুজ্য' [ঈশ্বরে লয়]। কিন্তু "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্মঐক্য"। "ব্রহ্মঐক্য" আদৌ হয় না, কারণ জীব কৃষ্ণ-ব্রহ্মণ থেকে একই সঙ্গে অভিন্ন এবং ভিন্ন। কৃষ্ণের মায়াশক্তিদ্বারা জীবসত্তা পবিচালিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণ নিজে মায়াশক্তির ঊর্ধ্বে থাকেন। কৃষ্ণের অংশরূপে জীব তাঁর কাছাকাছি যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু জীব এবং কৃষ্ণ বিভিন্ন, তাই জীব কখনই কৃষ্ণের সমান হতে পারে না। বলদেব বিদ্যাভূষণ বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য লিখেছিলেন : [ভাবানুবাদ][১০]

> যেমন দু'জন ব্রাহ্মণের ছেলে : একজনের গায়ের রঙ কালো, আরেক জনের গায়ের রঙ শাদা। তারা জন্মসূত্রে দু'জনেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু একজন

আরেকজনের থেকে আলাদা, তেমন জীবসত্তার সঙ্গে ব্রহ্মণ্-এর সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা আলাদা।

কৃষ্ণের জন্য রাধার যে আকুতি, ভক্তেরও কৃষ্ণের জন্য সেইরূপ আকুতি থাকতে পারে। তবে কী রাধাকৃষ্ণ আলাদা ? সম্ভবত এ প্রশ্ন উঠেছিল বলেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :[১১]

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

একই রূপ যখন দুইরূপ হয়, তখনই তা "অচিন্ত্য", তা বুদ্ধির অগোচর। 'ভেদ' এবং 'অভেদ', সংযোগ এবং বিয়োগ একই সঙ্গে থাকাও অচিন্ত্য, অর্থাৎ কৃষ্ণের ক্ষমতাই অচিন্ত্য। যুক্তিবুদ্ধির অগোচর। বিষয়টির বিচার করে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন :[১২]

> The introduction of the mystic formula of incomprehensibility seems to discharge the Vaisnavas of this school from all responsibility of logically explaining their dogmas and creeds and, thus uncontrolled, they descend from the domain of reason to the domain of Puranic faith of a mythological character.

কিন্তু তবুও মানতে হবে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বস্তু-বিশ্বের অস্তিত্বকে, বাস্তবতাকে মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মতো অস্বীকার করেননি। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ব্যাখ্যায় সূর্যের সঙ্গে "আণবিক" সূর্যরশ্মির, ঘটে স্থিত জলের "অন্তর্ভাব"-এর, শাদাকালো ব্রাহ্মণপুত্রদের, মৃগ ও মৃগমদের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। এটা কৃষ্ণদাসের ভাষায় নব্যনৈয়ায়িক "ঘটপটিয়া" মূর্খতার সঙ্গে তুলনীয় ছিল না।[১৩] সমগ্র বিষয়টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণদাস লিখলেন :[১৪]

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিতজ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতাবিষ্ণুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥

অর্থাৎ, ঈশ্বর যেন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি। জীব যেন স্ফুলিঙ্গ। অগ্নিকে অন্ধকার ঢেকে ফেলতে পারে না। মায়া ঈশ্বরকে আবৃত করতে পারে না। মায়া জীবজীবনকে আবৃত করে। অতএব ঈশ্বর ও জীব এক নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যের বিরোধী। এই বিরোধের মৌলতত্ত্ব চৈতন্য কাশীতে অবস্থানকালে 'মায়াবাদী' প্রকাশানন্দ

সরস্বতীকে বলেছিলেন। চৈতন্য এই বলতে চেয়েছিলেন যে, বেদান্তের মুখ্য অর্থ জানতে হবে। গৌণ অথবা ভাষ্যকারকৃত অর্থ অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ঘটায়। ব্যাসসূত্রে মুখ্য অর্থে জগৎ এবং জীবন ব্রহ্মের 'পরিণাম'। অথচ নিজের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে শঙ্করাচার্য তাকে ব্রহ্মের বিকার ভাবলেন। শঙ্করাচার্যের এই মতকে বলা হয় "বিবর্তবাদ"। চৈতন্যের মত "পরিণামবাদ" রূপে পরিচিত হয়। তিনি তথাকথিত "বিবর্তবাদ"কে প্রায় উড়িয়ে দিয়েছেন।[১৫] "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" সঙ্গত কারণে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এটা অবশাই বলতে হবে যে, চৈতন্যের সমর্থকগণ জগতকে, জীবকে, মানুষকে তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বের একটা প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তা লক্ষ্য করেননি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে অন্যান্য দেবদেবীগণ কৃষ্ণ-ব্রহ্মণ্-এর প্রকাশ মাত্র। কৃষ্ণ সংখ্যাতীত প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। শৈবদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও ঝগড়া করতে চাননি। জীব গোস্বামীর মতে শিবের মধ্যেও যথেষ্ট বৈষ্ণবতা দেখা যায়।[১৬] শিবের আরাধনায় পাপস্খালন হলে ব্যক্তিস্বরূপে বৈষ্ণব গুণাবলি প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :[১৭]

বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায় অরো দুঃখে মরে ॥ ...
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথের করে ভেদ ব্যবহার ॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনারে ॥

অথচ তান্ত্রিকগণ সর্বদা বৈষ্ণবদের পছন্দ করেননি।

২

কৃষ্ণ যাঁদের সঙ্গে লীলা করেন, তাঁদের মধ্যে পুরুষ আছেন, স্ত্রীলোকও আছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের অংশকলা। 'ভাগবতপুরাণ'-এ বলা হয়েছে :[১৮]

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরিভি র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ"

অর্থাৎ, ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা, যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজের সঙ্গে রঙ্গপরায়ণ শিশুর খেলা। যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলা হয়, তার একটা অতীন্দ্রিয় অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে ; সেখানে প্রকৃত ভক্তদেরই প্রবেশাধিকার থাকে।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সর্বদাই হয় ; কৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য কোথাও যান না। তাঁর লীলা কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট। অপ্রকট কৃষ্ণলীলায় তাঁর প্রেয়সীরা তাঁর বিবাহিতা পত্নী। অথচ প্রকট লীলায় কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ পরস্ত্রী। কিন্তু তাঁরা পরস্ত্রী হলেও, রূপ গোস্বামীর মতে, পতিদের সঙ্গে তাঁদের কখনওই

যৌনসম্বন্ধ থাকে না। স্বামীদের সঙ্গে যখন তাঁরা থাকেন যোগমায়ার প্রভাবে তখন তাঁদের কোনওরূপ বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না। অর্থাৎ, কৃষ্ণ কখনই পারদারিক পাপে লিপ্ত হন না। তিনি আত্মারাম। মানুষের পক্ষে কৃষ্ণের অনুকরণ করা অসম্ভব। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যই কৃষ্ণ এরূপ লীলা করেন। যারা এই অপ্রাকৃত লীলার স্বরূপ বোঝে না, তাদের কাছে তার বিবরণ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লক্ষণীয়, 'ভাগবতপুরাণ'-এ কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীদের 'ব্যভিচারিণী' বলা হয়েছে।[১৯] 'ভাগবতপুরাণ'-এর দশম স্কন্ধের দুটি বিখ্যাত শ্লোক এইরূপ :[২০]

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥

"কেউ কেউ ঘরে অন্নাদি পরিবেশন করতে করতে, কেউ কেউ শিশুদের দুগ্ধ পান করাতে করাতে, কেউ কেউ পতিসেবা করতে করতে, কেউ কেউ খেতে খেতে তা ছেড়ে ধেয়ে চললেন বেণুগান শুনে সেইদিকে।"

(লক্ষণীয়, জীব গোস্বামীর মতে দুগ্ধপানরত শিশুরা গোপিনীদের নিজ নিজ শিশু ছিল না ; কারণ নিজ শিশু হলে "রসাভাস" দোষ হয়)

তা ব্যার্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥

"এই কুলবধূগণ পতিগণের দ্বারা, কুল কন্যাগণ পিতা, ভাই, এবং ভাইদের বন্ধুদের দ্বারা নিবারিত হয়েও গমনে বিরত হলেন না, কারণ তাঁদের আত্মা পর্যন্ত সব কিছু গোবিন্দের দ্বারা অপহৃত হওয়ার জন্য বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তাঁরা কিরে এলেন না।"

'ভাগবতপুরাণ' রচয়িতা এটাই দেখালেন যে, কৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে কুলবধূদের ও কুলকন্যাদের আর সাংসাবিক কাণ্ডজ্ঞানই রইল না ; তাঁরা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। এখানে কুলবধূগণ, কুলকন্যাগণ অবশ্যই রক্তমাংস সমন্বিত নারী ; তাঁদের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত। সম্ভবত এ কারণে কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে বৃন্দাবনের অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এই বলেন যে, গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। তার প্রমাণ তাঁরা 'মূলমাধব' নামক গ্রন্থে খুঁজে পান।[২১] কিন্তু 'মূলমাধব' এখন আর পাওয়া যায় না। 'গোপাল চম্পূ'-তে জীব গোস্বামী কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহের বিবরণ দিয়েছেন।[২২] রাধাগোবিন্দ নাথ ভেবেছেন যে, চৈতন্য নিজেই রাধা ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের উপর জোর দিয়েছিলেন।[২২ক] হয়তো বিবাহের পূর্বেও কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে লীলা করেন ; তাই চৈতন্য পূর্বে উদ্ধৃত "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র ক্ষপাস্"—এই কৌমার্যহরণ বিষয়ক প্রাচীন প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কিন্তু এটা অনুমান মাত্র। গদাধর পণ্ডিতের 'শাখা'-অবলম্বী বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর 'সাধনদীপিকা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, জীব গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন বৈশ্য

জাতীয় গোপালদাস ; গোপালদাসের অনুরোধেই জীব গোস্বামী দ্বারা কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের স্বকীয়াত্ব সিদ্ধান্তিত হয়েছিল।[২৩]

কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীদের প্রকৃত অবস্থা বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে বাঙালি তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং রূপ কবিরাজ তাঁদের পরকীয়া অবস্থাকে বহু যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয়টি অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের দরবারে ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশদভাবে আলোচিত হয়। এই আলোচনায় বলদেব বিদ্যাভূষণ "পরকীয়া" মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭২০-২১ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণবদের সভাতেও এই মত গ্রহণ করা হয়।[২৪]

কৃষ্ণকেলির পটভূমিরূপে বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে অসামান্য গুরুত্বসম্পন্ন। রূপ গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে কৃষ্ণের আত্মীয় স্বজনের, বন্ধুবান্ধবের, ভৃত্যদের পরিচয় দিলেন। বৃন্দাবনের নন্দ ঘোষ সম্পর্কে বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন :[২৫]

The influence of the royal court and feudal society with which the principal gosvamins... were closely associated before they met Caitanya, was reoponsible for transforming the pastoral headman Nanda into a regular feudal prince.

৩

রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অভাবনীয়। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে দাক্ষিণাত্যে পর্যটনকালে চৈতন্য রাধার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।[২৬] রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথা বলেও তিনি রাধার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। বৃন্দাবনের গৌড়ীয় গোস্বামিগণ রাধা সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট মতবাদ সৃষ্টি করেন। অথচ, 'ভাগবতপুরাণ'-এ রাধার নাম উল্লিখিত হয়নি। গৌড়ীয় গোস্বামীদের মতে রাধা কৃষ্ণের "হ্লাদিনী শক্তি"। এই শক্তি কৃষ্ণের "স্বরূপ শক্তি"তে নিহিত। স্বরূপশক্তিতেই "রস" সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ তুরীয় রসিক। রাধা ভক্তিমিশ্রিত রসের জীবন্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রেম, এবং যে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করে, উভয়ই রাধাতে রূপ পরিগ্রহ করে।

এসব গুরুগম্ভীর তত্ত্বে চৈতন্যের স্থান স্পষ্ট নয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনাবলিতে শুরুতে কখনও কখনও চৈতন্যের নাম উল্লিখত হয়েছে। তার কারণ কি এই ছিল যে, চৈতন্য উড়িষ্যার পঞ্চশাখার বৈষ্ণবীয় মতবাদকেও সমর্থন করেছিলেন ? বৃন্দাবনের তত্ত্ব-স্রষ্টা প্রধান গোস্বামিগণ চৈতন্যের কোনও প্রামাণিক জীবনী রচনা করেননি। কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজই অনুভব করলেন যে, চৈতন্যকে যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তবে তার প্রামাণ্যতা কখনই প্রশ্নাতীত হয়ে উঠবে না। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানালেন যে, চৈতন্যই সনাতন ও রূপকে বৈষ্ণবীয় ধর্মতত্ত্ব রচনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস এটাও দেখালেন যে, উড়িষ্যার

"অতিবড়ি" বৈষ্ণবরা চৈতন্যকে গুরুরূপে মানলেও, চৈতন্য বৃন্দাবনের গোস্বামীদেরই বেশি পছন্দ করেছেন, এবং গোস্বামীরা যা লিখেছেন, তা চৈতন্যের নির্দেশেই লিখেছেন।[২৬]

শেষ পর্যন্ত চৈতন্য সম্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত কোনও কোনও বৈষ্ণব চৈতন্যকে রাধার জীবন্ত বিগ্রহরূপে বিবেচনা করেন। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন :[২৭]

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হৈত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥

দ্বিতীয়ত বৃন্দাবন দাস এবং "ভবরোগবৈদ্য" মুরারি গুপ্ত চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার রূপেই দেখিয়েছিলেন। তাঁদের পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন :[২৮]

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই ॥

চৈতন্য কৃষ্ণ হলেও তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণে রাধার স্বরূপ দেখা যায়। কৃষ্ণদাস বর্ণিত চৈতন্যে রাধাকৃষ্ণের "এক ঠাঁই" হওয়া সম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক বড়ই মজার কথা লিখেছেন (তিনি রাধার চেয়ে চৈতন্যের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চান) :[২৯]

In profane jocular parlance Gaur [চৈতন্য] is a transcendental hermaphrodite, a protozoon that at times displays segmentation of cell in the exquisite forms of Radha and Krishna.

অর্থাৎ, চৈতন্য হচ্ছেন এক তুরীয় দ্বিলিঙ্গ। এই দ্বিলিঙ্গ জীবাণুর কোষ কখনও কখনও রাধাকৃষ্ণের দুই চমৎকার রূপে বিভক্ত হয়। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বারাণসীর প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যকে কৃষ্ণেরও উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে অবস্থিত শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈষ্ণব নরহরি সরকার গৌরাঙ্গ অথবা চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার, এবং নবদ্বীপের রমণীদের 'নাগর' ভেবেছেন। অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত এক 'বিরুদ' স্তোত্রতে চৈতন্যকে পরমেশ্বর রূপে, এবং ব্রহ্মা ও শিবের অভিভাবক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩০] ওদিকে 'তন্ত্ররত্নাকর' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বৈষ্ণবরা ছিলেন শিবের বিরোধী দানবদের অবতার মাত্র।[৩১] যাঁর যে ব্যাখ্যা ভাল লাগবে, তিনি তাই মেনে নিতে পারেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষভাবে কান্তিবিদ্যার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই এক ধর্ম, যার ভিত্তি ছিল কাব্য, নাটক, গান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, এবং স্থাপত্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নন্দনতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন রূপ গোস্বামী। তাঁর নন্দনতত্ত্ব ভক্তিরসাপ্লুত। কিন্তু তাতে ভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে শৃঙ্গার রস অথবা উজ্জ্বল রস। "ভক্তিরস" ছিল একটি নতুন রস। 'রসাগঙ্গাধর'-রচয়িতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভক্তিকে একটি রস রূপে স্বীকৃতি দেননি।[৩২] কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধানত ভক্তিরসকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। বিখ্যাত 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রূপ গোস্বামী প্রচলিত রসতত্ত্বের এক অভিনব বৈষ্ণবীয় ভাষ্য দিয়েছেন। এখানে মধুররস প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে সমস্ত কথা, সমস্ত তথ্য কৃষ্ণময়। সমস্ত ভাবে, সমস্ত প্রক্ষোভে, সমস্ত অবস্থায়, এখানে কৃষ্ণই একমাত্র, অদ্বিতীয় নায়ক। সবচেয়ে বড় নায়িকা অবশ্যই রাধা। রূপ গোস্বামী বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন অবস্থার, এবং বিভিন্ন কৃষ্ণের যে সুবিস্তৃত, সূক্ষ্ম বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বাঙালি পদাবলী-রচয়িতাগণ 'উজ্জ্বলনীলমণি' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৫

নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বাবলীর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নও প্রয়োজনীয়। পৌরাণিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক, এবং পূর্বকাল থেকে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ ভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্য যে ভক্তির প্রচার করেন, তাতে কোনই জটিলতা ছিল না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে ভক্তি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল। ভক্তির সঙ্গে শৃঙ্গার রস মিশ্রিত হল।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ কৃষ্ণের উজ্জ্বলরসাত্মক লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। অপরিসীম দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁদের "কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন উল্লাস"। রঘুনাথ দাস গোস্বামী এমনই পচা ভাত জল দিয়ে ধুয়ে দিনে মাত্র একবার খেতেন, যা তৈলঙ্গী গাভীরা পর্যন্ত খেত না।[৩৩] তিনিও উজ্জ্বলরসাত্মক কবিতা ও গদ্য লিখেছেন। উজ্জ্বলরসের যাতে কোনও রকম বিশ্রী প্রতিক্রিয়া না হয়, তার জন্যই গোস্বামী-প্রভুদের গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, হাতে কড়োয়া, গাছের তলায় থাকা, আর শুকনো রুটি আর চানা চিবিয়ে খাওয়া। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, এমন বৈষ্ণবরাই হতে পারেন,

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, রিজিত ষড়গুণ ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।[৩৪]

বৈষ্ণব কবিতাও এইরূপ নৈতিক জীবন বোধ থেকে উৎসারিত হবে, এই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশ্বাস।

কিন্তু একদিকে কৃষ্ণের উজ্জ্বলরসাত্মক রতির স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, অন্যদিকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের ও তপশ্চর্যার অভ্যাস—এইরূপ খুরের ধারের উপরে পা ফেলে নিরন্তর চলার এমন কী প্রয়োজন ছিল? ভক্তির উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু বৃন্দাবনে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মহাবিশ্বজীবনের, অথবা মানবজীবনের এবং মানবসমাজের যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে, তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কখনই ব্যাখ্যা করেননি। ভক্তির সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তাঁরা যেন ইচ্ছা করেই ভুলে গেলেন। 'কামে প্রেমে বহুত অন্তর'—একথা লিখেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেই 'গোবিন্দলীলামৃতম্' কাব্যে কামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোকের একটি বিশাল সংকলন। তা থেকে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত এইরূপ :[৩৫]

দক্ষিণ নায়কের দৃষ্টান্ত, যেমন ধনঞ্জয় রচিত 'দশরূপক'-এ :

স্নাতা তিষ্ঠতি কুন্তলেশ্বরসুতা বারোঽঙ্গরাজস্বসুর্,
দ্যূতে রাত্রিরিয়ং জিতা কমলয়া দেবী প্রসাদ্যাদ্য চ।
ইত্যন্তঃ পুরসুন্দরীঃ প্রতিময়া বিজ্ঞায় বিজ্ঞাপিতে।
দেবেনাপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতং নাড়িকাঃ॥

(হে দ্বারকানাথ! কুন্তলেশ্বরের দুহিতা ঋতুস্নাতা; তিনি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছেন। পর্যায়ক্রমে কিন্তু আজ অঙ্গরাজের বোনের পালা। জুয়াখেলায় জয়লাভ করে কমলা আপনার সঙ্গে বিহার করবেন এই রাতেই। অথচ দেবী সত্যভামাকেও প্রসন্ন করতে হবে। এভাবে আমি অন্তঃপুরসুন্দরীদের বার্তা কৃষ্ণকে জানালাম। তিনি দুই তিন ঘণ্টা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অবস্থান করলেন।)

'মোহান্ত সুরতক্ষমা' রাধা সম্বন্ধে কৃষ্ণের স্বগতোক্তি :

শ্রমজলনিবিড়াং নিমিলিতাক্ষীং শ্লথচিকুরামনধীন্ বাহুবল্লীম।
মুদিতমনসমস্মৃতান্যভাবাং রতিশয়নে নিশি গোপিকাং স্মারামি॥

(অহো! গত রাত্রিতে সুরতশয্যায় রাধার দেহ শ্রমজলে ক্লিন্ন, নেত্র মুদ্রিত, কেশকুন্তল আলুলায়িত, বাহুলতা শিথিল হয়েছিল, এবং তিনি সেই বিলাসমাধুর্য ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে রাখেননি। এখন আমি তাঁকেই ভাবছি।)

এরকম সব শ্লোকরচনার সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক কী ছিল, অথবা আদৌ ছিল কি না, তা জানা যায় না। রঘুনাথদাস গোস্বামী-রচিত 'মুক্তাচরিত্র' খোলাখুলি আদিরসাত্মক কথোপকথনের একটি ভাল দৃষ্টান্ত। যদি বলা যায় যে, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শৃঙ্গার রসেরই একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি তৈরি করেছেন, তবে নিশ্চয় অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ অদ্ভুত সাধনার সঙ্গে জীবনের সংযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়। এই পরিণাম নিশ্চয় অভাবনীয় ছিল।

কিন্তু সম্ভবত কেবলমাত্র আদিরসের সংক্রাম ঘটিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাঁদের

মতাদর্শকে বিশিষ্ট করে তুলতে চাননি। এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা লিখেছিলেন, তার উদ্ধৃতি প্রয়োজনীয় :

মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী, নির্বিশেষে ব্রহ্মা হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান॥
পরমকারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার।[৩৬]

কৃষ্ণদাস বেশ স্পষ্ট ভাবেই লিখলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী"র সারমর্ম হল ঈশ্বরের পরমকারণত্ব। তাতে আদিরস তেমন কিছু প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। আদিরসকে অগ্রাহ্য করেও ঈশ্বর চিন্তন সম্ভব।

সূত্রের উল্লেখ

১. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রামাণিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : রাধাগোবিন্দ নাথ, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন', ৫ খণ্ড (কলিকাতা, প্রাচ্য বাণী মন্দির, ১৩৬৩-১৩৬৫ বঙ্গাব্দ); প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব দর্শন' (কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৭০ সাল); Girindra Narayan Malik, *The Philosophy of Vaisnaya Religion, 2 vols. [Lahore, Motilal Banarsidas,* 1927); Mahanamavrata Brahmachari, *Vaisnava Vedanta: The Philosophy* of *Sri Jiva Goswami* (Calcutta, Dasgupta & Co, 1967); A.K. Majumdar, *Chaitnya: His Life and Doctrine: A Study In Vaispavism* (Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1969): সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য (কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ১৯৫৩)

২. চৈ. চ, পৃ ১০৪

৩. চৈ. চৈ পৃ ৫১৭

৪. Arthur Avalon, ed. *Brahmasamhita,* (Calcutta, Sanskrit Press Depository, Tantrika Texts, Vol, XX) P.I : "ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥"

৫. চৈ. চ, পৃ ৫১৬-১৭

৬. চৈ. চৈ, পৃ ৫১ : "সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ," ইত্যাদি।

৭. চৈ. চ, পৃ ২৮৩

৮. চৈ. চ, পৃ ৬৩-৬৪

৯. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, 'গৌড়ীয় সাহিত্য' (কলিকাতা, গৌড়ীয় মঠ, ২য় নং, গৌরাব্দ ৪৪৩) পৃ. ২৭, ২৯-৩০

১০. Stuart Elkman, *Jiva Goswamin's Tattva Sandarbha,* পূর্বোক্ত, P. 143, পাদটীকা ২

১১. চৈ. চ, পৃ. ৫৬

১২. Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, IV (Cambridge, Cambridge University Press, 1961) pp. 16[18, 400-401.

১৩. চৈ. চ, পৃ. ৭০৪ : শব্দটির অর্থ, নৈয়ায়িক, যিনি কেবল ঘটত্ব ও পটত্ব নিয়ে তর্ক করেন ; কৃষ্ণদাস নৈয়ায়িকদের খুবই ঘৃণা করতেন ; তিনি অন্যত্র লিখেছেন (পৃ. ৩৫৩ : বাসুদেব সার্বভৌমের উক্তি) : "তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহে কৃষ্ণহরি। কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে। কাঁহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গে॥" কৃষ্ণদাস আরও লিখেছেন (পৃ. ৩০৩) : "অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়। বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহুদূর॥"

১৪. চৈ. চ. পৃ. ১১০

১৫. চৈ. চ. পৃ. ২৪৮-২৫৫ : চৈতন্য বাসুদেব সার্বভৌমকে বলেন : "সূত্রের [অর্থাৎ, বেদান্তসূত্রের] মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান। কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন...মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা। অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥"

১৬. শিবকে নিয়ে জীব গোস্বামী খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন ; শিবকে তিনি অগ্রাহ্যও করতে পারেন না, বেশি গুরুত্বও দিতে চান না। দ্রষ্টব্য, 'ভক্তি-সন্দর্ভ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-২৮, ১৩২-৩৩, ১৩৬-৩৯

১৭. চৈ. ভা. পৃ. ১৫৫

১৮. 'ভাগবতপুরাণ', 'স্কন্ধ-১০, অধ্যায় ৩৩, শ্লোক ১৭

১৯. *The Bhaktiratnavali, পূর্বোক্ত, pp 29-30, Verse, 69.* ভাষ্যকার "A.B." লিখেছেন : *শ্লোকে ব্যবহৃত "ব্যভিচারদুষ্টাঃ" শব্দটি, "No compliment to the Gopis* of Vrindavana. This reflection upon their character makes it difficult to reconcile a previous statement that the love of the Gopis was not carnal." (P. 30)

২০. মনীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, অনূদিত, 'ভাগবতপুরাণ', স্কন্ধ ১০, (তৃতীয় খণ্ড, নবদ্বীপ, সাবিত্রী, গুহ, তারিখ নেই] অধ্যায় ২৯, শ্লোক ৬, শ্লোক ৮, পৃ. ১৩৬৩-৬৪, ১৩৬২-৬৩

২১. রূপ গোস্বামী, 'উজ্জ্বলনীলমণি', প্রথম অধ্যায়, প্রকরণ ১৬

২২. জীব গোস্বামী, 'গোপাল চম্পূ', রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত (বহরমপুর, ১৯১০)। উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩২-৩৬। নিম্বার্ক মতেও রাধা কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন : দ্রষ্টব্য, Bimanbehari Majumdar, *Krsna In History and Legend* (Calcutta, Calcutta University, 1969), P. 79.

২২ক. 'চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা', পৃ. ৩৩৪

২৩. রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, 'সাধনদীপিকা', হরিদাস দাস সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৬) পৃ. ২৬০

২৪. আলোচনা দ্রষ্টব্য, VIB, pp. 109-11

২৫. B.B. Majiumder উপরে উক্ত, P. 219

২৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', পৃ. ১৯৭ ; দ্রষ্টব্য : Sumanta Banerjee, *"Appropriation of a Folk Heroine: Radha in Mediaeval Bengali. Vaishnavite Culture* (Simla, 1993)

২৭. মালবিকা চাকী সম্পাদিত, 'বাসুঘোষের পদাবলী', পূর্বোক্ত পদ-১৭২, পৃ. ১৬০-৬১

২৮. চৈ. চ, পৃ. ৫১

২৯. Nanilal Sen, "The Import of the Rasaraja-Mahabhava," 'আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক গ্রন্থ', জনার্দন চক্রবর্তী সম্পাদিত, (কলিকাতা, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৭৩)। পৃ. ১৪, ২০

৩০. হরিদাস দাস, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' [নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৬৯), পৃ. ১৫২-১৫৪

৩১. 'রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী', ৬, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩২-৩৪

৩২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় : ভক্তিরস ও অলঙ্কার শাস্ত্র' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪০০ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ৯-৪৩ ; এই আলোচনা অবৈচারিক হলেও নির্ভরযোগ্য।

৩৩. চৈ. চ, পৃ. ৭৪৫

৩৪. চৈ. চ, পৃ. ৫৩৪

৩৫. রূপ গোস্বামী, 'উজ্জ্বলনীলমণি', বাসুদেব শর্মা সম্পাদিত (বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩২, পৃ. ২৭ পৃ. ১১৬

৩৬. চৈ. চ. পৃ ৬৩৯

সপ্তম অধ্যায়

বৃন্দাবনে এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার : অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ এবং গোপালগণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধারণা অনুসারে বৃন্দাবনে অথবা ব্রজধামে রয়েছে ২৪-টি বনাঞ্চল, ৩-টি পাহাড়, ৭-টি বড় দীঘি, ৮-টি বিশাল বটবৃক্ষ, এবং ৪-টি ধাম। এই বৃন্দাবনের আয়তন ৮৪ ক্রোশ। খ্যাতনামা সাধু রামঠাকুর ব্রজের সুন্দর বর্ণনা করেছিলেন :[১]

> 'ব্রজ'-শব্দের অর্থ ব-রজ, রজহীন অর্থাৎ প্রকাশহীন....বৃন্দাবন ব্রজধামের অন্তর্গত। ব্রজে শান্তি নাই...ব্রজে সর্বদা আন্দোলন চলিতেছে...ইহার মূলে আছে যোগমায়ার প্রভাব...ব্রজধাম বস্তুতঃ মাধুর্য্যধাম, এখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না...নির্বাণে স্বভাব নাই, কিন্তু ব্রজে স্বভাবের প্রাধান্য...বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দা দেবী...এই দেহই ব্রজধাম...

কথিত আছে যে, চৈতন্যের অনুরোধে সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে এসেছিলেন। তাঁদের যেমন ছিল পাণ্ডিত্য, তেমন ছিল প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। চৈতন্য তাঁদের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন :[২]

> ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
> বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
> কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন।
> লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥

সম্ভবত ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তখন সেখানে রামানুজাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সেখানে বল্লভাচারী বৈষ্ণবদেরও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। বল্লভের সমর্থকগণ রাগানুগা ভক্তির তত্ত্ব মানতেন না। তাঁদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মারামারি পর্যন্ত হয়।[৩] সম্ভবত এই অশান্তির মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করেন। হরিবংশ সম্প্রদায়ের গুরু প্রিয়দাসের সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর ভাল সম্পর্ক ছিল।[৩ক]

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গোস্বামিগণ উপলব্ধি করলেন যে, স্থানীয় অভিজাত সংস্কৃতি কেবল আবেগমূলক 'ভাব' মানবে না। বৈষ্ণব ধর্মের কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ গোপালভট্ট গোস্বামী[৩]। তিনি 'হরিভক্তিবিলাস' রচনা করেন। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্ররূপে গ্রাহ্য হল। বিপুলাকৃতি গ্রন্থটির বিশটি 'বিলাস' অথবা অধ্যায় আছে।

গোপালভট্ট গোস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচার ধারা সম্পূর্ণভাবে রক্ষণশীল, এবং কখনও কখনও প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগুরুর বিশেষ অধিকার স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থে বাঁশরীবাদক কৃষ্ণের কোনও গুরুত্ব নেই; গুরুত্ব আছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর। গোপালভট্ট-উদ্‌ধৃত প্রাচীন শ্লোক অনুসারে দ্বিজদের সেবা করে শূদ্ররা যা উপার্জন করবে, তাই হবে 'শুক্ল'[৪]। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্নগ্রহণ করবেন না। ব্রাহ্মণকে যা দান করা হয়, তা বিষ্ণুকেই দেওয়া হয়[৫]। উচ্চবর্ণের লোক সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে চণ্ডালদর্শনজাত মহাপাপ স্খালন করতে পারেন[৬]। সপ্তদশ 'বিলাস'-এ রয়েছে পুরশ্চরণের প্রারম্ভিক কৃত্যরূপে গুরুপূজার বিধান[৭]। ব্রাহ্মণকে খাওয়াবার ও দান করার বিধানও তাতে আছে। গোপালভট্ট অবশ্য শূদ্রদের ও স্ত্রীলোকদের শালিগ্রাম পূজনের অধিকার দিয়েছেন[৮]। বিংশ 'বিলাস'-এ তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'প্রেমভক্তি' সম্পন্ন সর্বোচ্চস্তরের 'একান্তিন'-ভক্তের পক্ষে কৃত্য পালন আবশ্যিক নয়[৯]।

গোপালভট্ট গোস্বামী চৈতন্যের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলেন কি না, সে প্রশ্ন তোলা যায়। চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকারের তত্ত্ব প্রচার করেননি। ব্রাহ্মণদের খাওয়াবার ও দান করার নির্দেশও দেননি। চৈতন্য কখনও বলেননি যে, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বাঁশরীওয়ালা কৃষ্ণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং চণ্ডাল ও 'যবন' দেখলে পাপ হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, চৈতন্য কিছু কৃত্যপালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন[১০]। কিন্তু গোপালভট্ট গোস্বামীর নির্দেশসমূহ মৌলিকভাবে সেই নির্দেশ থেকে ভিন্ন। গোপালভট্ট চৈতন্যপূজনের নির্দেশও দেননি। কিন্তু তবুও 'হরিভক্তিবিলাস' বৈষ্ণবাচারবিষয়ক প্রধান গ্রন্থ। এই তথ্য থেকে সুশীলকুমার দে সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত করেছেন।[১১]

> It would not be correct to say that Caitanyaism sought to remove religion entirely from carefully guarded ritual or sacerdotal sanction, and throw its privileges to all men and women without discrimination.

গোস্বামিগণ জঙ্গলে ঢাকা বৃন্দাবনকে একটি প্রধান বৈষ্ণব তীর্থস্থানরূপে গড়ে তুলেছিলেন। মথুরার ইতিহাস রচয়িতা ফ্রেডারিক্ এস্. গ্রোউস্ এই তথ্যের উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।[১২] প্রধানত মূর্তিস্থাপন এবং মন্দির নির্মাণ করে গোস্বামিগণ বৃন্দাবনকে একটি বড় তীর্থস্থানে রূপান্তরিত করেন। সনাতন গোস্বামী রাধা-মদনমোহন, গোবিন্দদেব, এবং গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রূপগোস্বামীর দ্বারা আবিষ্কৃত গোবিন্দ মূর্তি যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তা মানসিংহের আনুকূল্যে নির্মিত হয়। এই মন্দির গোবিন্দমন্দির রূপে প্রসিদ্ধ। এটি ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[১৩] জীব গোস্বামী রাধা-দামোদর বিগ্রহের সেবায়েত রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তোডরমলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তোডরমলের অনুরোধে সম্রাট আকবর ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ জানুয়ারি তারিখে গোপাল দাস নামক জীব গোস্বামীর এক পরিকরের নামে দু'শ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন।[১৪] আকবরের অন্য একটি 'ফর্মান্' অনুসারে "দরিদ্র", এবং "সম্রাটের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী" জীব গোস্বামীকে মদনমোহন ও গোবিন্দমন্দিরের ব্যবস্থাপনার অধিকার এবং "খয়রাৎ" দেওয়া হয়েছিল।[১৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজ মদনমোহনের উপাসক ছিলেন।

ঐতিহাসিক টড্ লিখেছেন: "Arungzeb proscribed Kaniya and rendered his shrines impure throughout Vrij"।[১৬] সম্রাট আওরঙ্গজেব কৃষ্ণপূজন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ব্রজের মন্দিরগুলোকে অপবিত্র করেন। টড্-এর মতে মেবারের রাণা রাজসিংহ প্রথমে কোনও একটি বিগ্রহকে বৃন্দাবন থেকে কোটার ভিতর দিয়ে মেবারে নিয়ে এসেছিলেন। অন্যান্য বিগ্রহদের জয়পুর, কোটা, কেরৌলি, ভরতপুর, এবং সুরাতে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। ১৬৬৯-এ, এবং ১৭৫৭-তে মুসলমানরা মথুরা-বৃন্দাবনে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে। বহু বাঙালি ও ওড়িয়া বৈষ্ণব সে সময়ে বৃন্দাবন ছেড়ে রাজস্থানে চলে যান।

গৌড়ীয় গোস্বামীরা বৃন্দাবনে গিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁদের অসামান্য পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, প্রতিভা সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়। সম্রাট আকবর, রাজস্থানের রাজারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেশ কিছু পঞ্জাবি ব্যবসায়ী তাঁদের পরিকর ছিলেন। দলিলপত্রের প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায়, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনই টাকাপয়সার ও জমির জন্য লোলুপ ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পরে বিভিন্ন মন্দিরের সেবায়েতদের অর্থ উপার্জনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বনের, এমনকি মামলা-মোকদ্দমা করার প্রমাণ রয়েছে। বৃন্দাবনে পশুহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অর্থের লালসায় পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব পুরোহিতরা পশুনিধনে ও পশুর মাংস বিক্রয়ে আপত্তি করেননি।[১৭]

যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তার সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃতির বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। ক্রমশ বৃন্দাবনের সঙ্গে নবদ্বীপের ও নীলাচলের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বঙ্গে, নীলাচলে ভক্তির সঙ্গে ভাবাবেগ মিশ্রিত ছিল। এ সব স্থানে ভক্তির ভিত্তি ছিল আবেগ, প্রক্ষোভ। সেই আবেগে "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়"। তা কিন্তু বৃন্দাবনে বিরচিত ধর্মের তত্ত্বে, কান্তিবিদ্যার অনুশীলনে, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে, এবং স্মার্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখ্যায় দেখা যায় না। তাতে প্রাধান্য পেয়েছে অতীন্দ্রিয় দর্শন, মধুর রস, এবং এক বৈষ্ণবীয় স্মার্ত ঐতিহ্য। বৃন্দাবনের উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে চৈতন্যের দ্বারা সূত্রাকারে নির্দেশিত পরিকল্পনাসমূহ এমন

ভাবে রূপায়িত হল যে, তাতে নবদ্বীপে এবং অন্যান্য স্থানে বৈষ্ণবীয় ভক্তি প্রচারের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইরূপ পরিবর্তন চৈতন্যের ইচ্ছা অনুসারে করা হয়েছিল কি না, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই।

২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দকে বঙ্গে বৈষ্ণবভক্তি প্রচার করতে বলেন।[১৮] অদ্বৈত আচার্যের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল ; চৈতন্যের জন্মকালেই তাঁর বয়স ছিল বাহান্ন। নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রীদেবী ও সীতাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর ছয়টি ছেলে ছিল। বড় ছেলে অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বীকৃতি লাভ করেন।[১৯]

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার
আর যত মত সর হৈল ছারখার ॥

অদ্বৈত আচার্য বৃহৎ সংসারের খরচ যে কিভাবে যোগাতেন, তা জানা যায় না। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 'যবন' হরিদাসকে তিনি 'ভাগবতপুরাণ' ও দর্শন পড়িয়েছিলেন। 'গীতা'র ও 'যোগবাশিষ্ঠ' রামায়ণের ভাষ্য তিনি রচনা করেন, এরূপ প্রসিদ্ধিও আছে।

বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং অন্যান্য চৈতন্য জীবনী রচয়িতাগণ অদ্বৈতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বৃন্দাবনদাসের বিবরণ অনুসারে শান্তিপুরে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতাকে অগ্রাহ্য করে অদ্বৈত সাহসের সঙ্গে ভক্তির মতবাদ প্রচার করেন। তিনি যে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মেনে নিতে পারেননি, তা স্পষ্ট। একটি মত অনুসারে তিনি শঙ্করাচার্যের মত সমর্থন করতেন। হয়তো মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা পাওয়ার পরেই তাঁর ভাবজগতে বিরাট পরিবর্তন হয়। তিনিই পুরীতে গিয়ে চৈতন্যকে "সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোঁসাই" রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অদ্বৈত নিঃসন্দেহে মহাপুরুষ ছিলেন।

তিনি ভক্তিকে জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি সম্বন্ধে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। চৈতন্য তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করেন।[২০]

অদ্বৈত বোলয়ে সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান।
যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শচীর নন্দন ॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ ...
শান্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়,
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥

চৈতন্যের প্রহারের ফলে অদ্বৈতের দার্শনিক বিচারধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত

হয়েছিল কি না, তা দুর্নির্ণেয়। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের প্রায়শ "প্রেমকোন্দল" হত ; তার ভাষা এইরূপ :[২১]

অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্মবধিয়া ॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুলজন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত ॥
পিতামাতা গুরু নাহি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল, বোলায় অবধূত ॥

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের কালে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর কখনও "কোন্দল" হয়নি। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে চৈতন্যের "অংশ অবতার" রূপে বর্ণনা করেছেন।[২২] কৃষ্ণদাস অদ্বৈত আচার্যের তেতাল্লিশ জন অনুগামীর নাম করেছেন।[২৩] তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দ, অপর দুই পুত্র কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল, যদুনন্দন আচার্য, নন্দনী, হৃদয়ানন্দ সেন, অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, নারায়ণ দাস, পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, হরিচরণ এবং বনমালী কবিচন্দ্র। অদ্বৈতের তিরোধানের পরে তাঁর অনুগামী বৈষ্ণবগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। কামদেব নাগর নামক অদ্বৈতের এক পরিকর চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। অদ্বৈতের 'শাখা'র বৈষ্ণবরা পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, বর্ধমান, মালদহ, নদীয়া, হুগলি ও শ্রীহট্টে সক্রিয় ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[২৩ক] তাঁর একটি শিষ্যগোষ্ঠীও ছিল।[২৩খ] তাঁর জীবন 'সীতাচরিত্র' লিখেছিলেন লোকনাথ দাস ; সীতাদেবীর অন্য একটি জীবনীর নাম 'সীতাগুণকদম্ব'। অদ্বৈত আচার্যের দুটি প্রচলিত জীবনী হরিচরণ দাস-রচিত 'অদ্বৈতমঙ্গল', এবং ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ'।

পরবর্তীকালে অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ্য কর্মকাণ্ডের সমর্থক হয়েছিলেন। শান্তিপুরের গোস্বামী-উপাধিধারী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ এবং চৈতন্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য বিচার করতেন না।[২৪] তাঁদের এই ধারণা নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা সমর্থন করেননি। উনিশ শতকের শেষে এই বিরোধের ফলে মারামারি পর্যন্ত হয়।[২৫] বঙ্গের বৈষ্ণব ঐতিহ্যে অদ্বৈত আচার্য অমর হয়ে আছেন ; লোচনদাসের পদে অদ্বৈত আচার্যের সুন্দর বর্ণনা এইরূপ :[২৬]

ও বুঢ়া গৌরাঙ্গ এনেছে।
দেখিব দেখিব দেখিব বড় সাধটি লেগেছে। ধু
বুঢ়ার মুখটি যেমন চান্দটি তেমন
কেশগুলাইন পাকা।
দন্তগুলি কুন্দকলি
মুখে গৌরনামটি মাখা ॥

নাকটি যেমন ছত্রপতি
হাঁকটি জেন সিংহ।
গৌরপ্রেম সাগরের
কমল মধুর ভৃঙ্গ ॥
হেমদণ্ড বাহুদণ্ড দোলাইয়া যায়।
হরি হরি বলে নাচে ভ্রুকুটি কইরা চায় ॥
পেটটি যেমন নাদুর নুদুর
তেমনি বুকের পাটা।
পুলকগুলা ফুলা ফুলা
কদম ফুলটি ফোটা ॥
ভাল তো বুঢ়া মদন চূড়া
শান্তিপুরের নেটো।
লোচন বলে বুঢ়ার পাত্র
মাজিল যত চেটো ॥

৩

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বাংলা ভাষায় সন্ত-জীবনী রচনা করেন। তথাপি নিত্যানন্দ অবধূতের কোনও প্রামাণিক জীবনী রচিত হয়নি। সম্ভবত এর একটা তাত্ত্বিক কারণ ছিল। নিত্যানন্দ দাস্যভাবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে 'সখ্য ভাব' 'দাস্য ভাব' গৌণ ভাব। 'মধুর ভাব' প্রধান ভাব। তাই নিত্যানন্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব হলেও বৃন্দাবনী মতাদর্শে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না।

নবদ্বীপে আগমনের পূর্বে নিত্যানন্দের জীবন ছিল রহস্যাবৃত। চৈতন্য এবং অদ্বৈত তাঁর জাতি-পরিচয় জানতেন না। একটি আধুনিক মতানুসারে নিত্যানন্দের জন্ম হয় ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে, তিরোধান হয় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে।[২৭] তাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস, চূড়ামণি দাস, এবং জয়ানন্দ। বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় নৃসিংহ-রচিত 'চৈতন্যভাগবত'-এ। কৃষ্ণদাস কবিরাজও নিত্যানন্দকে ছোট করে দেখেননি।

ঐতিহ্য অনুসারে নিত্যানন্দ 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। নবদ্বীপে আসার আগে তিনি বহু তীর্থে গিয়েছিলেন। ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও শৈব মতাদর্শ একে অপরের খুব কাছাকাছি এসেছিল। তাই নিত্যানন্দ "অবধূত"-বৈষ্ণব হলেন; শিবাবতার রূপে প্রসিদ্ধ অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণবদের গুরু হলেন এবং স্বয়ং চৈতন্য "ভারতী" উপাধিধারী সন্ন্যাসী কেশবের কাছে দীক্ষা লাভ করলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, মাধবেন্দ্র পুরীর নেতৃত্বে বেশ কিছু বাঙালি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদ

বর্জন করে বৈষ্ণবীয় মতাদর্শ গ্রহণ করলেন। কিন্তু শাঙ্কর উপাধি পরিত্যাগ করলেন না। এসব সন্ন্যাসীদের বলা হয়েছে "devotional Samkarites"।[২৮] বৃন্দাবন দাসের একটি বিবরণ অনুসারে কোন অজ্ঞাতপরিচয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গেও নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।[২৯]

ভাবোচ্ছ্বাস ছাড়া ধর্মশাস্ত্রের, নব্যন্যায়ের, ব্যাকরণের ও ব্রাহ্মণ্যতার নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু নিত্যানন্দ ভাবের ঘোরে যা করেছেন; তা অবিশ্বাস্য! "মদ আন, মদ আন" বলে তিনি চেঁচিয়েছেন; কখনও কেঁদেছেন কখনও হেসেছেন; কখনও দিগম্বর হয়েছেন; বাল্যভাবে স্তনপান পর্যন্ত করেছেন। গঙ্গায় ভেসে বেড়িয়েছেন; বালকদের মারধর করেছেন; গোয়ালাদের দুধ-ঘি নিয়ে পালিয়েছেন, এবং "কুমারী দেখিয়া বোলে করিবে বিবাহে"।

চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায় ॥[৩০]

নিত্যানন্দের তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ তো ফোঁটা কাটা তিলকধারী তুলসীর মালা পরা চোখের জলে গাল-ভিজানো নিরীহ বৈষ্ণব নয়। কবি জ্ঞানদাসের ভাষায়, নিত্যানন্দ

মত্ত সিংহ যেন গরজন ঘন ঘন
জগমাঝে কাহু না মানে ॥[৩১]

জগাই-মাধাই উদ্ধার নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের একটা বড় ঘটনা। এ ব্যাপারে নিত্যানন্দই অগ্রগামী হয়ে মাধাইয়ের মদ্যাভাণ্ডের কাণায় নিজের মাথা ফাটালেন। তা দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে চৈতন্য হুঙ্কার দিয়ে বলেন: "চক্র চক্র চক্র"; অর্থাৎ, বিষ্ণুর চক্র দিয়েই তিনি হতভাগা দাঙ্গাবাজ মাতাল দু'টির মাথা কাটবেন। অসামান্য ভাবোন্মত্ততা ছাড়া এ সব সম্ভাব্য ছিল না।

'দাস্যভাব', অর্থাৎ দাসরূপে কৃষ্ণের উপাসনা। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এটি বেশ প্রাচীন ভাব। কারও কারও মতে "ফিউডাল", সমাজব্যবস্থায় 'দাস্য'ভাবে "প্রভু"র প্রতি "দাস"-দের আনুগত্য প্রকাশিত হয়; তাঁদের মতে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে 'দাস্য'-ভাব মূলক ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমিদাসদের দাস্যের মানসিকতাকে স্থায়ী করে তোলার জন্য দাস্যভাব প্রচারিত হয়েছিল।[৩২] কিন্তু এমন ব্যাখ্যাও আছে যে, দাক্ষিণাত্যে-শৈব ভক্তি-প্রচারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করা।[৩৩]

চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে 'দাস্যভাব'-এর বোধ হয় এই তাৎপর্য ছিল যে, সকলেই যদি কৃষ্ণের 'দাস' হয়, তবে অন্তত কৃষ্ণের উপাসনার ক্ষেত্রে তাদের বর্ণজাতির বিভিন্নতা আর বিচার্য বিষয় হয় না। এই বিশেষ অর্থে 'দাস্য'ভাবে ভূম্যধিকারীর প্রতি প্রজার 'দাস্য' ব্যঞ্জিত হয় না। দাস্যভাবভাবিত নিত্যানন্দের উন্মাদনা এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ-শাসিত নবদ্বীপের সংরক্ষণশীল সমাজে খোলাখুলি 'মধুরভাব'-মূলক

কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা আদৌ সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তাই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের নবদ্বীপলীলায় সর্বদা দাস্যভাবের উপরেই জোর দিয়েছেন। যদি কেবলমাত্র আদিরসাত্মক 'মধুর ভাব' চৈতন্যের ভক্তি প্রচারে প্রাধান্য পেত, তবে তাতে ভক্তি থেকে উৎসারিত সামূহিক আবেগের বিষয়টি প্রাধান্য পেত না; ভক্তের রহস্যময় মধুররসপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রক্ষোভই বড় হয়ে উঠত। তাতে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে জনসাধারণের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ হয়ে যেত।

৪

এক সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ থেকে চব্বিশ পরগণার খড়দহে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৮৩-জন নিত্যানন্দভক্তের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিরাম রামদাস, গদাধরদাস, পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ, নবদ্বীপের "খোলাবেচা" ব্রাহ্মণ শ্রীধর, এবং স্বয়ং বৃন্দাবনদাস।[৩৫] এঁদের মধ্যে অনেকের বাড়িতেই নিত্যানন্দ গিয়ে থেকেছেন। কেউ কেউ "নিত্যানন্দ বিনা নাহি জানে আন"। নিত্যানন্দ সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরেও নিত্যানন্দ "স্বরূপ" ও "অবধূত" রূপেই সুপরিচিত ছিলেন।[৩৫] খড়দহে নিত্যানন্দ সুখে ছিলেন ; তাঁর গৃহের বর্ণনা এইরূপ :[৩৬]

লক্ষ লক্ষ জ্বলে কত প্রদীপ রসাল ॥
বিচিত্র-নির্মাণ হর্ম্য গঠন সুন্দর।
ধ্বজ-পতাকাতে শোভে অতি মনোহর ॥
পারাবত কেলি করে বসিয়া কুটীরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে কোকিল কুহরে ॥
গঙ্গার সমীপে স্থল অতি সুশোভন।
দিব্যভূষাম্বরে শোভে দাস দাসীগণ ॥

পানিহাটির সুপরিচিত বৈষ্ণব রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে নিত্যানন্দের "অভিষেক" অনুষ্ঠিত হয়।[৩৭] তখন তিনি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। অভিষেকানুষ্ঠানের পরেই নিত্যানন্দ শিশুদের সঙ্গে খেলায় মেতে যান। গদাধরদাস "গোপীভাবে পরানন্দময়" হলেন। বলবান অভিরাম রামদাস দারুণ ভারী একটা কাঠ তুলে ধরে তাতে বাঁশী বাজাতে থাকেন। রঘুনাথ বৈদ্য বলরাম পত্নী রেবতী সাজলেন। পরমেশ্বর দাস রাখাল সাজেন, আর পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদ হয়ে গাছে উঠে বসেন। নিত্যানন্দের এক ভাবোন্মত্ত শিষ্য মুরারিচৈতন্য "ব্যাঘ্রগালে চড় মারে সর্পসনে খেলা"।[৩৮] আড়িয়াদহের দাস গদাধর প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে হিন্দু বিদ্বেষী এক কাজী-সাহেবকে ধরেন :[৩৯]

গদাধর বোলে আরে কাজী কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ডো এই মাথা ॥

দাস গদাধরের এই মারাত্মক "গোপীভাব" নিশ্চয় পরবর্তীকালের একদিকে ক্রন্দনমুখরিত, অপরদিকে ঝগড়াটে গোপীভাব নয়।

চৈতন্যাবদানের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কিছুটা নিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি নিয়ম ভেঙে শূদ্রদের গৃহে থাকতেন। তাঁর অভিষেকের সময়ে তাঁর ভাবশিষ্য "দ্বাদশ গোপাল"-দের শ্রীপাট নির্দিষ্ট হল। "গোপাল"দের মধ্যে নয়জন ছিলেন ব্রাহ্মণ ; একজন বৈশ্য, এবং দু'জন বৈদ্য ছিলেন। 'মহান্ত' সংগঠন নবদ্বীপে চৈতন্যের অবস্থানকালে কিছুটা সক্রিয় ছিল। "দ্বাদশ গোপাল"গণ ক্রমশ জনপ্রিয় হলেন। তাঁরা হলেন :[৪০]

নাম	জাতি	শ্রীপাট	জেলা
অভিরাম রামদাস	ব্রাহ্মণ	খানাকুল	হুগলি
সুন্দরানন্দ ঠাকুর	ব্রাহ্মণ	মহেশপুর	যশোহর
ধনঞ্জয় পণ্ডিত	ব্রাহ্মণ	শীতলগ্রাম	বর্ধমান
গৌরীদাস পণ্ডিত	ব্রাহ্মণ	অম্বিকাকালনা	বর্ধমান
কমলাকার পিপ্পলাই	ব্রাহ্মণ	মাহেশ	হুগলি
উদ্ধারণ দত্ত	বৈশ্য	সপ্তগ্রাম	হুগলি
মহেশ পণ্ডিত	ব্রাহ্মণ	পালপাড়া	নদীয়া
পুরুষোত্তম দাস	বৈদ্য	চাঁদুরে	নদীয়া
পরমেশ্বর দাস	বৈদ্য	আটপুর	হুগলি
কালাকৃষ্ণ দাস	ব্রাহ্মণ	আকাইহাট	বর্ধমান
শ্রীধর	ব্রাহ্মণ	নবদ্বীপ	নদীয়া
হলায়ুধ ঠাকুর	ব্রাহ্মণ	রামচন্দ্রপুর	নদীয়া

পরবর্তীকালে দ্বাদশ "উপগোপাল"ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের বণিকদের "উদ্ধার" করেন। বণিকরা সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'নিত্যানন্দপ্রভুর বংশ বিস্তার' অনুসারে বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অসহায় ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র তাঁদের উদ্ধার করেন।[৪১] এই নেড়ানেড়ীরা পরে "সংযোগী" সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ জাতবিচার মানেননি। তিনি পানিহাটিতে ঐতিহাসিক "চিড়ামহোৎসব"-এর অনুষ্ঠান করেন ; এই মহোৎসব রঘুনাথ দাসের অর্থে নিষ্পন্ন হয় :[৪২]

চিড়াদধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভুর আগে সকল ধরিলা ॥
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥

অর্ধেক ঘনাবর্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধচিড়া, আরে দধিচিড়া কৈল ॥

এই "দুগ্ধ চিড়া" এবং "দধিচিড়া" যাঁরা খেলেন, তাঁদের জাতির বিচার করা হয়নি। জয়ানন্দের একটি কথা থেকে মনে হয়, নিত্যানন্দ এই ধরনের উৎসবে স্ত্রীলোকদের যোগদানের অধিকারও মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে "কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে"।[৪২ক]

নিত্যানন্দ গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভক্তিপ্রচার করেছেন ; এই গ্রামগুলো হল[৪৩] চব্বিশ পরগণার হাঁলিসহর, চৌহট্ট, পানিহাটি, তাম্বুলি, পাথরাঘাটা, হাতিয়াগড়, ছত্রভোগ, বরাহনগর, কাঁচড়াপাড়া ও নিমদা ; যশোহরের কাগজপুকুরিয়া, এবং বুঢ়ন ; হুগলির আকনা, মাহেশ, কোতরং, সপ্তগ্রাম ; বর্ধমানের অম্বুয়া, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর, এবং নদীয়ার বড়গাছি, দোগাছিয়া, বাণীদীঘি, ছাতরা, ও হাতিয়া খণ্ড।

কাগজপুকুরিয়ার কট্টর তান্ত্রিক জমিদার রামচন্দ্র খান নিত্যানন্দের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। যেহেতু নিত্যানন্দ সর্বদা প্রথা মানেনি, তাই জীবদ্দশাতেও তাঁকে বহু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে সন্ন্যাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁর সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। এমন কি বৈষ্ণবীয় গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি প্রায় অকারণে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন।[৪৪] অথচ, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনকে নিত্যানন্দই প্রায় একক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অর্থবহ করে তুলেছিলেন।

সূত্রের উল্লেখ

১. গোপীনাথ কবিরাজ, 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ', ১ (কলিকাতা, শ্রীপ্রকাশন, ১৯৬২) পৃ. ১৪০-৪১
২. চৈ. চ, পৃ. ৭১২ ; কবি কর্ণপুর, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়', শ্লোক : ১০৪
৩. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১, অপরার্ধ, পৃ. ১২-১৪ ; Bhai Manilal Parekh, *Sri Vallabhacarya: Life, Teachings And Movement* (Rajkot, Sri Bhagavat Dharma Mission, 1943), ch. XX, pp. 151-168
৩ক. দ্রষ্টব্য : 'হিতকথামৃত', কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি-৮১৬১ ; ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে হরিবংশের আবির্ভাব হয়।
৪. গোপালভট্ট গোস্বামী, 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস', সনাতন গোস্বামী রচিত 'দিগ্‌দর্শনী'-টীকাসহ, সম্পাদক অনুবাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ২য় সং, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৮৯ : "দ্বিজশুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লম্ শূদ্রস্য কীর্তিতম্"।
৫. তদেব, পৃ. ৮৮৯, ১১৫৯
৬. তদেব, পৃ. ১৩৮৭
৭. তদেব, বিলাস-১৭, পৃ. ১-৭, ৪৯ পৃষ্ঠা, শ্লোক-৯২
৮. তদেব, পৃ. ৪৯৬-৯৭
৯. সুকুমার সেন, উপরে উক্ত ১; পূর্বার্ধ, পৃ. ৩১৬-১৭
১০. চৈ. চৈ, ৫৩৮, ৬০৯-১১, ৬১৭-১৯, ৬৩৩-৩৫

১১. Sushil Kumar De, *Vaisnava Faith And Movement*, P. 519
১২. Fredrick S. Growse, *Mathura: A District Memoir (Allahabad, N.W. Provinces and Oudh Government Press, ed. 1880) P. 183;* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালি' (কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৩১) পৃ. ১৯৪-২০১
১৩. গোবিন্দমন্দির সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়েছেন বিশ্বভারতীর গবেষিকা, ড. লিলি মুখার্জি ; তাঁর অপ্রকাশিত নিবন্ধের আখ্যা : "উত্তর ভারতের ধর্মাশ্রয়ী সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গৌবিন্দমন্দির, ১৫৯০-১৯৭০ (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৯০)
১৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'নিজপ্রিয়স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন' [কলিকাতা, আনন্দ পাবিলশার্স প্রা. লি. ১৯৯৩)। পৃ. ৮০-৮১ ; লিলি মুখার্জি, পরিশিষ্ট ১-২, পৃ. ১২৫-১২৮, ১৩১। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, Tarapada Mukherjee, Irfan Habib, "Akbar and the Temples of Mathura and Its Environs," Indian History Congress, Golden Jubilee 48th Session, 1987, P. 68
১৫. লিলি মুখার্জি, পৃ. ৯৭, পরিশিষ্ট—৩
১৬. James Tod, *The Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol I* (আমার সংগ্রহে বইটির আখ্যাপত্র নেই) P. 490
১৭. দ্রষ্টব্য : "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে কসাইখানা", 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" (নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত বৈষ্ণবীয় পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), লিলি মুখার্জি উল্লিখিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৯
১৮. চৈ. চ. পৃ. ৩৮৭ : "আচার্য্যের আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান। আচণ্ডাল আদি দিও কৃষ্ণভক্তিদান ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাহ গৌড় দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি, করিও প্রকাশে ॥"
১৯. চৈ. চ, পৃ. ১৪১
২০. চৈ. ভা, পৃ. ২৪৩-২৪৯
২১. চৈভা, পৃ. ২১৬, ২১৯, ২৪৮-৪৯ : অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক নিত্যানন্দ-বিদূষণ।
২২. চৈ. চ পৃ. ৯৫-১০৩
২৩. চৈ. চ ১৩৮-১৪২
২৩ক. দ্রষ্টব্য : VIB, PP 129-30
২৪. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান', পৃ. ৪৩৫-৪৪০
২৫. তদেব।
২৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পুথি-৭৪২-এর ভিতরে প্রাপ্ত তুলোট কাগজে এই পদ লিখিত হয়েছে। তুলোট কাগজটি পুঁথির অংশ নয়।
২৭. রমাকান্ত চক্রবর্তী, "নিত্যানন্দ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য", 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা-৪ (মে, ১৯৯১), পৃ. ৪১-৬০
২৮. S.K. De, পূর্বোক্ত, P. 19
২৯. চৈ. ভা : "তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবনে', ইত্যাদি : পৃ. ৫৪
৩০. চৈ. ভা : পৃ. ১৪৬, ১৫১-৫২, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৯
৩১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদাবলী' (কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১) পৃ. ৩৭৩
৩২. M.G.S. Menon, Veluthat Kesavan, *"Bhakti Movement in South India,"* D.N. Jha, ed. *Feudal Social Formation in Early India* (Delhi, 1987), pp. 355, 365, 367-68
৩৩. দ্রষ্টব্য : Kami Zvelebil, *The Smile of Murugan* (Leiden, 1973)
৩৪. চৈ. চ. পৃ. ১৩৫-১৩৭
৩৫. E.C. Dimock, *The Place of the Hidden Moon* Chicago, The University of Chicago Press, 1966) P. 40; রমাকান্ত চক্রবর্তী "নিত্যানন্দ ইতিহাস ও ঐতিহ্য," পৃ. ৪৫
৩৬. রাজবল্লভ গোস্বামী, 'মুরলীবিলাস' (বাঘনাপাড়া, নীলকণ্ঠ গোস্বামী ও বিনোদবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, গৌরাব্দ ৪০৯), পৃ. ৮৮
৩৭. চৈ. চ. পৃ. ৩৭৮ ; বৈষ্ণব পদাবলী ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮
৩৮. চৈ. চ. পৃ. ১৩৬
৩৯. চৈ. ভা. পৃ. ৩৮০
৪০. দ্বাদশ গোপাল সম্বন্ধে এখনও যাঁর অসামান্য গবেষণা অত্যন্ত প্রামাণিক, তিনি হলেন বৈষ্ণব ঐতিহাসিক অমূল্যধন রায়ভট্ট। তাঁর রচনা 'দ্বাদশ গোপাল' (পানিহাটি, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

৪১. 'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার' [হালিসহর,প্রকাশক কিশোরীদাস বাবাজী] পৃ. ২৪
৪২. চৈ. চ. পৃ. ৭৩২-৩৪
৪২ক. জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল', বিমানবিহারী মজুমদার, সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১) পৃ. ২৩২
৪৩. চৈ. ভা; পৃ ৩৭৯২ ; জয়ানন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২৪
৪৪. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ মাইতি, চৈতন্য পরিকর, (কলিকাতা, বুক্‌ল্যান্ড, তারিখ নেই] পৃ. ৫২-১০৮

অষ্টম অধ্যায়

খেতুরি উৎসব : পটভূমি, প্রস্তুতি এবং তাৎপর্য

বহুকাল পর্যন্ত চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের কোনও সুস্পষ্ট সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রচারিত হয়নি। স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়। রাঢ়ে-বঙ্গে যে সব বিভিন্ন দল ও উপদল গঠিত হয়, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল :

অদ্বৈত আচার্যের অনুগামী বৈষ্ণবগোষ্ঠী।
নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণব গোষ্ঠী।
শ্রীখণ্ডের "গৌরনাগরবাদী" বৈষ্ণব গোষ্ঠী।
গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী "গদাই-গৌরাঙ্গ" বৈষ্ণবগোষ্ঠী।
চৈতন্যপূজক "গৌরপারম্যবাদী" সম্প্রদায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভক্ত-গোষ্ঠী।
সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

চৈতন্যের নামে যে কিরূপ অসামাজিক ভাবধারা প্রচলিত হয়েছিল, তা শ্রীখণ্ডের "গৌরনাগরবাদ" সামান্যভাবে আলোচনা করলেও স্পষ্ট হয়। কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ড গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ছিলেন নরহরি সরকার। তিনি, কবির ভাষায়, "গৌরাঙ্গ জন্মের আগে/বিবিধ রাগিণীরাগে/ব্রজরস করিলেন গান।"[১] তিনি নবদ্বীপে এসে চৈতন্যের একজন পরিকর হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শ্রীখণ্ডের ঐতিহ্য অনুসারে নরহরি ছিলেন চিরকুমার। তিনি সম্ভবত তান্ত্রিক প্রভাবে 'গৌরনাগরবাদ' প্রচার করেন। এই কারণে বৃন্দাবনদাস তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন :

স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

গৌরাঙ্গনাগরবাদের মূল কথা হল এই যে, গৌরাঙ্গ/চৈতন্য নারীদের দিকে না তাকালেও, তাঁদের সম্বন্ধে গ্রাম্য আলোচনা না শুনলেও, তাঁদের সঙ্গ কামনা না করলেও, নারীরা গৌরাঙ্গের প্রেমে পড়ে উন্মাদিনী হয়েছেন। এই উন্মাদনার বর্ণনা

কখনও কখনও সুন্দর ; লোচনদাস লিখেছেন :[৩]

গৌরাঙ্গচাঁদের অঙ্গেতে হলুদ দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে হলুদ মলিন, রূপয়ে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু মনু গো সখি ! হেরিয়া গৌরাঙ্গ রূপে।
সাধ হয় হেন কর্নে হই পুনঃ এ বরে দি সব সঁপে॥
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি ! শুন ! হিয়াটী কর লো দড়।
পরের নাগরে পরাণ সঁপিলে কলঙ্ক হইবে বড়॥

কিন্তু এইরূপ উন্মাদনার বর্ণনা প্রায় অভব্য হয়ে উঠল :[৪]

একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়।
খেড়কীর পথে যাইতে দেখিনু যাইছে গৌরাঙ্গ রায়॥
...
পহিলা ননদী মদনে মাতিয়া দাঁড়াইল হাসি হাসি॥
...
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া।
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুনিল।
দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ উলঙ্গ বসন পড়িয়া গেল॥
তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাম।
বস্ত্র পরাব কি ! গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম॥
দুহারে শাসিতে কোরধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল।
বিধির কি কাজ ! গৌরাঙ্গ দেখিয়া বুড়িও উলঙ্গ হৈল॥

চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের এই পরিণাম তো অভাবনীয়।

গদাধর পণ্ডিতের অনুগামীরা প্রায় একই পথের পথিক ছিলেন। তাঁদের মতে গদাধর পণ্ডিত ছিলেন রাধার অবতার। চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণের অবতার। তাঁরা রাধারও উপাসনা করতেন। রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত 'সাধনদীপিকা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁদের পূজাপদ্ধতির বিবরণ আছে।[৫] তাতে বামাচারী তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। একটি শ্লোকে রাধা "কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণসখী বিপরীত-রতিপ্রিয়া।"[৬] আধুনিক কালে গদাধর পণ্ডিতের মতাবলম্বী বৈষ্ণব কবি গান লিখেছেন :[৭]

দিদি ! দুই ভাতারের ঘরকন্না কি বিষম দায়।
সব বিরুদ্ধ স্বভাব তায়॥
...
তায় কারো সঙ্গে নাই কারো মিশাল
একটা বাঙ্গাল [অর্থাৎ চৈতন্য], একটা দেশাল [অর্থাৎ কৃষ্ণ]
কেহ ডালভাতে খোসাল
কেহ মাখন রুটি চায়॥

এই দারুণ গানের রচয়িতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট বৈষ্ণব, বাউল নন। তিনি আরও লিখেছেন :

[গদাই দাসীর উক্তি]
কলিযুগে দুই ভাতারই সদুপায়।
দুই সিদ্ধ দেহে ভজবি তায়॥

এটাই কী চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ? বিশেষভাবে রাঢ়ে বিপথগামী এক বৈষ্ণব সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস মন্তব্য করেন :[৮]

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলয় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥

২

এইরূপ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বৃন্দাবনে উদ্ভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বাবলীর প্রচলন বাঞ্ছনীয় ছিল। রহস্যবাদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি না থাকলে তার বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাকে রোধ করা যায় না। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণবীয় অতীন্দ্রিয়বাদকে শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা সদাচারের উপরে, বৈষ্ণব স্মৃতির উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বৈষ্ণবীয় তুরীয় আদিরসকে তাঁরা যে ভাবে হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন, তার কোনও সমান্তর রাঢ়ে বঙ্গে দেখা যায়নি। অদ্বৈত আচার্যের জ্ঞানভক্তি, নিত্যানন্দের দাস্যভক্তি, গদাধর পণ্ডিতের রাধাভাব, নরহরি সরকারের গৌরনাগরবাদ—এ সবের কোনও সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল না। চৈতন্যের মতকে কেন্দ্র করে ঔপসাম্প্রদায়িক বিভিন্নতাও কাম্য ছিল না।

প্রসঙ্গত প্রতিভাশালী বৈষ্ণব সাহিত্যিক কবি কর্ণপুরের অবস্থান উল্লেখ্য। তাঁর রচিত চৈতন্যের জীবনীতে, 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'তে, এবং তাঁর নামে প্রচলিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে কোনও বিশেষ তাত্ত্বিক কাঠামো দেখা যায় না। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থে দৃষ্টান্তসহ নন্দনতত্ত্বের উপস্থাপনা, এবং উপস্থাপনার পদ্ধতি রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' থেকে ভিন্ন, এবং প্রধানত সাহিত্যিক। তাঁর রচনারূপে খ্যাত 'কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী' পড়ে এই ধারণা হয় যে, তিনিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় "স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন"-এর প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। একজন আধুনিক সমালোচক লিখেছেন যে, কর্ণপুর সংস্কৃত মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ করেন। তিনি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। তার ফলে তাঁর সৃষ্ট নায়কের কোনও ঈশ্বরত্ব ছিল না। সেই জন্য তিনি 'রসাভাস'-দোষদুষ্ট হয়ে পড়েন।[৯] অথচ এটাও স্পষ্ট যে, কর্ণপুর সর্বদা প্রচল-নির্ভরতাকে পছন্দ করেননি। সকলের একই রকম ভাবে কৃষ্ণলীলার বিবরণ দেওয়ার রীতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র বঙ্গে প্রচলিত হওয়ার পূর্বেও মেনে চলা হয়েছে কি না, এ প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর নেই। বিমানবিহারী মজুমদার

ভেবেছেন যে, কবি কর্ণপূর চৈতন্যকে কৃষ্ণের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন মনে করতেন।[১০] এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কৃষ্ণ-উপাসকগণ তাঁকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। রাধাগোবিন্দ নাথ বিমানবিহারী মজুমদারের এইরূপ মূল্যায়নের বিরোধিতা করেছেন।[১১]

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের দলাদলির এবং অন্যান্য সমস্যার ও অসুবিধার কথা বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ জানতেন। নিত্যানন্দের সহধর্মিণী, এবং গুরুরূপে বিশেষভাবে সম্মাননীয়া জাহ্নবাদেবী দু'বার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, এবং গোস্বামীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে বঙ্গে ফিরে এসে তিনি প্রধান বৈষ্ণবদের সঙ্গে কথা বলেন। জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এ সকল ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[১২] এ গ্রন্থের প্রামাণ্যতা সর্বাংশে প্রশ্নাতীত না হলেও তাতে প্রকাশিত সমন্বয়-সাধনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়।

৩

এ সময়ে বৃন্দাবনে তিনজন প্রভাবশালী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁরা হলেন বর্ধমান জেলার যাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, রাজশাহী জেলার খেতুরির নরোত্তম দত্ত, এবং মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা-বাহাদুরপুরের শ্যামানন্দ। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ, নরোত্তম ছিলেন "রাজা" কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র, এবং শ্যামানন্দ ছিলেন সদ্‌গোপ। এঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। নরোত্তম দত্ত সন্ন্যাস অবলম্বন করে খেতুরিতেই থাকতেন। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হয়েছিলেন। প্রতিভাশালী সংগঠক শ্যামানন্দ "প্রভু"রূপে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী মুর্শিদাবাদে একটি বড় বৈষ্ণব গোষ্ঠীর গুরুরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর অবদান যদুনন্দন-রচিত 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শ্যামানন্দের অবদান বর্ণিত হয়েছে গোপীজনবল্লভ দাস-রচিত 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে। অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্তী 'নরোত্তম-বিলাস' রচনা করেন।[১৩]

এই তিন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখন সনাতন ও রূপ জীবিত ছিলেন না। শ্রীনিবাসকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব শিখিয়েছিলেন জীব গোস্বামী। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেখানে বৈষ্ণবদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দকে নির্বাচিত পুথিসমূহ বঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এ সব পুথির কোনও তালিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি। রাধাগোবিন্দ নাথের মতে তাদের মধ্যে ছিল সনাতন ও রূপের রচনাবলী, এবং জীব গোস্বামীর নিবন্ধসমূহ। গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসের দীক্ষাগুরুরূপে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছেন। তা হলে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস'-ও শ্রীনিবাস বঙ্গে নিয়ে আসেন।

দুই গাড়ি-ভর্তি পুথি নিয়ে এই তিনজন পরিশ্রান্ত বৈষ্ণব বঙ্গে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু গোপালপুর নামক গ্রামে ডাকাতরা গাড়ি দুটো লুঠ করে।[১৪] গ্রামটি ছিল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের রাজ্যে। সর্বনাশ হয়ে গেল। নরোত্তম খেতুরিতে, এবং শ্যামানন্দ ধারেন্দাতে চলে গেলেন। শ্রীনিবাস লুণ্ঠিত পুথির খোঁজ করতে থাকলেন। পুথির খোঁজে শ্রীনিবাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন বিষ্ণুপুরে। সেখানে এক বিচার-সভায় তিনি সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্যকে সহজেই পরাস্ত করলেন। ব্যাসাচার্য, এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক বাগ্‌দি-জাতীয় রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের শিষ্য হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেন। বীর-হাম্বীরের বৈষ্ণবীয় নাম হল 'চৈতন্যদাস'। লুণ্ঠিত পুথিগুলো শ্রীনিবাস ফিরে পেলেন। সম্ভবত বীর হাম্বীরের ভাড়াটে দস্যুরাই পুথিগুলো লুঠ করেছিল।[১৪]

৪

পুথি ফিরে পাওয়ার শুভবার্তা রটে গেল। কিন্তু বৃন্দাবনী ভাষ্য প্রচার করা খুব সহজ ছিল না। কথিত আছে, শ্রীনিবাস নরহরি সরকার ও গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করেন। এঁরাই ছিলেন বঙ্গে চৈতন্যপূজনের শক্তিশালী সমর্থক। অবশ্য তখনও নরহরি সরকার ও গদাধর পণ্ডিত জীবিত ছিলেন কি না সন্দেহ। শ্রীনিবাসের পাশে এসে দাঁড়ান রামচন্দ্র কবিরাজ, তিনি ছিলেন কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের বড় ভাই। কর্মপন্থা স্থির করার জন্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্যামানন্দ আবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন নরহরি সরকারের তিরোধানের পরে। সেখানে জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়। সম্ভবত জীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমের "স্বকীয়া" ও "বৈধী"-তত্ত্ব প্রচারের উপরেই জোর দেন। সম্ভবত বৃন্দাবনেই স্থির করা হয় যে, "মহোৎসব" করে বিভিন্ন বৈষ্ণবদের এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, এবং তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচার করতে হবে। কিন্তু তার জন্য অর্থ ব্যয় অবধারিত ছিল। অনুমান, সেই অর্থ জুগিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রাজা বীর হাম্বীর, শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ, খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত, রেমুণার রাজপুত্র, এবং স্বয়ং বৈষ্ণবগুরু রসিকানন্দ এবং নিত্যানন্দের বণিক-শিষ্যগণ। নিত্যানন্দের শিষ্য গদাধর দাসের তিরোধান উপলক্ষে কাটোয়াতে এবং শ্রীখণ্ডে পর পর দু'টি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৫] কাটোয়ার মহোৎসবে নিত্যানন্দের এবং অদ্বৈত আচার্যের অনুগামিগণ যোগদান করেন। শ্রীনিবাসের উদ্যোগে যাজীগ্রামেও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অদ্বৈত আচার্যের দুই পুত্র, এবং নিত্যানন্দের প্রভাবশালী পুত্র বীরভদ্র এসেছিলেন। শ্রীনিবাসের অসাধারণ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে বীরভদ্র আনন্দে নেচেছিলেন।[১৬]

এ সব মহোৎসবে এটা বোঝা গেল যে, বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা একতার জন্যই বৃন্দাবনের "গোস্বামীশাস্ত্র" গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না। একতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন জাহ্নবাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ, এবং তাঁদের সমর্থকগণ, নিত্যানন্দের, অদ্বৈত

আচার্যের, গদাধর পণ্ডিতের, নরহরি সরকারের সমর্থকগণ। এবং পুরীর চৈতন্যভক্তগণ তাঁদের বিরোধিতা করেননি। তাঁদের সমর্থন করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী রাজা, ভূস্বামী ও বণিকগণ। এইরূপ ব্যাপক সমর্থনের প্রমাণ আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রদত্ত চারটি "শাখা"র প্রধান বৈষ্ণবদের তালিকায়।[১৭] এই তালিকার বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। চৈতন্যের পরবর্তীকালে বঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলন এ ভাবেই গতিশীল এবং অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে বড় মহোৎসব খেতুরিতে অনুষ্ঠিত হয়।[১৮] উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার সম্প্রসারণের জন্যই খেতুরিকে বেছে নেওয়া হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গে শাক্ত বামাচার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তার পৃষ্ঠপোষক ছিল দস্যু-বৃত্তিধারী স্থানীয় জমিদারগণ। শাক্ত প্রভাবকে খর্ব করার জন্যও খেতুরিতে মহোৎসব করা হয়। এই উৎসবের তারিখ বিতর্কিত। এতে শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ যোগদান করেন। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিরোধান হয়। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ১৬১০ থেকে ১৬২০-র মধ্যে প্রথম খেতুরি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে জাহ্নবাদেবীর নেতৃত্বে উনত্রিশ জন বৈষ্ণব, নবদ্বীপের তিন জন বৈষ্ণব, শান্তিপুরের ন' জন বৈষ্ণব, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের ছত্রিশ জন বৈষ্ণব, মেদিনীপুরের দু' জন বৈষ্ণব এবং অন্যান্য স্থান থেকে ষোল জন বৈষ্ণব যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন জাহ্নবাদেবী, কবি জ্ঞানদাস, কমলাকর পিপ্পলাই, মীনকেতন রামদাস, কবি বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, অচ্যুতানন্দ, বিষ্ণুদাস আচার্য, কবি গোবিন্দদাস, কবি লোচনদাস, মঙ্গল ঠাকুর, ব্যাসাচার্য, ঢাকা-বিক্রমপুরের "কাষ্ঠকাটা" জগন্নাথ, শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ, কবি কর্ণপুর, এবং অবশ্যই শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দত্ত। এ সকল প্রধান বৈষ্ণবদের সঙ্গে বহু লোক এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

খেতুরি-উৎসবে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তাতে চৈতন্যপূজন, কৃষ্ণপূজন, কীর্তন, মহোৎসব, সারা বৎসর ধরে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ প্রাধান্য পেল। বল্লভীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত এবং রাধামোহন পূজনীয় দেবতারূপে মান্যতা পেলেন। বলা হয়েছে :[১৯]

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে॥

ঐতিহ্য অনুসারে খেতুরিতেই সুস্পষ্টভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রচিত শাস্ত্র সর্ববৈষ্ণবগ্রাহ্য হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের যুগলমন্ত্রে চৈতন্যের মূর্তিপূজার নির্দেশ মেনে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, বাঙালি বৈষ্ণবদের চৈতন্যপূজনের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা পরিকল্পিত কৃষ্ণপূজনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল :[২০]

কৃষ্ণ গৌর এক এবে ভেদবুদ্ধি যার।
সে যায় নরকে তার নাহিক নিস্তার॥

অর্থাৎ "গৌরপারম্যবাদ" পরিত্যক্ত হল। রূপ গোস্বামী পরিকল্পিত "অষ্টকালীন শ্রীসেবার বিধি" অবলম্বিত হল। শ্রীনিবাস আচার্য এমন দাবিও করেছিলেন যে, বৃন্দাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দ্বারা বিশিষ্ট তিনটি বৈষ্ণব কেন্দ্র বঙ্গে গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রগুলো ছিল যাজীগ্রাম, খেতুরি ও বিষ্ণুপুর। বঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলী "শাস্ত্র"রূপে প্রশ্নাতীত হয়ে গেল। যাঁরা তা মানতে চাইলেন না, তাঁদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কোনরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হল না। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চূড়াধারী, মাধব, কপীন্দ্রী, বিষ্ণুদাস, এবং বাসুদেব। সম্ভবত এঁরা সহজিয়া বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের এক বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন বর্ধমানের কাঁদরা-গ্রামনিবাসী কায়স্থ-জাতীয় জয়গোপাল দাস। জয়গোপাল নিজেও গুরু ছিলেন। জাতিতে কায়স্থ হলেও তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। এইরূপ প্রাতিলৌম্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই জয়গোপাল দাসকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অপাংক্তেয় ঘোষণা করে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :[২১]

তেন সার্ধম্ মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকম্ ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধম্, ভবতাপি তথালাপাদিম্ ন কর্তব্যমিতি॥
(আমরা জয়গোপালের সঙ্গে কথা বলিনা ; আমিও তা নিষিদ্ধ করেছি ; আপনারাও তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না।)

৫

চৈতন্যের তিরোধানের পরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের ভাবধারা যে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তা বীরভদ্রের 'পত্রী' থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। বীরভদ্র নিজেই এমন এক বিতর্কিত বৈষ্ণব ছিলেন যে, নিত্যানন্দের মুখ থেকে সব কথা শুনেও বৃন্দাবনদাস "চৈতন্যভাগবত"-এ একবারও তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

জাহ্নবাদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস তাঁর 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের আচার আচরণ সম্বন্ধে কিছু কথা লিখেছিলেন। তাঁর এই বিবৃতি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ; তাঁর ভাষার অর্থ কোথাও কোথাও অমিশ্চিত। এই অস্পষ্টতার একটা কারণ ছিল এই যে, বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা, এবং খেতুরি উৎসবে আলোচিত এবং প্রচারিত এ সকল কথা সকল বৈষ্ণবের বোধগম্য হয়নি। নরোত্তম দত্ত তা অনুভব করেন, এবং তত্ত্বাবলীর একটি প্রাঞ্জল ভাষ্যরূপে "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" রচনা করেন :[২২]

সেই দিনে বর্ণিলা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।
প্রাপ্তাপ্রাপ্ত ভক্তিরস আছয়ে অধিকা॥

শ্রীরূপের সিদ্ধগ্রন্থ তাহার পয়ার।
শিষ্যগণ লাগি তাহা করিল প্রচার ॥

কিন্তু নিত্যানন্দ দাসের ব্যাখ্যার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন।[২৩] তিনি প্রধানত বৈষ্ণবাচারের প্রসঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমে গৃহস্থ বৈষ্ণবদের কথা বলা হয়েছে। এই বৈষ্ণব "কৃষ্ণসেবা" ও "বৈষ্ণবসেবন" করেন। কিন্তু যে সব বৈষ্ণব "রাধাপরিকর", তাঁরা "গৃহকর্মত্যাগী। শাস্ত্র লঙ্ঘি হৈলা কৃষ্ণ-সেবায় অনুরাগী"। অর্থাৎ "মঞ্জরী"-ভাব ভাবিত বৈষ্ণবদের পক্ষে প্রচলিত স্মার্ত বিধানসমূহ পালনীয় নাও হতে পারে। তাঁদের অতীন্দ্রিয়বাদে শাস্ত্রের স্থান ছিল না। এই বৈষ্ণবরাই শেষপর্যন্ত কঠোর সাধনায় "কৃষ্ণতেজোময় সিদ্ধ" হন। নিত্যানন্দ দাসের মতে চব্বিশ রকমের বৈষ্ণব সিদ্ধ-সাধকগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাঁদের মধ্যে একান্তভাবে "গৌরাঙ্গ ভক্ত"-রাও ছিলেন। গৌরাঙ্গ-ভক্ত "সাধন করিতে গৌরাঙ্গসুখ পান মনে"। এখানে গৌরপারম্যবাদের ও গৌরনাগরবাদের স্বীকৃতি দেখা যায়। শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরবাদী বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনী তত্ত্বের প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। তাই খেতুরিতে তাঁদের মতকেও বর্জনীয় মনে করা হয়নি।

নিত্যানন্দ দাসের মতে বৈষ্ণবরা ছিলেন "আশ্রমী" ও "আশ্রমাতীত"। "আশ্রমী" বৈষ্ণব সংসারী বৈষ্ণব; সর্বদাই তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে মিল নাও থাকতে পারে। "কহে এক করে এক বুঝা নাহি যায়"। আশ্রমী বৈষ্ণবদের উচিত "কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা কৃপাবলোকনে", তাতে "সপরিবার যদি আনন্দ হয় মনে ॥ " কিন্তু আশ্রমী বৈষ্ণবের পক্ষে "কৃষ্ণার্থে" "অখিল চেষ্টা" করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর ভক্তি "সাপেক্ষ" হয়ে যায়, এবং "সাপেক্ষ হইলে ভক্তি ভজন না হয়/উপেক্ষিতে নিরবধি মনে উঠে ভয় ॥ " অর্থাৎ যথার্থ ভজন করতে হলে সংসারধর্ম পালন করা যায় না। এই তত্ত্বে সন্ন্যাসের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। নিজেকে "অধিকারী" ভাবলেই সব হয় না : "অধিকারী আমি হই করে অভিমান/কর্মক্রিয়া করে ভজনের নাহিক সন্ধান ॥ "

আচার্য এবং শিষ্য একই ধর্মপালন করবেন : "আচার্য যেমন ধর্ম করে আচরণ/সেই মত শিষ্যধর্ম করিবে প্রবর্তন ॥ " তবুও, সকলেই কি আর প্রকৃত বৈষ্ণব হতে পারেন ? "কেহ কেহ লভে কারো বোধ নাহি হয়।" বৈষ্ণবধর্মকে অনেকেই একটা "গ্রাম্য ব্যবসায়" করে তুলেছিলেন। কায়মনবাক্য সমন্বিত হলেই প্রকৃত অর্থে বৈষ্ণব হওয়া যেত : "মনে কৃষ্ণ কাযে গুরু বাক্যেতে বৈষ্ণব/যেই জানে যার হয় হেন অনুভব ॥ " বৈষ্ণব-ধর্ম "এক সম" ; অর্থাৎ, এ ধর্মে তত্ত্ব ও অভ্যাসের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই : "জানিব বৈষ্ণব ধর্ম এক সম হয়/ হেন জনে প্রেমভক্তি [দাস্যভাব] অন্তরে জন্মায় ॥ " একটা সময় পর্যন্ত বৈষ্ণবরা শাস্ত্র-নির্দেশ পালন করবেন, সাধুদের উপদেশ শুনবেন ; কিছুকাল সংসার-ধর্ম পালন করবেন, শেষে সব ছেড়ে "উদাসীন" হবেন :[২৪]

শাস্ত্র সাধুবাক্য সদা করিব শ্রবণ।

বিষয় সংসার ভোগ করি কতদিন।
সকল ছাড়িয়া শেষে হব উদাসীন ॥

সিদ্ধ অবস্থায় "গুরু পদাশ্রয় নাই মন্ত্রাদি গ্রহণ।" নিজের দেহকে গুপ্ত-বৃন্দাবন ভেবে সেখানেই সাধন চলবে তখন : "নিজ অঙ্গে সাধনাঙ্গ করিব পালন।" ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের কর্তব্য ভিন্ন। "ব্রাহ্মণের পৃথক কর্ম বৈষ্ণবের আর"। যাঁরা সাধারণ বৈষ্ণব, গুরু ছাড়া তাঁদের গতি নেই। বৈষ্ণবের লোকনিন্দা তৃণসম বোধ ; লোকনিন্দার ভয় থাকলে ভক্তি হয় না। যে কর্ম নিত্যনৈমিত্তিক, তাতে ভক্তি নাও থাকতে পারে : "নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য সঙ্কল্প মানস/নিষ্ঠাভক্তি নাহি চলে হৈলে তার বশ ॥ " গুরুকে রাধার "সখী"; এবং নিজেকে গুরুর "সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী"রূপে ভাবতে হবে।

কিন্তু এইরূপ সাধনার সঙ্গে সংসারাশ্রমী "অধিকারী"দের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। "অধিকারী"দের সমালোচনা করে নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন যে, তাঁরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করেন ; বহু শিষ্য না করার নির্দেশ থাকলেও শত শত লোককে শিষ্য করেন ; বহু অর্থ উপার্জন করেন ; বৈষ্ণবদের পূজা না করে পরিজনদের পালন করেন ; নিজেদের "সিদ্ধ" বলে প্রচার করেন, এবং

কুলীন আনিয়া পুত্র কন্যা দান করে ॥
শতাবধি মুদ্রা দেয় পাত্রের ভূষণ।
কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা এঁহ কহয়ে বচন ॥
[শাক্তশৈব] সহ সম্বন্ধ করে ভক্ষ্য ব্যবহার।
হইলাম বড় কুলীন দম্ভ করে আর ॥
কৃষ্ণকে না ভজে সদা গ্রাম্য কথা কয়।
এই মত আছে সদা কাল যায় ক্ষয় ॥

৬

বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় ছিল। তাই প্রতিভাবান্ বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দত্ত 'প্রার্থনা' এবং 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' রচনা করেন। প্রভাবশালী 'গোপাল-গুণ নিত্যানন্দ-প্রচারিত দাস্যভাবের প্রচার করেছিলেন। নরোত্তম দত্ত দাস্যভাবের রূপান্তর ঘটালেন "মঞ্জরী"-তত্ত্ব প্রচার করে। রাধাকৃষ্ণের লীলায় সখী ও দাসীদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁরা 'মঞ্জরী'-রূপে আখ্যাত হলেন। কৃষ্ণ 'মঞ্জরী'-দেরও উপভোগ করেন।[২৫ক] নরোত্তম নিজেই "বিলাস-মঞ্জরী" রূপে খ্যাত হলেন। রূপ গোস্বামী "রূপমঞ্জরী" ; তিনিই রাধার দাসী/সখী। অন্যান্য "মঞ্জরী"গণ তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকেন। খুব বড় ভক্ত এবং সাধুই "মঞ্জরী" হতে পারেন। তাঁর সংসারধর্ম পালন করা সম্ভব হয় না। নরোত্তমের একটি সুন্দর "প্রার্থনা" এইরূপ :[২৬]

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতনবেদীর উপর বসাব দু' জন ॥
শ্যাম-গোরী অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীমালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।

"মঞ্জরী"-ভাব-ভাবিত বৈষ্ণব-কবি, শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কবি কবিশেখর রাধার রান্নাঘরে পর্যন্ত অবস্থান করেন :[২৭]

রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝি [রাধা]
সব সখীগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঘি ॥[২৮]

এখানে "ঘি" শব্দের অর্থ স্থায়ীভাবরূপ ঈশ্বরপ্রীতির স্তর "স্নেহ" ; তাই "ঘি"। নবদ্বীপে চৈতন্যের ঘরে ঘরে 'নাম'-প্রচার দুরতিক্রম্য কালের প্রভাবে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়ল।

এমন কখনই বলা যায় না যে নরোত্তম চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দকে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত কবিতাবলীতে বৃন্দাবনী তত্ত্বের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। তিনি বহু দেবদেবী পূজন সমর্থন করেননি, বৈষ্ণব একেশ্বরবাদকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রচার করেছেন। তিনি লিখেছেন :[২৯]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবীদেবা
এই ভক্তি-পরমকারণ ॥

অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে প্রচলিত পঞ্চোপাসনার সঙ্গে মিশ্রিত করা যাবে না। নরোত্তম ধনী গৃহের সন্তান হলেও আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন। নিত্যানন্দ দাস তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এইরূপ বিবরণ দিয়েছেন :[৩০]

চারদণ্ড নিদ্রান্তে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে শয্যাত্যাগ। গৌরাঙ্গের মঙ্গলারতি দর্শন। দন্তধাবন। প্রাতঃকৃত্যাদি। স্নান। ভজন-কুটীরে তিলক সেবা। স্তব পাঠ। পাঁচবার মন্দির পরিক্রমণ। ভূমিতে লুটিয়ে ঠাকুরপ্রণাম। চরণামৃত পান। ঠাকুরের ভোজনের পরে আবার স্নান। আরতি। ঠাকুরকে প্রণাম করে অন্যান্য বৈষ্ণব, অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে প্রসাদ ভক্ষণ। ভক্ষণ কালে "কৃষ্ণকথা নেত্রে বহে জল।" আচমনান্তে একখণ্ড হরিতকী ভক্ষণ। সমস্ত দিনরাত ধরে লক্ষ বার নামজপ।

কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যে প্রণালী রূপ গোস্বামী প্রচলিত করেছিলেন, খেতুরি-উৎসবে চৈতন্য এবং কৃষ্ণ এক হয়ে যাওয়াতে তা চৈতন্যের অষ্টকালীন লীলার স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের জন্যও গ্রহণ করা হল। কিন্তু যেমন বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ একস্থান ছিল না, তেমন চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলা একই লীলা ছিল না। কবি কর্ণপূরের রচনারূপে প্রসিদ্ধ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-তে চৈতন্যের এবং চৈতন্যের পরিকরদের একটা পৌরাণিক পরিচয় দেওয়ার প্রক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এবং কোনও কোনও পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রামাণ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ঐতিহ্য অনুসারে স্বরূপ দামোদর "পঞ্চতত্ত্ব"-মূলক ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, বৃন্দাবনেও তা মেনে নেওয়া হয়। 'পঞ্চতত্ত্ব' যথাক্রমে চৈতন্যের, অদ্বৈত আচার্যের, নিত্যানন্দের, গদাধর পণ্ডিতের ও শ্রীনিবাসের উপসনামূলক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দেবত্ব স্বীকৃত হয়নি। কবি লোচনদাস এই তত্ত্বের সঙ্গে নরহরি সরকারকেও যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবসমাজের বাইরে তা স্বীকৃত হয়নি।

চৈতন্যপূজনেরও কোনও সাধারণ পদ্ধতি ছিল না। 'পঞ্চতত্ত্ব' ছিল একতার তত্ত্ব। কিন্তু অনৈক্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল। 'ভাব'-বিষয়ে, সাধনা-বিষয়ে অনৈক্য ছিল। চৈতন্যের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 'সহস্রনাম' রচিত হয় ; তাকে "মহাভাবস্বরূপিনী" রাধা ভাবা হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে নরোত্তম দত্তের 'শাখা'-র উড়িয়া বৈষ্ণব এবং 'পদকল্পতরু' সংকলক বিখ্যাত বৈষ্ণবদাসের শিষ্য, কৃষ্ণদাস বাবাজী বৃন্দাবনে, এ সকল সমস্যার সমাধান কল্পে, কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সব গ্রন্থের আখ্যা 'ভাবনাসার সংগ্রহ', 'গুটিকা', 'গৌরগোবিন্দার্চনস্মরণপদ্ধতি' এবং 'সাধনামৃতচন্দ্রিকা'। তিনি রাধার পূজনপদ্ধতিও নির্দিষ্ট করেছিলেন।

'সাধনামৃতচন্দ্রিকা' গ্রন্থে উষাকালের, প্রাতঃকালের, মধ্যাহ্নের, অপরাহ্নের, সন্ধ্যাকালের, এবং রাত্রির কৃত্যসমূহ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩১] প্রথমে চৈতন্যলীলা স্মরণীয় ; তার পরে স্মরণীয় কৃষ্ণলীলা। কীর্তনগানের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে ; কীর্তনের শুরু হয় "গৌরচন্দ্রিকা" দিয়ে। এ গ্রন্থে গুরু মঞ্জরীদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতে ছয় গোস্বামীর ও নিবাস-আচার্যের উল্লেখ না থাকায় কৃষ্ণদাস বাবাজীকে কিছুটা সমালোচনা সহ্য করতে হয়।

রাধাকৃষ্ণের এবং চৈতন্যের পূজন একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাতে কর্মকাণ্ড অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কর্মকাণ্ডে যে বিচারবুদ্ধি থাকে, নির্বাচনের প্রক্রিয়া থকে, অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনে তা থাকে না। বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার এটা একটা বড় কারণ ছিল। কিন্তু সমস্ত বিষয়টি প্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো পল্লবিত হয়ে পড়ে ; দণ্ড, পল, মুহূর্ত অনুসারে চৈতন্যের ও

রাধাকৃষ্ণের লীলার স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন বড়ই জটিল হয়ে ওঠে। এই জটিলতা "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী"তেও দেখা গেল, যথা :[৩১]

প্রভাত—গৃহাগমন ; অনুদয়—দেব্যাগমন ; দিবা অর্ধদণ্ড—কারুণ্যস্নান ; দিবা দ্বিতীয় দণ্ড—সখী বিতর্ক ; তৃতীয় দণ্ড—নাগর উন্মত্ত ; চতুর্থ দণ্ড—গো দোহন ; পঞ্চম দণ্ড—রাধার ভোজন ; একাদশ দণ্ড—দিবাভিসার ; চতুর্দশ দণ্ড—মিলন ও মধুপান ; ঊনবিংশ দণ্ড—পাশা খেলা, ইত্যাদি।

এই ধরনের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক স্পষ্ট নয়।

সূত্রের উল্লেখ

১· 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ৩০৩ : "শ্রীখণ্ড মহিমা"।
২· চৈ.ভা, পৃ. ৯০ : এখানে উল্লেখ্য নরহরি সরকার তাঁর মতাবলম্বীদের সর্বদা সুনীতি পালনের নির্দেশও দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য : গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' (শ্রীখণ্ড, যশোদানন্দন ঠাকুর, ২য় সং, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ২৫-২৬
৩· জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত, 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৮১, পদ-৯ ; মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত পরবর্তী সংস্করণে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) এই সুন্দর পদটির ক্রিয়াপদগুলি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে।
৪· 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী', পদ-১০০, পৃ. ১৯৮ ; এই ধরনের পদাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য : হরিদাস দাস সম্পাদিত, 'গৌরচরিত্র চিন্তামণি', প্রথম খণ্ড (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, গৌরাব্দ ৪৬১)
৫· রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, 'সাধনদীপিকা', হরিদাস দাস সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৬), অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য।
৬· তদেব, পৃ. ১৩৫, শ্লোক-৫
৭· হরিদাস দাস, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২ (২য়-সং, নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৮৭) পৃ. ১৬১৫-১৬১৬
৮· চৈ.ভা, পৃ. ৮৬
৯· Sivaprasad Bhattacharya, "Two Ascriptions Examined", *Our Heritage* January-June, 1956, Vol. IV. pp. 14-15
১০· বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা : VIB, pp. 203-206; প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন', প্রাগুক্ত, পৃ ১১-২৭
১১· বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', পৃ. ১১১-১৩; রাধাগোবিন্দ নাথ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা', পৃ. ৩৬৬-৩৭০
১২· নিত্যানন্দ দাস, 'প্রেমবিলাস', রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ-সংশোধিত (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৯-৬৭, ১০০-১১০, ১১১-১৩৩, ১৩৪-১৬০, ১৬১-১৮৬, ১৮৭-২১২, ২১৩-২৩৮
১৩· যদুনন্দন 'কর্ণানন্দ', রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ১৮৯২), নরহরি চক্রবর্তী, 'নরোত্তম বিলাস', রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ১৯২১) ; নিত্যানন্দ দাস, 'প্রেমবিলাস', যশোদালাল তালুকদার সম্পাদিত (কলিকাতা, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ : এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ২৪ অধ্যায় অপ্রামাণিক বিবেচিত হয়) ; গোপীজনবল্লভ দাস, 'রসিকমঙ্গল', সারদাপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত (তমলুক, আওয়াস-বাড়ী, 'তারিখ নেই' : প্রামাণিক এবং দুষ্প্রাপ্য), নরহরি চক্রবর্তী, 'ভক্তিরত্নাকর', নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত (কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, ১৯৬০)
১৪· 'ভক্তিরত্নাকর', সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ৩৪১-৩৫৬ ; বীর হাম্বীর : Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, প্রাগুক্ত, Ch. XIII, p. 236.
১৫· 'ভক্তিরত্নাকর', পৃ. ৩৯৩-৩৯৪ ; জীমূতবাহন রায়, 'শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব

সমাজ' (শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা সমিতি, ১৯৮৪), পৃ. ২৯-২২৫ ; VIB, pp. 216-221
১৬· 'ভক্তিরত্নাকর', পৃ. ৪০১
১৭· চৈ. চ. পৃ. ১২৭-১৪২
১৮· 'প্রেমবিলাস', বিলাস-১৪, বিলাস-১৯ ; 'নরোত্তমবিলাস', পৃ. ১০১, ১০৬-১১২ ; 'ভক্তিরত্নাকর', পৃ. ৪১১, ৪১৭-৪৩০
১৯· 'প্রেমবিলাস', পৃ. ২০৩-২০৭ ; ৩০৫-৩০৬ ; ৩১০-৩১১ ; 'নরোত্তমবিলাস' পৃ. ৮৮-১২৮ ; 'ভক্তিরত্নাকর', পৃ. ৪২১-৪২৯ ; বিশেষভাবে 'নরোত্তমবিলাস', পৃ. ৯১
২০· 'প্রেমবিলাস', পৃ. ৩১৪
২১· 'ভক্তিরত্নাকর', পৃ. ৬৩৮ ; 'প্রেমবিলাস', পৃ. ৩৪২ ; সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১, ২, পৃ. ৬৩-৬৫
২২· "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার', প্রথম খণ্ড (ধান্যকুড়িয়া, শ্রীমদনমোহনমন্দির, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯০-৫০০ ; ইংরেজি-অনুবাদ : Joseph T. O'Connell, "Moonbeam of Loving Devotion or Prema-Bhakti-Candrika of Narottama-dasa", *Prajnayoti: Professor Gopikamohan Bhattacharya Commemoration Volume* ed. Debabrata Sen Sharma & Manabendu Banerjee (Kurukshetra Book Agency, 1990, pp. 315-332)
২৩· 'প্রেমবিলাস', পৃ. ২১৮-২২৩, ২২৯, ২৩৪
২৪· তদেব, পৃ. ২২৩
২৫· তদেব, পৃ. ২৬৭-৬৮
২৫ক· দ্রষ্টব্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্', (বৃন্দাবন, ১৯১৩) চতুর্দশ অধ্যায়, শ্লোক, ৩৫-৩৬
২৬· 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার', পূর্বোক্ত, "শ্রীশ্রী প্রার্থনা", পদ-২৬, পৃ. ১৭৫-৭৬
২৭· 'বৈষ্ণব পদাবলী' পৃ. ৩৫২ ; প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য : কুঞ্জবিহারী দাস সঙ্কলিত, 'মঞ্জরী স্বরূপনিরূপণ' (২য় সং, বৃন্দাবন, অনন্ত দাস, চৈতন্যাব্দ ৪৮৯-৯০)
২৮· 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার', পৃ. ৩১৬
২৯· 'প্রেমবিলাস', পৃ. ২৫৪-২৫৫
৩০· সিদ্ধ কৃষ্ণদাস, 'সাধনামৃতচন্দ্রিকা', পণ্ডিত বৃন্দাবন দাস সম্পাদিত (বৃন্দাবন, প্রথম সং, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) ; VIB, "The Ritualistic and Ceremonial Synthesis", pp. 305-319
৩১· 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী", 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ৩২৫-৩৬৮

নবম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ও প্রসারণের ইতিহাস রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য। গ্রন্থগৌরবভয়ে এখানে সমস্ত জেলার বিবরণ দেওয়া সম্ভর হবে না। এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ আছে। তাতে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বাবলির সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমি কিছুটা স্পষ্ট হবে।

প্রথমেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ধমান জেলার কথা আলোচ্য।[১] বর্ধমানের মল্লসারুল গ্রামে একটি প্রাচীন লেখ পাওয়া গেছে। তার তারিখ ৫০০ খ্রিস্টাব্দ। এই তাম্রলেখে চক্রধারী বিষ্ণুর মূর্তি দেখা যায়। কয়েকটি বৈষ্ণব ব্যক্তি-নামও দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বর্ধমানেও বৈষ্ণব অবতার-পূজন প্রচলিত ছিল। 'বর্ধমান' নামক নগরের প্রাচীনতা সুপ্রমাণিত ; তার জৈন অনুষঙ্গ সন্দেহাতীত। প্রাচীনকাল থেকে বর্ধমানে বিভিন্ন জাতির মানুষজন বাস করেন। এ জেলায় শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। H. H. Risley তাঁর *The Tribes And Castes of Bengal*-গ্রন্থের দুই খণ্ডে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, বর্ধমানের গ্রামীণ অর্থনীতি গোয়ালা কৈবর্ত কামার কুমার তেলি আগুরি এবং সদ্‌গোপদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।[২] বঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগপথে অবস্থিত বর্ধমান নগর একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে এখনও প্রসিদ্ধ। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সেখানে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ছিল।

বর্ধমানের কুলীনগ্রামে ও শ্রীখণ্ডে চৈতন্যের আবির্ভারের পূর্বেও অনেক বৈষ্ণব বাস করতেন।[৩] কুলীন গ্রামের মালাধর বসু বঙ্গের সুলতান বারবক্ শাহ্-দ্বারা 'গুণরাজ খান' উপাধি-ভূষিত হয়েছিলেন। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ভাগবতপুরাণ'-এর কাহিনী অবলম্বন করে মালাধর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছিলেন।[৩ক] এই রচনাটি ছিল গেয়-কাব্য। বহু বাগরাগিণী এতে উল্লিখিত হয়েছে। এই কাব্যে রাসলীলার বর্ণনা প্রাঞ্জল ; কিন্তু কৃষ্ণের বীরত্বও বর্ণিত হয়েছে।

অদ্যাবধি কুলীনগ্রামে ব্রাহ্মণদের ও উচ্চ শূদ্র ভূম্যধিকারীদের প্রাধান্য দেখা

যায়। বৈষ্ণব ধর্ম এখানে জনপ্রিয়। চৈতন্যের কালে বলা হয়েছিল :

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥[৪]

মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যের পরিকর ছিলেন। এমনও ভাবা যায় যে, সুলতানদের দরবারে উচ্চপদস্থ, ধনী বসু-পরিবারের প্রভাবে কুলীনগ্রামের নিম্নজাতির অধিবাসী বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন। এখানকার বৈষ্ণবদের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথ-উপাসনার সংযোগ ছিল।

এই গ্রামে গোপেশ্বর শিবেরও পূজা করা হয়। হুগলি জেলার যে সব অঞ্চলে শৈব উপাসনা প্রচলিত আছে, পূর্ব-বর্ধমান তাদের সঙ্গে ভৌগোলিক ভারে সংশ্লিষ্ট। পূর্ব-বর্ধমানের বহু গ্রামে শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, এবং বৈষ্ণব ধর্ম মিলে মিশে আছে। তার প্রমাণ কুলীনগ্রামের ধর্মীয় সংস্কৃতি। সম্ভবত চৈতন্যের আবির্ভাবকালে গ্রামস্তরে লোকস্তরে এইরূপ সুসমন্বিত ধর্মীয় সংস্কৃতি ছিল ; তাই বৃন্দাবনদাস অন্য ধর্মের প্রতি বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়াতে ইসলাম ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবকে কিছুটা দুর্বল করার জন্যই কি 'যবন' হরিদাসকে কুলীনগ্রামে নিয়ে আসা হয় ? এখানে "হরিদাস-চৈতন্য মঠ"-এ চৈতন্যের মূর্তি পূজা করা হয়। কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়াদের একটি দলও সুপরিচিত ছিল।

কুলীন গ্রামের কাছে নবগ্রামে অদ্বৈত আচার্যের পুত্র শ্যামাদাস আচার্য একটি প্রভাবশালী 'শ্রীপাট' গড়ে তোলেন।[৫] তাঁর চেষ্টায় ভৈটে, পালসিট, বিজুর ও মাতসর গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এ সব গ্রামের কৃষক কামার কুমার জেলে প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদকগণ বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দের তিনজন 'গোপাল' বর্ধমান জেলায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁরা হলেন অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত, আকাইহাটের কালাকৃষ্ণ দাস, এবং শীতলগ্রামের ধনঞ্জয় পণ্ডিত।[৬] কাটোয়াতে নিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রভাবশালী বৈষ্ণব গদাধর দাসের শ্রীপাট ছিল। সম্ভবত নিজের "গোপীভার" ছিল বলেই গদাধর দাস "গোপাল" হননি। "চণ্ডীমঙ্গল"-এ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ লিখেছেন যে, "বৈশ্য"রা বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন।[৭] নিত্যানন্দ নিজেই সপ্ত গ্রামের বণিকদের "উদ্ধার" করেছিলেন। অনুমান, বৈশ্য-বণিকদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য "গোপাল"গণও সক্রিয় ছিলেন। জাহুবাদেবী কয়েক শত কৃষক-প্রজা সহ বর্ধমানের ভূম্যধিকারী চন্দ্র মণ্ডলকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৮] কালনাতে গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বেশ বড় ছিল। সেখানে ছিল ধানচালের ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রেভারেন্ড জেমস লং কালনায় "দশ হাজার দোকান"-এর উল্লেখ করেছেন।[৯] গৌরীদাস ছিলেন নিত্যানন্দের খুড়া-শ্বশুর ; তিনি যে কালনার বণিকদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, তা বলা বোধ হয় বাহুল্যমাত্র। গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল ; গদাধর পণ্ডিতের আত্মীয় হৃদয়চৈতন্যের গুরু ছিলেন তিনি। গৌরীদাস গৃহস্থ ছিলেন ; বৃন্দাবনে তাঁর তিরোধান হয়।

কালাকৃষ্ণ দাস চৈতন্যের সঙ্গীরূপে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বামাচারী তান্ত্রিকদের খপ্পরে পড়েন ; এই তান্ত্রিকদের "ভট্টমারী" রূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন।

স্ত্রীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল ॥[১০]

তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে চৈতন্যকে ভীষণ বিপদে পড়তে হয়। পুরীতে ফিরে এসে চৈতন্য কালা কৃষ্ণদাসকে বহিষ্কার করতে চাইলেন। নিত্যানন্দের হস্তক্ষেপে কালা কৃষ্ণদাস বেঁচে গেলেন। তিনি বর্ধমানের গণ্ডগ্রাম আকাইহাটে এসে 'গোপাল' হলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণব ঐতিহাসিক অমূল্যধন রায়ভট্ট আকাইহাটে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কালাকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাটের চিহ্নও নেই। আছে জঙ্গল। হরেরাম বাবাজী নামক দীনদরিদ্র ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব কুঁড়েঘর বানিয়ে সেখানে তখনও থাকতেন।[১১] কালাকৃষ্ণ দাস আকাইহাট থেকে পাবনা জেলায় সোনাতলা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিবাহ করেন। পরে তিনি বৃন্দাবনেও গিয়েছিলেন।

শীতলাগ্রামে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং ধনশালী ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট দানধ্যানের জন্য বিখ্যাত ছিল। শীতলাগ্রাম খুব প্রাচীন গ্রাম ; প্রাচীন কালে গ্রামটির নাম ছিল সিদ্ধল গ্রাম। এই গ্রামেই থাকতেন রাজা হরিবর্মদেবের (একাদশ-দ্বাদশ শতক) মহামন্ত্রী শাস্ত্রবিদ এবং বীর ব্রাহ্মণ ভট্ট ভবদেব।[১২] ধনীগৃহের সন্তান ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, এবং নিত্যানন্দের পরিকর হয়েছিলেন। ধনঞ্জয়-'গোপাল' দান করে প্রসিদ্ধ হন। তিনিও বিবাহিত ছিলেন। শীতলাগ্রাম অঞ্চলে বহু 'পাষণ্ড' এবং ডাকাতকে তিনি উদ্ধার করেন। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের স্তবমূলক 'অষ্টক' অমূল্যধন রায়ভট্ট খুঁজে বের করেন। তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন :[১৩]

সেবাধর্মস্থাপনাদি গৌড়দেশে বিস্তারি
দিব্যজ্ঞান প্রেমদান সর্বজীর নিস্তারি
দর্শনে স্পর্শনে নিজভাব মার্জিতং
ধনঞ্জয়-পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥

তিনজন 'গোপাল'-কে, এবং দাস গদাধরকে বর্ধমান জেলায় সক্রিয় করে রেখে নিত্যানন্দ কি শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগরবাদী'-দের একটি প্রবল প্রতিপক্ষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন ? নিত্যানন্দের সঙ্গে নরহরি সরকারের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। নরহরি সরকারের এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের বহু সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৪] তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন কোগ্রামের অধিবাসী কবি লোচনদাস, কবি কবিশেখর, 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল'-নামক নিবন্ধ রচয়িতা লোকানন্দ আচার্য, মহাকবি গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন এবং ধনী ভূস্বামী চক্রপাণি চৌধুরী। চক্রপাণি সম্ভবত দুই হাজার কৃষককে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন ; এ সব শাখার পরিচালকগণ

ছিলেন নরহরি সরকারের ভাই মুকুন্দ সরকার, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, সুলোচন সেন এবং চিরঞ্জীব সেন। "গৌরনাগরবাদী" নরহরি সরকার চৈতন্যের অবদান সম্বন্ধে লিখেছিলেন :[১৫]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতোঽত্যন্ত
দুর্দান্তবলবন্তন্তং মহাবৃষভদুর্দুরূঢ়মধ্যাত্মবাদিনং বিষয়ান্ধং
কুযোগিনং জড়মজস্রং মদ্যপং পাপং চণ্ডালং যবনং মূর্খং
কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেমসিন্ধৌ পাতয়ামাস। ...কেবলং প্রেমাধারৈব
সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্ আসুরীভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্ ॥
(কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৌপীনধারী, দীনবেশ। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমকে অলঙ্কৃত করেছেন। অত্যন্ত দুর্দান্ত, শক্তিশালী, প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মতো দুর্দমনীয়, অসংখ্য অধ্যাত্মবাদীকে, বিষয়ান্ধকে, কুযোগীকে, অজস্র জড়বাদীকে, মাতালকে, পাপীকে, মূর্খকে, চণ্ডাল ও যবনকে, কুলস্ত্রীদের প্রেমসাগরে এনে ফেলেছেন...কেবল প্রেমধারা ঢেলে তিনি সকলের হৃদয় শুদ্ধ করেছেন, আসুরভাবকে চূর্ণ করেছেন)

লক্ষণীয়, এই মূল্যায়নে গৌরনাগরবাদের নামগন্ধও নেই।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা হল এই যে, চৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর বিশেষ কোনও প্রভাব কাটোয়া মহকুমায় ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে সংসারাশ্রমে কেশব ভারতীর নাম ছিল কালীনাথ আচার্য। তিনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।[১৫ক] দেনুড় গ্রামে কেশব ভারতীর আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এক সময়ে কোনও কোনও বৈষ্ণব নিজেদের কেশব ভারতীর 'গণ' রূপে পরিচয় দিতেন।[১৬] শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবদের প্রভাবে তাঁরা একটি বিশেষ গোষ্ঠী রূপে সংগঠিত হতে পেরেছিলেন কি না, সন্দেহ।

কিন্তু বর্ধমানেই 'গৌরনাগরবাদ' সমালোচিত হয়। দেনুড়-নিবাসী বৃন্দাবন দাস তার সমালোচনা করেন। ঝামটপুরের কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ করেননি। নিত্যানন্দ সম্বন্ধেও বিরূপ মনোভাব ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাই শ্যামাদাস নিত্যানন্দের পরিকর মীনকেতন রামদাসের সঙ্গে কলহ করেন।[১৭] কাটোয়ার কাছে সুপ্রাচীন গ্রাম খোটেতে দাস্যভাবের উপাসক রামকানু গোস্বামী বাস করতেন। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গ্রাম ছেড়ে রামকানু কালনার কাছে গোপালদাসপুর গ্রামে চলে যান। সেখানে তাঁর শিষ্য, মুর্শিদাবাদের এক দেওয়ান, তাঁকে সাত শত বিঘা জমি দিয়েছিলেন। রামকানু-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে "রাধাকান্ত"-কৃষ্ণ মূর্তি থাকলেও রাধার কোনও মূর্তি নেই।[১৮] শ্রীখণ্ডের কাছে কাননডাঙ্গা গ্রামে কিন্তু নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদের বাসস্থান রয়েছে। সেখানে বলরাম জীউ পূজিত হন।[১৯]

বর্ধমান জেলার আমাইপুরা নামক গ্রামের অধিবাসী জয়ানন্দ যে ভাবে চৈতন্যের জীবনী রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে বর্ধমানেরই অপর তিনজন (বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও লোচনদাস) লেখকের দ্বারা রচিত চৈতন্য-জীবনীর বিশেষ কোনও ভাবগত সাদৃশ্য ছিল না।[২০] গোবিন্দদাস কর্মকার নামক লেখকের নামে

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক চৈতন্যজীবনী ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গোবিন্দদাসও এক সময়ে বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের কাল থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের কাল পর্যন্ত চৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু 'কড়চা'কে প্রামাণিক বলে ধরা হয় না। [২১]

জয়ানন্দের রচনায় এমন কিছু ঘটনার বিবরণ আছে, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মেনে নিতে পারেননি। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার যাজপুরে থাকতেন। "ভ্রমর"-নামক রাজার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা সেখান থেকে সুদূর শ্রীহট্টে পালিয়ে যান। অর্থাৎ চৈতন্য আদৌ বাঙালি ছিলেন না, ছিলেন উড়িয়া। [২২] জয়ানন্দ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, রথযাত্রার উৎসবকালে ভাবোন্মত্ত চৈতন্য নাচতে নাচতে বাঁ পায়ে ইটের আঘাত পেয়েছিলেন। সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল :

আয়াঢ় বঞ্চিতা [পঞ্চমী ?] রথ বিজয় নাচিতে
ইটাল বাজিল রাম পায়ে আচম্বিতে ॥ ...
চরণে বেদনা বড় ষষ্টি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে ॥ ...
মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥ [২৩]

জয়ানন্দ-প্রদত্ত কাটোয়ার বিবরণ খুব সুন্দর। সেখানে শত শত দ্বিজ থাকেন। সেখানে নদী সপ্তধারা। আছে বহু কূপ ও দীঘি, আম্ কাঁঠালের বাগান, ফুলের বাগান। বাড়ির দুয়ারে "তোরণ কলস", বিচিত্র ধ্বজ পতাকা। আছে বিশাল ফুলের বাজার : "কাটোয়া নগরী, যেন সুরপুরী, সর্ব্বসুখ প্রমোদে।" [২৪]

হরিদাস দাস তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ধমান জেলায় ৭৬টি বৈষ্ণব শ্রীপাটের বিবরণ দিয়েছেন। এ সকল শ্রীপাট ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কালে গড়ে ওঠে। শ্রীপাট-সমূহের মধ্যে বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণবদের শ্রীপাট এখনও বেশ বড়। [২৪ক] খ্যাতনামা পদাবলি-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বর্ধমানের অধিবাসী। তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, কবিশেখর, চন্দ্রশেখর [চট্টোপাধ্যায়], শশিশেখর [চট্টোপাধ্যায়], ঘনশ্যাম, কবিচন্দ্র, গোবিন্দ ঘোষ, কবিরঞ্জন, নয়নানন্দ কবিরাজ, 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস, জগদানন্দ, পীতাম্বর দাস, রঘুনন্দন গোস্বামী, রামগোপাল দাস, 'কর্ণানন্দ'-রচয়িতা যদুনন্দন, এবং 'পদকল্পতরু'-সঙ্কলক গোকুলানন্দ সেন উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডে ও কাঁদরা গ্রামে 'মনোহরশাহী' কীর্তনের বিকাশ হয়েছিল। ডেভিড় ম্যাক্‌কাচন্ বর্ধমান জেলার ৫৬টি বৈষ্ণব মন্দিরের একটি বিবরণাত্মক তালিকা দিয়েছেন। [২৫]

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে, অথবা তার কাছাকাছি সময়ে উখ্‌রা শহরে নিম্বার্ক-মতাবলম্বী বৈষ্ণবরা একটি গাদি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দয়ারাম দের। এই গাদি এখনও রয়েছে। [২৬] অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দরিদ্র বাবাজী গোপাল দাস কেতুগ্রামের কাছে দধিয়া [অথবা দৈধে] বৈরাগীতলায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন। সনাতন আউলিয়া তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ গোপালদাসকে ৬৯ বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সেখানে মন্দির নির্মিত হয়, এবং তাতে রঘুনাথ জীউ প্রতিষ্ঠিত হন। এখনও দৈধে-বৈরাগীতলায় একটি বড় মেলা তিন দিন ধরে বসে। গোপালদাস বাবাজী স্থানীয় ডাকাতদের শিষ্য করেন। তিনি সম্ভবত রামায়েত বৈষ্ণব ছিলেন। [২৭]

২

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে হুগলি জেলার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সপ্তগ্রাম, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, পাণ্ডুয়া, দশঘরা, বৈঁচি প্রভৃতি বন্দর নগর জনপদ ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। সপ্তগ্রাম ছিল বড় বন্দর ও শাসনকেন্দ্র ; গঙ্গার প্রবাহে পরিবর্তন ঘটায় সপ্তগ্রাম বন্দরের অবসান হয়। ১৭৮৮-তে মেজর রেনেল্ এখানে অখ্যাত এক গ্রামের অস্তিত্ব দেখতে পান। [২৮]

সপ্তগ্রাম বন্দরের কর-সংগ্রাহক 'মজুমদার' হিরণ্য, গোবর্ধন, গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এবং সুবর্ণবর্ণিক উদ্ধারণ দত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। হিরণ্যের ও গোবর্ধনের গুরু ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন মিশ্র। তাঁদের সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যেরও সম্পর্ক ছিল। বন্দর সপ্তগ্রামে জাতবিচার বোধহয় প্রবল ছিল না।

রঘুনাথ দাস সন্ন্যাস অবলম্বনের পূর্বেই নিত্যানন্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পূর্বে এ তথ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, নিত্যানন্দের 'চিড়া মহোৎসব' রঘুনাথের অর্থে নিষ্পন্ন হয়। সম্ভবত বৈষয়িক বিসম্বাদ অসহ্য হয়ে ওঠায় রঘুনাথ শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করেন। সপ্তগ্রামের কাছে কৃষ্ণপুর গ্রামে মাঘ মাসে রঘুনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কথিত আছে যে, চৈতন্য বৈদ্যবাটিতে এসেছিলেন, এবং 'নিমাইতীর্থ' ঘাটে গঙ্গায় স্নান করেছিলেন। এমনও জনশ্রুতি আছে যে, তিনি শ্রীরামপুরের কাছে চাতরাতে এবং শিয়াখালাতেও এসেছিলেন। সম্ভবত গুপ্তিপাড়াতেও তিনি এসেছিলেন ; গুপ্তিপাড়া বৈষ্ণব ধর্মের একটি কেন্দ্র।

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের বণিকদের "উদ্ধার" করেন। তারপর থেকে হুগলি জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ফলপ্রসূ হতে থাকে। দ্বাদশ গোপালের মধ্যে চারজন গোপাল হুগলি জেলায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। তাঁরা হলেন খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অভিরাম-রামদাস, সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত, মাহেশের কমলাকর পিপ্পলাই, এবং আটপুরের মহেশ্বর দাস। বল্লভপুর এবং গৌরাঙ্গপুর গ্রামে থাকতেন 'উপগোপাল' কাশীশ্বর এবং গোপাল ঠাকুর। [২৯]

অত্যন্ত বলশালী ব্রাহ্মণ অভিরাম-রামদাস 'গোপাল'দের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। সম্ভবত বয়সে চৈতন্যের চেয়ে একটু বড় ছিলেন তিনি। নিম্নস্থান, এবং প্রায়শ প্লাবিত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে তিনি কৃষক, গোয়ালা এবং জেলেদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর "লীলা"-বর্ণনামূলক 'অভিরামলীলামৃত' প্রামাণিক

গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হয় না ; তাতে রামদাস সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে।[৩০] তিনি কোনও ব্যক্তিকে তিনবার চাবুক মারলেই সে বৈষ্ণব হয়ে যেত। এটা ছিল জনপ্রিয় কাহিনী। শ্রীনিবাস আচার্যের মতো বিখ্যাত বৈষ্ণবকেও তিনি নাকি "আড়াইবার" চাবুক মারেন, এবং শ্রীনিবাস তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। খানাকুলে ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভাবশালী ছিল। অভিরাম এই সমাজের নির্দেশ মেনে চলতেন কি না, সন্দেহ। কথিত আছে তিনি এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করেন।[৩১]

মাহেশের ব্রাহ্মণ কমলাকর মহাভক্ত হলেও ভক্তিতে অশ্রুবিসর্জন করতে পারতেন না। দু'চোখে জল আনার জন্য তিনি নাকি শেষ পর্যন্ত পিপ্পলীচূর্ণ দু'চোখে লাগিয়ে অশ্রুবর্ষণ করতেন ; তাই তাঁর উপাধি হয় "পিপ্পলাই" অথবা "পিপলাই"।[৩২] একটি ঐতিহ্য অনুসারে মন্দিরের মূর্তির সেবাধিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে বল্লভপুরের বৈষ্ণব রুদ্র পণ্ডিতের, এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের ঝগড়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রুদ্র পণ্ডিত ঝগড়া মিটিয়ে নেন। ঢাকার "নবাব" ওয়ালিস্ খাঁ ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মাহেশের শ্রীপাটকে ১১৬৫ বিঘা জমি দিয়েছিলেন। সেখানকার বিখ্যাত রথ কলকাতার বাগবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর অর্থে উনিশ শতকের শুরুতে নির্মিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মাহেশের শ্রীপাটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কলকাতার সুবর্ণবণিক ধনী নয়নচাঁদ মল্লিক।[৩৩]

সম্ভবত ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামের বণিক উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাট এখনও কোনও রকমে টিকে আছে। শূদ্র হলেও তাঁর হাতের রান্না নিত্যানন্দ খেতেন। জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে উদ্ধারণ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ ক্ষুধার্তদের অন্নদানের জন্য ভাল ব্যবস্থা করেন।[৩৪] হুগলির চতুর্থ গোপাল তরা-অটিপুরের পরমেশ্বর দাস জাহ্নবাদেবীর অনুগত ছিলেন। বীরভদ্রের সঙ্গেও তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তিনি ছিলেন চিরকুমার। শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

অন্যান্য আরও অনেক বৈষ্ণব হুগলি জেলায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন জাঙ্গিপাড়া থানায় গোস্বামী-মালিপাড়ার ধনী ও বিদগ্ধ বৈষ্ণব 'খঞ্জ' ভগবান আচার্য,[৩৫] খানাকুলের কৃষ্ণদাস ঠাকুর (অভিরাম—রামদাসের শিষ্য), শিয়াখালার বাসু খাঁ, মাহেশের গোপাল বসু, এবং গুপ্তিপাড়ার সত্যানন্দ সরস্বতী। 'খঞ্জ' ভগবান আচার্যের সঙ্গে চৈতন্যের ও স্বরূপ দামোদরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

হুগলি জেলায় বেশ কিছু বৈষ্ণব পরিবার এবং বৈষ্ণব "বাবাজী" নিজ নিজ এলাকায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন।[৩৬] মগরার কাছে পোলাবা গ্রামে পাল ও নিয়োগী-পরিবারদ্বয় বৈষ্ণব উৎসব জনপ্রিয় করেছিলেন। দশঘরা ও ধনেখালিতে বিশ্বাস ও রায়-পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন। দশঘরার রাধামাধব ঘোষ সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব কাব্য, 'বৃহৎ সারাবলী' রচনা করে বিখ্যাত হন।[৩৭] গুড়াপ, বেলমুড়ি ও রুদ্রাণী গ্রামের ধনী কায়স্থগণ বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

ধনেখালিতে কালনার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজী একটি মন্দির বানিয়ে তাতে গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধু সচ্চিদানন্দ ভারতী চম্পাহাটিতে একটি বৈষ্ণব আশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীপুর গ্রামে ধনী এবং বৈষ্ণব মুস্তাফি পরিবার বৈষ্ণবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বলাগড়ের বৈষ্ণব শ্রীপাট নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধরগণ স্থাপন করেন।[৩৮]

হুগলি জেলায় বৈষ্ণবদের দ্বারা গ্রাম পত্তনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। পোলবা গ্রাম পত্তন করেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী পাল, নিয়োগী এবং রায় পরিবারত্রয়। গোস্বামী-মালিপাড়ার হরেকৃষ্ণ গোস্বামী হরিট্ গ্রাম গড়েন। সম্রাট আকবরের সময়ে সত্যানন্দ সরস্বতী গুপ্তিপাড়াকে গড়ে তোলেন,—এইরূপ জনশ্রুতি রয়েছে। মিত্র-মুস্তাফিরা শায়েস্তা খানের সময়ে বড় আমলা ছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁরাই ছিলেন শ্রীপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণব আনন্দরাম মুস্তাফি বর্ধমানের রাজার জমি কিনে সুখাড়িয়া গ্রাম পত্তন করেন। শেওড়াফুলিতে এক সময়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। এই সম্প্রদায়ের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মনোহরচন্দ্র রায়। হুগলি জেলায় গ্রামীণ শিষ্টবর্গে ধনী শূদ্রদেরই প্রাধান্য, এবং সংখ্যাধিক্য ছিল। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন। ব্রাহ্মণরা শৈব-শাক্তধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরা চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণশীল ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য ও সতীদাহ প্রথা সেখানে ব্যাহত হয়নি।[৩৯]

৩

নিত্যানন্দের পরে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা-বাহাদুরপুরের শ্যামানন্দ গোস্বামী এবং তাঁর শিষ্য রয়ণীর রাজপুত্র রসিকানন্দ।[৪০] স্থানীয় ভূস্বামীদের দ্বারা সমর্থিত হলেও এই দুই বৈষ্ণব গুরু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। 'রসিকমঙ্গল'-অনুসারে শ্যামানন্দ ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হন। তাঁর আবির্ভাবকাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ছিল। সম্ভবত শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের থেকে বয়সে একটু ছোট ছিলেন। তাঁর পিতামাতার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ও দুরিকা। বৃন্দাবন থেকে দেশে ফিরে এসে শ্যামানন্দ তিন বার বিবাহ করেন। তাঁর প্রয়াণের পরে তাঁর তিন বিধবা স্ত্রী গাদির দখল নিয়ে ঝগড়া করতেন।

কালনাতে গঙ্গাস্নান করতে এসে শ্যামানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য এবং নাতজামাই হৃদয়চৈতন্য দ্বারা দীক্ষিত হন। দীক্ষার পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'দুখিয়া'। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হল শ্যামানন্দ। পরে তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল হৃদয়চৈতন্য-প্রদত্ত একটি পরিচয়জ্ঞাপক পত্র। বৃন্দাবনে এসে তিনি জীব গোস্বামীর শিষ্য হলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কাছ থেকে তিনি ষড়ক্ষর রাধামন্ত্র পেলেন। বঙ্গে এই রটনা হল যে, প্রথা ভঙ্গ করে হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দকে

নূতন মন্ত্র দিয়ে জীব গোস্বামী নিজের শিষ্য করেছেন। হৃদয়চৈতন্য কালনার 'গোপাল' গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য এবং নিত্যানন্দপন্থী ছিলেন। তাঁর এই অবমাননা নিত্যানন্দের অন্যান্য অনুগামিগণ সহ্য করেননি। 'অভিরামলীলামৃত' অনুসারে হৃদয়চৈতন্য এবং চৌষট্টি জন বঙ্গীয় মহান্ত শ্যামানন্দের সমালোচনা করেন। জীব গোস্বামীও কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করেন।

শ্যামানন্দ নিতান্ত সাধারণ হলে হয়তো এ সবের কিছুই হত না। সদগোপ-জাতীয় হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল। বৃন্দাবনে তিনি "অধ্যাপক" উপাধি লাভ করেন। কথিত ছিল যে, তিনি রাধার পায়ের নূপুর খুঁজে পেয়েছিলেন। শ্যামানন্দের অনুগামীরা নূপুর-তিলক ধারণ করেন। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দত্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, লোকনাথ গোস্বামীর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় হয়। বৃন্দাবন থেকে আনা পুথিগুলো গোপালপুর গ্রামে লুট হয়ে যাওয়ার পরে শ্যামানন্দ খেতুরিতে, নবদ্বীপে, শান্তিপুরে এবং কালনাতে গিয়েছিলেন। তিনি আরও একবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে জীব গোস্বামীর 'গোপাল চম্পূ' পড়েছিলেন। অন্তত শ্যামানন্দের বিবরণ থেকে এই জানা গেল যে সদগোপ-গৃহস্থ হলেও বৈষ্ণব ধর্মের বাতাবরণে তিনি নিজেকে সুশিক্ষিত এবং সমাজে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তিনি অমরত্ব অর্জন করলেন।

ধারেন্দার কাছে নৃসিংহপুর গ্রামে শ্যামানন্দ স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন রোহিণী অথবা রয়ণীর রাজা অচ্যুতের পুত্র রসিকানন্দ। সুবর্ণরেখা ও দোলং নদীর সঙ্গমস্থলে রয়ণী। শ্যামানন্দের উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন পাঠান শাসক শের খাঁ এবং দামোদর যোগী। রসিকানন্দ ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬২ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান হয়। 'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে রসিকানন্দ রসিকমুরারি নামে উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাস'-এ রসিক ও মুরারি দুই ভাই। এমন হতে পারে যে, রসিকের সৎ ভাই ছিলেন মুরারি; 'রসিকমঙ্গল'-এ এ তথ্য আছে যে, রাজা অচ্যুতের "দুই চারি পত্নী তাঁর অনেক তনয়।" সম্ভবত রসিক অথবা রসিকানন্দ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠায় মুরারির নাম আর আলাদাভাবে প্রচারিত হয়নি।

শের খাঁ বৈষ্ণব হলেন; তাঁর সমর্থন পেয়ে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ বড়কোলা, আলমগঞ্জ, নৈহাটি, নৃসিংহপুর, গোপীবল্লভপুর, শ্যামসুন্দরপুর, গোবিন্দপুর এবং ধারেন্দা গ্রামে বড় বড় বৈষ্ণব মহোৎসব করেন। আলমগঞ্জের উৎসবকে সমর্থন করেছিলেন "হররোলা" রূপে পরিচিত স্থানীয় মুসলমান শাসক। গোপীবল্লভপুরে অনুষ্ঠিত মহারাসোৎসবে বহু বৈষ্ণব যোগদান করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যগণ, দ্বাদশ গোপালের শিষ্যগণ, হৃদয়চৈতন্য, বাঁকুড়ার সোনামুখীর আউল মনোহর দাস তাতে যোগদান করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, শ্যামানন্দ অদ্বৈতপন্থী ও নিত্যানন্দপন্থী বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। মেদিনীপুরে গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব উৎসবে শত শত লোককে দীক্ষা দেওয়া হয়।

এ সব উৎসবের জন্য অর্থের অভাব হয়নি। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামিগণ শ্যামানন্দের ও রসিকানন্দের সমর্থক ছিলেন। রয়ণীর রাজা অচ্যুত, ঘাটশীলার ভূস্বামী, গোবিন্দপুরের ভুইঞা ভীমধন, বাগড়ির ভূস্বামী রাজ্যধর রায়, নৃসিংহপুরের ভুইঞা উদ্দণ্ড রায় শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। রসিকানন্দের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন ময়ূরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, পাঁচেতের রাজা হরিনারায়ণ, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু, ধারেন্দার অত্যাচারী দুই ভুইঞা ভীম ও শ্রীকর, এবং উড়িষ্যার সুবাহ্‌দারের ভ্রাতুষ্পুত্র আহ্‌মদ বেগ। রসিকানন্দ বাংলার সুবাহ্‌দারকে বিশটি বন্য হাতি উপহার দিয়েছিলেন। কাঁথি এবং কেশিয়ারিতে গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন শ্যামানন্দের শিষ্য ভঞ্জন অধিকারী। কেওন্‌ঝার অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ছিলেন রসিকানন্দের শিষ্য গোকুল দাস। ভঞ্জভূমে সক্রিয় ছিলেন তাঁর অপর শিষ্য গোবিন্দদাস।

শ্রীনিবাস আচার্যের ও 'ঠাকুর মহাশয়' নরোত্তম দত্তের তত্ত্ববিদ ও তত্ত্বব্যাখ্যাতা রূপে প্রসিদ্ধি ছিল। শ্যামানন্দের ও রসিকানন্দের সেরূপ কোনও খ্যাতি ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক রূপে তাঁরা অতুলনীয় ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দশকেও মেদিনীপুরে এক লক্ষ "শ্যামানন্দী" বৈষ্ণব ছিলেন। মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের কায়স্থরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। শ্যামানন্দ ব্রাহ্মণ না হলেও উপবীত ধারণ করতেন: "জ্যোতির্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল"। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে, পরবর্তীকালে মেদিনীপুরে উৎকলে কোনও কোনও বৈষ্ণব গুরু *Jus Primae Noctis* অথবা "প্রথম রজনীর বিধি" অনুসারে সদ্যবিবাহিতা কন্যাদের কৌমার্য হরণের অধিকার পর্যন্ত লাভ করেন।[৪১] এই প্রথা "গুরুপ্রসাদী" রূপে কুখ্যাত হয়। বৈষ্ণবরা গুরু হয়ে "বৈষ্ণবোত্তর" ভূমি লাভ করেন; হান্টার সাহেবের বিবরণে ২৭২টি "বৈষ্ণবোত্তর" ভূমি উল্লিখিত হয়েছে।[৪২] "বৈষ্ণবোত্তর"-প্রথা অনুসারে বহু পতিত জমি কৃষিযোগ্য হয়। আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রসারিত হয়। রসিকানন্দ রচিত "শ্রীশ্রী শ্যামানন্দচরিতম্"-এ শ্যামানন্দকে আদিবাসীদের উদ্ধারকর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৩] বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে মেদিনীপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থান লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে চৈতন্যের নিত্যানন্দের দ্বাদশ গোপালের বন্দনা করেছেন।[৪৪] মেদিনীপুরের এক ফকির বলেছিলেন:[৪৫]

ফকির বলেন তেরা জাতি নাহি যাবে।
রাম রহিম এ সংসারে একই জানিবে ॥
ফকির বলেন তুমি মুদ দুটি চোখ।
রাধাকৃষ্ণ দুই রূপ দেখিবে প্রত্যক্ষ ॥

সূত্রের উল্লেখ

১. দ্রষ্টব্য : Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnavism In Burdwan", D.K. Bhattacharya, Devendra Handa ed. *Praciprabha: Perspectives In Indology: Essays In Honour of Professor B.N. Mukherjee* (New Delhi, Harman Publishing House, 1989), PP. 289-318

২. H.H. Risley, *The Tribes And Castes of Bengal*, 2 Vols. (Reprint. Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay, 1981)

৩. দ্রষ্টব্য : রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব' (বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২), পৃ. ৪১-৪৬, ১৬৫-১৭১

৩ক. মালাধর বসু, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪)

৪. চৈ. চ, পৃ. ১৩১

৫. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১৩৩৫

৬. এই 'গোপাল'দের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, অমূল্যধন রায়ভট্ট, 'দ্বাদশ গোপাল', পূর্বোক্ত।

৭. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, 'চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত (নূতন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৫) পৃ. ৭৮-৭৯

৮. রবীন্দ্রনাথ মাইতি, 'চৈতন্যপরিকর', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০

৯. Rev. James Long, "The Banks of the Bhagirathi", *Select Papers of James Long*, ed. Mahadevprasad Saha (Calcutta, Indian Studies Past and Present, 1968) PP. 75-76

১০. চৈ. চ. পৃ. ৩১৫ ; সুকুমার সেনের মতে 'ভট্টমারি' শব্দের অর্থ "খ্রীষ্টানদের (Maria Christian) ভট্ট (মানে, Bishop, আচার্য। এঁরা ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক, এঁদের উপাস্য ছিল শিশু যিশু ও মেরি মাতা" : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লি. ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৮) পৃ. ২৭৪। এ সিদ্ধান্ত শব্দতাত্ত্বিক।

১১. 'দ্বাদশ গোপাল', পৃ. ১৪৭-১৫৬

১২. Ramaranjan Mukherji, Sachindra Kumar Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions*, পূর্বোক্ত, PP. 350-361; শ্লোক—৩

১৩. 'দ্বাদশ গোপাল', পৃ. ৪৯-৫৩

১৪. VIB, Ch. XI, PP. 190-200

১৫. 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব', পৃ. ৪৭ ; সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, উপরে উক্ত, পৃ. ২৯১

১৫ক. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১১৯৪

১৬. দ্রষ্টব্য : জগন্নাথ মিত্র, 'রসকল্পদ্রুম', বানার্থর আচার্য-শর্মা সম্পাদিত (Bhuvaneswar, Orissa Sahitya Akademi, 1964-65), P. 503, Verse, 80:

আপুপোত্তমাখুভাঙ্গকুসুমা পান প্রমত্তাবিটাঃ
কণ্ঠে চিক্কণকাষ্ঠমাল বিলসৎ সৎপাদ মুদ্রাঙ্কিতাঃ।
কেচিৎ শ্যামগণাশ্চ কে সখিগণাঃ কেচিন্নিমায়ীগণাঃ
কেচিৎ কেশবভারতী পরিকরা নাত্রাবকাশঃ সতাম্ ॥

এই বিচিত্র শ্লোকে শ্যামানন্দী, সখি-পন্থী, নিমাইপন্থী, কেশবভারতী-পন্থী বৈষ্ণবরা 'আপু' [আলু ?]-পোস্ত, তামাক, ভাং আর 'কুসুম' অর্থাৎ ধুতুরা ফুলের রসের ভক্ত, চরিত্রহীন 'বিট' মাত্র ; তাঁদের গলায় চিকণ কাঠের মালা, কপালে তিলক।

১৭. চৈ.চ, পৃ. ৯০-৯১ : ভাই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের মন্তব্য : "চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস ॥"

১৮. অশোক মিত্র সম্পাদিত, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা', ৫ (Delhi, Manager of Publications, Government of India, 1982), পৃ. ৭০-৭১

১৯. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১৮৩৮

২০. Bimanbehari Majumdar, Suqkhamay Mukhopadhyay, ed. *Jayananda's Caitanya-Mangala* (Calcutta, the Asiatic Society, 1971), Introduction

২১. জয়গোপাল গোস্বামী, 'গোবিন্দদাসের কড়চা' (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬) ; মৃণালকান্তি ঘোষ, 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-১৫১

২২. 'চৈতন্যমঙ্গল', পৃ. ১৪৪ : "চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল জাজপুরে। শ্রীহট্ট দেশেরে পলাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে ॥"

২৩. তদেব, পৃ. ২৩৪

২৪. তদেব, পৃ. ১৩৫

২৪ক. দ্রষ্টব্য : VIB, Ch. XVI, PP. 257-274 বিজিতকুমার দত্ত-আলোচিত 'মুরলীবিলাস'-এর পুঁথি : 'আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক গ্রন্থ' (কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ১২০-১২৪ ; দ্রষ্টব্য : কাননবিহারী গোস্বামী, 'বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৯৯৩)

২৫. David J. Mccutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal* (Calcutta, The Asiatic Society, 1972); Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnavism In Burdwan", পূর্বোক্ত, PP. 309-312

২৬. 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা', ৫, পৃ. ২৪২-৪৮

২৭. তদেব, পৃ. ৪-৫

২৮. দ্রষ্টব্য : Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnavism In Hooghly District" 'হুগলি মহসিন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', পূর্বোক্ত, PP. 23-28; J. Rennell, *Memoir of a Map of Hindoostan* (London, Printed by Mular & Co. 2nd ed. 1792) P. 57

২৯. দ্রষ্টব্য, 'দ্বাদশ গোপাল'

৩০. 'অভিরামলীলামৃত' (কলিকাতা, বসু প্রেস, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

৩১. তদেব, পৃ. ১২ ; Amiya Kumar Bandyopadhyay, ed. *West Bengal District Gazetteers, Hooghly* (Calcutta 1972)-অনুসারে অভিরামের স্ত্রী ছিলেন মালাকার-জাতীয়া (P. 212); 'ভক্তিরত্নাকর' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯) মতে তিনি ব্রাহ্মণী ছিলেন।

৩২. চৈ. চ. পৃ. ১৩৬, টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩. Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnavism in Hooghly District", পূর্বোক্ত, p. 26

৩৪. তদেব, P. 26

৩৫. দ্রষ্টব্য : পঞ্চানন গোস্বামী সংকলিত, 'আচার্য্য ভগবান খঞ্জ/তদীয় বংশধর হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপাট গোস্বামী মালীপাড়ার কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গোস্বামী মহোদয়গণের বংশাবলী' (হুগলী, গোবিন্দলাল গোস্বামী-প্রকাশিত, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ)

৩৬. বিশদ আলোচনা : "Vaisnavism In Hooghly District: 1486-1900", পূর্বোক্ত।

৩৭. রাধামাধব ঘোষ-রচিত 'বৃহৎ সারাবলী'-র দুটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন ইন্ডিয়ান ভ্যারাইটী স্টোরস, ২১-এ গ্রে স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা ৭০০০০৫

৩৮. "Vaisnavism In Hooghly District", PP. 29-30

৩৯. তদেব।

৪০. দ্রষ্টব্য : গোপীজনবল্লভ দাস, 'রসিকমঙ্গল' (তমলুক সংস্করণ), পূর্বোক্ত ; VIB, PP. 224-256

৪১. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব' (কলিকাতা, ভারত সাহিত্য ভবন, ১৯৪৫), পৃ. ১১০ ; অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' (কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০৯-১১৫

৪২. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. 3 (Calcutta, 1876), P. 96

৪৩. রসিকানন্দ, 'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দচরিতম্', বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত টীকা সহ, হরিদাস দাস-সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৪)

৪৪. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'রাঙ্গেশ্বর রচনাবলী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৪) পৃ. ৩৫৮

৪৫. তদেব, পৃ. ৪৩

দশম অধ্যায়

পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ

চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের হৃদয়ভূমি ছিল পশ্চিমবঙ্গ। মহান্তগণ এবং গোপালগণ বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গেই সক্রিয় ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা সহজ ছিল না। পূর্ববঙ্গের পরিবেশ ছিল অপরিচিত, পথঘাট ছিল দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল।

চৈতন্য নিজে কিন্তু পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন। তিনি শ্রীহট্টে অবস্থিত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে পিতৃপুরুষের ভিটাতেও গিয়েছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও তিনি শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'বাঙ্গাল' কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগত না। "বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া", লিখেছেন বৃন্দারনদাস। চৈতন্যের বাঙ্গাল-বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। মারামারি থামাবার জন্য শান্তিরক্ষকদের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয়।[১]

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥...
মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥
কেহবা ধরিয়া কোঁচা শিকদার স্থানে।
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ॥

'ঘটি-বাঙ্গাল' দ্বন্দ্ব তা হলে চৈতন্যের কালেও হত।

ঐতিহ্য অনুসারে শ্রীহট্টে অবস্থিত লাউড় নামক স্থানের রাজা দিব্যসিংহকে অদ্বৈত আচার্য দীক্ষা দিয়েছিলেন।[২] দিব্যসিংহ 'রাল্যলীলাসূত্র' নামে অদ্বৈত আচার্যের জীবনী রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে শ্রীহট্টে চারটি বৈষ্ণব পরিবার প্রভাবশালী ছিল। এদের নাম, ঠাকুর বাণী, ঠাকুর জীবন, বৈষ্ণব রায় এবং বঞ্চিত ঘোষ। বঞ্চিত ঘোষের আসল নাম ছিল গঙ্গারাম ঘোষ। তাঁর শিষ্য রাধারমণ ঘোষ 'বঞ্চিত চরিত্র' নামে গুরুর জীবনী রচনা করেন। শ্রীহট্টের দুই বৈষ্ণব মাধবদাস ও রামদাস সুসং-দুর্গাপুরের উপজাতীয় হাজোংদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। হাজোংদের নেতা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী পাথুরা হাজোং পুরীতে গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে দীক্ষা দেন ; তিনি জগন্নাথ দাস নামে সুপরিচিত

ছিলেন। সন্ন্যাস অবলম্বন করে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। হাজোং বৈষ্ণবরা নিত্যানন্দ-শাখার বৈষ্ণব রূপে পরিচিত।[৩]

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ত্রিপুরাতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়।[৪] ত্রিপুরার রাজা রাজধর মাণিক্য (১৬১১-১৬২৩) বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্য (১৬৫৮-১৬৬০) বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষে রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশনার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর সচিব রাধারমণ ঘোষ বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের জন্য "রাধারমণ মুদ্রাযন্ত্র" স্থাপন করেন বহরমপুরে। বীরচন্দ্রমাণিক্য নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। ত্রিপুরার বৈষ্ণব পুরোহিতগণ নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব রূপে পরিচিত।

চৈতন্যের অনেক পরিকর চট্টগ্রাম থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম জেলায় বহু বৈষ্ণব পুথি খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেক পুথির বিষয় রাধাবিরহ এবং বারমাস্যা। এ সব পুথির অধিকাংশের রচনাকাল অষ্টাদশ শতক। চট্টগ্রামের 'হিন্দু'-কবিদের দ্বারা রচিত বৈষ্ণব পদাবলীও সংকলিত হয়েছে।[৫] শ্রীহট্টে, ময়মনসিংহে, ত্রিপুরায়, চট্টগ্রামে যে রাধাকৃষ্ণ লোকস্তরে জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রসঙ্গত কবি ভবানন্দ-রচিত 'হরিবংশ' উল্লেখ্য।[৬] এই কাব্যের পুথি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পশ্চিম ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও পাবনা জেলায় পাওয়া গিয়েছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। এতে ১২৫টি লোকগীতি আছে। ময়মনসিংহ ত্রিপুরা শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে এ সব গানে ব্রজবুলির মিশ্রণও দেখা যায়। রাধা এবং অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে স্তন্যপায়ী নাবালক কৃষ্ণের যৌনমিলনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ভবানন্দ।

ময়মনসিংহ জেলা ছিল সংযুক্ত বঙ্গের বৃহত্তম জেলা। কিন্তু সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের শেষেও এ জেলার কোনও কোনও জায়গায় তান্ত্রিক বামাচার প্রচলিত ছিল। ভদ্রলোকদের পারিবারিক ধর্ম ছিল পঞ্চ 'ম'-কারাত্মক বামাচার। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মচরিত'-এ তা আমাদের জানিয়েছেন।[৭] ১৭৭০-এ, অথবা তার কাছাকাছি সময়ে ধনী বণিক নন্দকিশোর প্রামাণিক কিশোরগঞ্জে একটি একুশরত্ন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। খালিয়াজুরি পরগণায় মৃগা নামক গ্রামে পুরীর কয়েকজন বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীপাট স্থাপন করেন ; তা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। স্বরূপ দামোদর—পুরীতে চৈতন্যের ব্যক্তিগত সচিব—সম্ভবত ময়মনসিংহ জেলার লোক ছিলেন। মাধব মিশ্র নামক সপ্তগ্রামের এক কবি ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী নবীনপুর গ্রামে এসেছিলেন ; সেখানেই তিনি থেকে গেলেন। গ্রামটির নূতন নাম হল গোসাঁইপুর, এবং তা একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র হয়ে উঠল। মধুপুরে এক সময়ে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি ছিল। সেখানে রাজশাহীর পুটিয়ার বৈষ্ণবভাবাপন্না রানী হেমন্তকুমারী একটি মন্দির তৈরি করিয়ে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাণীগ্রামে কিছু বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁরা ছিলেন নরোত্তম দত্তের শিষ্য। যশোদলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা

নিন্দিত "চূড়াধারী" মাধবের আখড়া ছিল। তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যা ছিল। টাঙ্গাইলের কাছে মধুবনগড়ে ছিল 'গুপ্ত বৃন্দাবন' ; সেঁখানে বহু বৈষ্ণব মূর্তি ছিল।[৮]

২

ঢাকা জেলার, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার কোনও বৈষ্ণব চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকররূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ঈশান নাগর মানিকগঞ্জ মহকুমায় গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর। তিনি মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামের ধনী জমিদারদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। সে বয়সে ঈশান বিবাহ করেন। তাঁর বংশধরগণ তেওতার জমিদারদের গোসাঁই রূপে পরিচিত। গদাধর পণ্ডিতের কোনও কোনও অনুগামী মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বল্লভচৈতন্য গোস্বামী। তিনি পঞ্চসার গ্রামে একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন। "কাষ্ঠকাটা" জগন্নাথও ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী ; তাঁর শ্রীপাট ছিল বিক্রমপুরে কাঠাদিয়া গ্রামে।

ঢাকা শহরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বহু শিষ্যসেবকসহ প্রতিপত্তিশালী বীরভদ্রের ঢাকায় যাওয়ার বিবরণ এইরূপ :[৯]

অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ
নরযান অশ্বযান করিয়া সাজন ॥...
শ্বেত পীত রক্ত কৃষ্ণ পতাকা শোভন
কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্ধচন্দ্র দরশন ॥...
মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ করতাল শৃঙ্গ
চারিপাশে বেড়ি যায় চরণের ভৃঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি।
নিত্যানন্দ দাস রামাই চলে দোলা ঘেরি ॥

বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বহু বৌদ্ধ, যাঁদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল বলে "নাড়া" বা "নেড়া" বলা হত। তাঁদের প্রতাপান্বিত নেতা ছিলেন নৃসিংহ। 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার'-অনুসারে ঢাকার মুসলমান 'নবাব'-এর দুর্ব্যবহারে ভীষণ রেগে গিয়ে 'নাড়া'-রা প্রস্রাব করে ঢাকা শহর ভাসিয়ে দেন ; তখন নবাব ও অন্যান্য মুসলমানগণ "জিন্দাপীর" বীরভদ্রকে সম্মান করে নিষ্কৃতি পান। জেমস ওয়াইজ হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে, ঢাকা জেলার শতকরা ৭৪-জন মানুষ বিষ্ণুর কিংবা কৃষ্ণের পূজা করতেন।[১০] ভিখনলাল ঠাকুর নামক বৈষ্ণব সাধু বন্দর নারায়ণগঞ্জে পাঁচটি "নারায়ণচক্র" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বহু লোককে বৈষ্ণব দীক্ষা দিয়েছিলেন। ঢাকার বসাকদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদাস মুৎসুদ্দিকে সম্ভবত বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। আদি মধ্যযুগে সেখানে বিষ্ণু অথবা কোনও বৈষ্ণব অবতার ব্যাপকভাবে পূজিত হয়েছেন। বিক্রমপুরের ৩১টি গ্রামে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি অথবা বৈষ্ণব মূর্তি

আবিষ্কৃত হয়েছে।[১১] খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম এবং পঞ্চোপাসনামূলক হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল। বঙ্গে মুসলমানদের রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পরে জাতিভেদ এবং জাতিভিত্তিক ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড মেনে চলা হয়। বিশেষভাবে বিক্রমপুর পরগণায় ভূম্যধিকারীদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ-সমাজ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই পরিবেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সহজ ছিল না। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে যশোলং গ্রামে এবং তার আশেপাশে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে নিত্যানন্দ নামক এক বৈষ্ণবভাবাপন্ন জমিদার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তিনি বেশ কিছু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী প্রজাকে "নানকার" জমি দিয়েছিলেন। "নানকার"-পাওয়া বৈষ্ণব প্রজারা জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করেন। রিখ্যাত মালখানগর গ্রামের বসু-ঠাকুর উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারগণ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন ; 'ঠাকুর' উপাধি থেকে মনে হয়, তাঁরাও গুরুগিরি করতেন। ক্রমশ শ্রীনগর, লৌহজং, ভাগ্যকুল, রাউত্‌ভোগ ও হলদিয়ার জমিদারগণ বৈষ্ণব গোস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বৈষ্ণব গোস্বামীদের বাসস্থান ছিল বাহাদুরপুর, জপ্‌সা, রসুনিয়া, হাঁসাড়া, বেলতলী, আড়িয়াল, সোনারং, শিয়ালদি প্রভৃতি গ্রামে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান সমর্থক ছিলেন কায়স্থ, বৈদ্য এবং তিলি জমিদারগণ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর ছিল ; যাঁরা বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও সমর্থক ছিলেন। লৌহজং-এর তিলি জমিদারগণ প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির নির্দেশে "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমধর্ম"-শীর্ষক একটি ভাল নিবন্ধ রচনা করেন।[১২]

চৈতন্যের এক মাতুল ফরিদপুরের মুখডোবা গ্রামে থাকতেন, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল। তিনি মামু ঠাকুর নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিষ্ণুদাস ঠাকুর। তিনি শচীদেবীর বড় ভাই ছিলেন। তিনি যে কেন নবদ্বীপ থেকে মুখডোবা গ্রামে গেলেন, তা জানা যায় না। মামু ঠাকুর বাসুদেবের উপাসনা করতেন। নড়িয়া, পালং প্রভৃতি গ্রামের বৈশ্য জাতীয় লোকদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয় ছিল।

৩

যশোহর-খুলনাতেও বহু প্রাচীন বৈষ্ণব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। নদীয়া জেলার সংলগ্ন যশোহরে চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নিয়ে সনাতন ও রূপ যশোহরের চেঙ্গুটিয়া-প্রেমভাগ গ্রামে কিছু কাল ছিলেন। সেখানে তাঁদের বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিল। কাছাকাছি গ্রামগুলোতেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের বিখ্যাত লোকনাথ গোস্বামী যশোহরের তালেশ্বর গ্রামের মানুষ ছিলেন। গ্রামটি এখন তালখড়ি নামে পরিচিত। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে লোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের

পরিচয় ছিল। যশোহরের ভাটপাড়া-কলাগাছি গ্রাম ছিল 'যবন' হরিদাসের জন্মস্থান। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জন্ম হয়। পরে তিনি বেনাপোলে আট বৎসর ছিলেন। সেখানে শাক্ত-তান্ত্রিক জমিদার রামচন্দ্র খাঁ তাঁর উপরে নির্যাতন চালিয়েছিলেন। রামচন্দ্র নিত্যানন্দকে পর্যন্ত অপমান করেন।

'গোপাল' পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র 'শিশু' কৃষ্ণদাস যশোহরের বোধখানা গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। জাহ্নবাদেবী তাঁকে পুত্রস্নেহে পালন করেছিলেন; তাই তাঁকে "শিশু" বলা হত। পরে তিনি মেদিনীপুরে গর্ভেতায় চলে যান। বোধখানার কাছেই ভক্ত বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের জন্মস্থান অমৃতবাজার গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নামেই তাঁদের বিখ্যাত পত্রিকার নাম রাখা হয়। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকররূপে পরিচিত দয়ারামের শ্রীপাট ছিল তালতলাহাট গ্রামে। লাউপালা গ্রামে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বালকদাস বাবাজী একটি বড় শ্রীপাট অষ্টাদশ শতকে গড়ে তুলেছিলেন।[১৩]

যশোহর-খুলনায় বামাচারী শাক্ত উপাসনা জনপ্রিয় ছিল। মেঘনা নদীর তীরবর্তী চাঁদপুর বন্দরের কাছে মেহার গ্রাম। সেখান থেকে সর্বানন্দ ঠাকুর নামক এক বামাচারী তান্ত্রিক খুলনার সেনহাটী গ্রামে চলে আসেন। সর্বানন্দ 'সর্বোল্লাসতন্ত্র' নামে একটি প্রামাণিক তন্ত্র রচনা করেছিলেন।[১৪] সেনহাটীতে এই তন্ত্র রচিত হয়। স্থানীয় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। যশোহরের রাজা 'বঙ্গজ' কায়স্থ প্রতাপাদিত্য (জন্মকাল ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ) শাক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁর কাকা বসন্ত রায় ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেন। প্রতাপাদিত্য নিষ্ঠুরভাবে বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যই যে উড়িষ্যা থেকে গোবিন্দের একটি মূর্তি এনে যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তারও প্রমাণ আছে। ধর্মের বিভিন্নতাই বসন্ত রায়ের নিধনের কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

মুহম্মদপুরের প্রতাপান্বিত রাজা সীতারাম রায় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর গ্রামে তিনি একটি দোলমঞ্চ, কৃষ্ণের মন্দির, এবং পঞ্চরত্ন 'হরেকৃষ্ণ' মন্দির নির্মাণ করেন। বর্ধমানের শ্রীখণ্ডের গুরুরা গয়েশপুরের বৈদ্যদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। যশোহর-খুলনার গন্ধবণিকগণ এবং কৃষিজীবী পোদগণ বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের মধ্যে রামায়েত বৈষ্ণব গুরুদের কিছুটা প্রভাব ছিল।

সমগ্র পূর্ববঙ্গেই বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। আবার এটাও দেখা যায় যে, তথাকথিত 'যশোহরসমাজ'-এ স্মার্ত রঘুনন্দনের নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়া হয়নি। শৈব ও শাক্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সদ্ভাব ছিল। কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ ভাবে পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শাক্ত সমন্বয় স্পষ্ট হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমন ভাবা যায় যে, উত্তর বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার সহজসাধ্য করে তুলবার জন্যই বৈষ্ণবরা রাজশাহীর খেতুরিতে মহোৎসব করেছিলেন। নরোত্তম দত্তের কালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শুরুতে, উত্তরবঙ্গের বহু জমিদার ছিলেন আসলে ডাকাত।

চৈতন্য গৌড়ের কাছে রামকেলিতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই মালদহের মানুষজন বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন। চৈতন্য রামকেলিতে এসে কেশব ছেত্রী, সনাতন ও রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কেশব ছেত্রী ছিলেন সুলতানের দেহরক্ষীদের অধ্যক্ষ। চৈতন্যের আগমন স্মরণে এখনও জুন মাসে রামকেলিতে উৎসব ও মেলা হয়। এ জেলার গয়েশপুরের বৈষ্ণবরা স্থানীয় পোলি, বাগদি প্রভৃতি অনুসূচিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীর দুই শিষ্য নন্দনী ও জঙ্গলী মালদহের জঙ্গলীটোলায় একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। এখানে অবিবাহিত বৈষ্ণব বাবাজীরা স্ত্রী-বেশ ধারণ করেন।[১৫]

মালদহের পাশে রাজশাহী জেলাতে তান্ত্রিকদের প্রভাব ছিল। শক্তিশালী বারেন্দ্র জমিদাররা বৈষ্ণব ধর্মকে খুব একটা সমীহ করতেন না। কিন্তু নরোত্তম দত্ত তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর অনুগত শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন দস্যু-জমিদার চাঁদ রায়, এবং কুখ্যাত দস্যু হরিশ্চন্দ্র রায়, বনমালী চট্ট ও গোবিন্দ বাঁড়ুয্যা। কয়েকজন সংরক্ষণশীল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও নরোত্তমের শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর ২৩ জন শিষ্যের নাম 'প্রেমবিলাস'-এ উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী। তাঁর বহু শিষ্য-সেবক ছিলেন।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে পুটিয়ার শাক্ত রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর, তাত্ত্বিক পণ্ডিত, এবং পদাবলী-সংকলক রাধামোহন ঠাকুর। জমিদার আর ডাকাতরা বৈষ্ণব হল; ফলত রাজশাহীর কৃষক কামার কুমার ছুতাররাও বৈষ্ণব হলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলায় ১৬.১৩ শতাংশ লোকের ধর্ম ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। ১৯০১-এ রাজশাহীর ১৭,১৯৭ জন "জাত বৈষ্ণব" বংশানুক্রমিক গোসাঁইদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। গোসাঁইদের বিচার করার ক্ষমতা ছিল। কোনও বৈষ্ণব প্রচলিত বৈষ্ণবীয় নিয়ম ভঙ্গ করলে জাতিচ্যুত হতেন।[১৬]

পুটিয়া থেকে বৈষ্ণব ধর্ম এল বলিহারের জমিদারিতে। এখানকার জমিদাররা বিষ্ণুর পূজা করতেন, রথযাত্রা উৎসব করতেন। নাটোরের রানী ভবানী অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মানুসারে দীক্ষিতা হননি। তিনি শিবের, কালীর ও রামের উপাসনা করতেন; এ সব ধর্মের সংরক্ষণের জন্য তিনি বহু পরিমাণে অর্থ দান করেছিলেন। মান্দা নামক গ্রামে ১৭৮০-তে রানী ভবানীর অর্থে রঘুনাথ মন্দির

নির্মিত হয়। তাঁর পোষ্যপুত্র এবং বংশধর রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক।

পাবনা জেলায় মালো-জাতীয় জেলেরা বৈষ্ণব হয়েছিলেন। হাটিকুমরাইল গ্রামে ষোড়শ শতকে নির্মিত একটি দোলমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্ধমান জেলার আকাইহাটের 'গোপাল', চৈতন্যের ভ্রমণসঙ্গী কালাকৃষ্ণ দাস পাবনার সোনাতলা গ্রামে এসে একটি নূতন শ্রীপাট গড়ে তুলেছিলেন। তরাস গ্রামের জমিদারগণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই জমিদারগণ ছিলেন বারেন্দ্র কায়স্থ। বগুড়া জেলায় এক সময়ে বৌদ্ধ ও নাথ-সিদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় ছিল। মহাস্থানগড়ে, কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রামে এ সব ধর্ম প্রচলিত ছিল। স্থানীয় জমিদারগণ শাক্ত ছিলেন। সপ্তদশ শতকে অখ্যাত বৈষ্ণব গোসাঁইরা এ সব অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। বগুড়ার অরোরা গ্রামে বাস করতেন বৈষ্ণব নিবন্ধকার ও কবি বল্লভ। তিনি 'রসকদম্ব' নামক গ্রন্থে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের একটি নূতন ভাষ্য দিয়েছিলেন।[১৭]

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম ও গাইবান্দা মহকুমায় রামায়েত বৈষ্ণবরা সক্রিয় ছিলেন। এ জেলায় ওয়াড়ি গ্রামে রচিত হয় নাথধর্মীয় কাব্য 'গোপীচন্দ্রের গান'। পরবর্তীকালে রংপুরে কোনও কোনও জমিদার ও তালুকদার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পার্শ্ববর্তী কুচবিহার জেলায় শৈব শাক্তদের প্রাধান্য ছিল। 'যোগিনীতন্ত্র' অনুসারে বিনু সিংহ নামক রাজা শিবের ঔরসজাত এক সুন্দরী ম্লেচ্ছ সাধিকার সন্তান ছিলেন।[১৮] শিব না কি "কুচনী" রমণীদের নিয়ে বিহার করতেন; এই কাহিনীতে কৃষ্ণের রাসলীলাবিষয়ক কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ওয়াল্টার হ্যামিল্টন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, কুচবিহারের কলিতা উপজাতি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে, এবং অসমে সেই ধর্ম প্রচার করে। কুচবিহারের বৈষ্ণবদের মধ্যে অসমের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ শঙ্করের প্রভাব দেখা যায়। কুচবিহারের রাজবংশ কখনই বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধিতা করেননি। রাজাদের আনুকূল্যে কুচবিহার শহরে মদনমোহন মন্দির নির্মিত হয়। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯)-এর 'দররার' গ্রন্থাগারে বহু বৈষ্ণব পুথি আছে।

ফ্রান্সিস বুকানান্ হ্যামিল্টন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার বিবরণ রচনা করেন।[১৯] এতে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আছে। দিনাজপুরের বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অদ্বৈত আচার্যের অনুগামী ছিলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা ছিলেন নিত্যানন্দের ভক্ত। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণ গোসাঁইদের শিষ্যরা প্রধানত শূদ্র ছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের অধিকাংশ কায়স্থ জমিদার ছিলেন শাক্ত। ব্যতিক্রম ছিলেন দিনাজপুরের কায়স্থ-জাতীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী রাজারা। রাজা প্রাণনাথ রায় নির্মাণ করেছিলেন কান্তনগরের 'কান্তজী'-র বিখ্যাত মন্দির, যার কারুকার্য এখনও দৃষ্টিনন্দন। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পীরা এসে এই মন্দিরে অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন সৃষ্টি করেন। দিনাজপুরে, রংপুরে পাটনি, ভুঁইমালি, মুচি প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব গুরু ছিলেন।

দিনাজপুরে রামানন্দী বৈষ্ণবদের প্রভাব ছিল। দিনাজপুর শহরেই ছিল তাঁদের

এক বড় মঠ। মঠের নামে ছিল ৪৫ বিঘা জমি। একজন মহান্ত মঠের কর্তা ছিলেন। বহু "বোষ্টম" ছিলেন। একদল সর্বস্বান্ত হয়ে বোষ্টম হয়েছিলেন। সন্তানহীনা বিধবারা এবং ধর্মভীরু বেশ্যারা হয়েছিলেন বোষ্টমী। গোস্বামীকে মাত্র দেড় টাকা দক্ষিণা দিলেই মন্ত্র পেয়ে বোষ্টম কিংবা বোষ্টমী হওয়া যেত। কীর্তন গেয়ে অনেকে জীবিকা অর্জন করতেন। মূল গায়কের চারজন দোহার ও "বাজানদার" থাকত। বৈষ্ণবদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাক্ষর। এক ধরনের বৈষ্ণব গোসাঁই বস্ত্রের ব্যবসা করতেন; পাটনার বাজারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। যে সব সাহসী, উৎসাহী বৈষ্ণব দিনাজপুরে রংপুরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের নামধাম অজ্ঞাত। তাঁরা রাজবংশী, গারো, মেচ প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

৫

মুর্শিদাবাদে ব্যাপকভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়।[২০] রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য কবিরাজ খাগরার উত্তরে সৈদাবাদে একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের দুহিতা, এবং স্বয়ং স্ত্রীগুরু, হেমলতা ঠাকুরানী। তিনি তাঁর স্বামী গোপীজনবল্লভ চট্টরাজের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বুধুইপাড়া গ্রামে থাকতেন। হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্রের শিষ্য যদুনন্দন 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরানীর কীর্তি বিবৃত করেছেন।

মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬২৬-১৭০৮)। তিনি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সৈদাবাদে এসেছিলেন তিনি তাঁর বাসস্থান দেবগ্রাম থেকে। সেখানে তিনি পূর্বোক্ত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর ছাত্র হয়েছিলেন। বিশ্বনাথের গুরু ছিলেন গঙ্গানারায়ণের শিষ্য কৃষ্ণচরণ। সপ্তদশ শতকে বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রধান তত্ত্ববিদ ছিলেন বিশ্বনাথ। তিনি সংসার ধর্ম পালন করতেন। মধ্য বয়সে তিনি সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হন। 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তীকে বিশ্বনাথ দীক্ষা দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথের রচনাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল প্রথম পদাবলী-সঙ্কলন 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'; 'গীতাভাষ্য'; 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'-র টীকা; 'উজ্জ্বল নীলমণি' ও 'বিদগ্ধমাধব'-এর টীকা; 'ললিতমাধব'-এর টীকা; এবং সংস্কৃতে রচিত মহাকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্'। বিশ্বনাথ পরকীয়া-তত্ত্বের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। 'হরিবল্লভ' নাম নিয়ে তিনি একান্নটি পদ রচনা করেন। গুরুপরম্পরা অনুসারে তিনি নরোত্তম দত্তের ধারাবাহক বৈষ্ণব গুরু ছিলেন।

মালিহাটি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর (১৬৯৭-১৭৭৮) জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শিষ্য ছিলেন। নন্দকুমারের আদি নিবাস কুঞ্জঘাটা নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। সেখানে মূল্যবান প্রাচীন বৈষ্ণব চিত্রাবলি সংরক্ষিত ছিল। রাধামোহন নামে আরও একজন বৈষ্ণব গুরু ছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিজ হরিদাস আচার্যের বংশধর। তিনি 'পদকল্পতরু'-সঙ্কলক বৈষ্ণব

দাসকে দীক্ষা দেন। মালিহাটির রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র' নামক একটি বড় পদাবলী-সঙ্কলন প্রস্তুত করেন। এই সঙ্কলনের বৈশিষ্ট্য, ব্রজবুলি ও বাংলা পদাবলীর সংস্কৃত টীকা। রাধামোহন ঠাকুরও পরকীয়া-মতাবলম্বী ছিলেন।

মোতিঝিলের কাছে কোঙারপাড়া গ্রামে শ্রীপাটে বাস করতেন হরিপ্রিয়া ঠাকুরানী। কথিত আছে, বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি জীব গোস্বামীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের মুসলমান শাসকগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস-এর বন্ধু, এবং কুখ্যাত করগ্রাহী দেবী সিংহ সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর জমিদারির কেন্দ্র নসিপুরে ঝুলন ও তুলসীবিহার উৎসব ঘটা করে পালন করা হয়। জিয়াগঞ্জও বৈষ্ণবদের একটি বিখ্যাত শ্রীপাট। ভগবানগোলার কাছে তেলিয়াবুধুরিতেও একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট বিখ্যাত হয়। লালগোলার বৈষ্ণব জমিদারগণ এই শ্রীপাটের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। টেয়া-বৈদ্যপুর এবং কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্রীপাট এককালে বিখ্যাত ছিল। কাশিমবাজারের রাজবংশ শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুগত ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু শ্রীখণ্ডের ভক্তানন্দ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই বিবরণ থেকে এ সিদ্ধান্তই উৎসারিত হয় যে, যা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' রূপে সুপরিচিত, তা বঙ্গে সর্বত্র সমাদৃত হয়নি। মুর্শিদাবাদে, এবং কিছুটা যশোহরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সার্থক হয়। পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের বহু জায়গায় বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জমিদারগণ। কিন্তু তৃণমূলস্তরে এ ধর্ম তেমন কিছু জনপ্রিয় ছিল না। সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যান্য ব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব গোসাঁইগণ। কিন্তু এটা অবশ্যই জোর দিয়ে বলা যায় যে, চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ফলেই জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরানী; সীতাদেবী, হরিপ্রিয়া ঠাকুরানী স্ত্রী-গুরু রূপে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। স্মৃতির বিধান তাঁদের রান্নাঘরে রেখে দিতে পারেনি।

সূত্রের উল্লেখ

১. চৈ. ভা, পৃ. ৮৮, ৯০

২. দ্রষ্টব্য : অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, বৈদ্যনাথ দে, 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', ২ খণ্ড, ৪ অংশ (শিলচর, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) ; এ গ্রন্থে প্রদত্ত কোনও কোনও তথ্য সন্দেহাতীত সত্যরূপে গ্রাহ্য নয়। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, W.W. Hunter, *A Statistical Account of Assam*, Vol-2, part II (Reprint, Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1975); অসমে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ, Maheswar Neog, *Early History of the Vaisnava Faith And Movement in Assam: Sankaradeva And His Times* (Delhi, Motilal Banarsidass, Reprint, 1985)

৩. 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', ২, পৃ. ১৪২-১৪৩ ; 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১২৮১-৮২

৪. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', ২, (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬) পৃ. ১০৩৫-৩৬

৫. আহ্মদ শরীফ, "চট্টগ্রামের হিন্দুকবির পদসাহিত্য" 'বাংলা অকাদেমি পত্রিকা', মশারুল ইসলাম সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৯৭১, সংখ্যা-৪) পৃ. ১-৫০

৬. দ্রষ্টব্য, ভবানন্দ 'হরিবংশ', সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২) ; এর অনেক অংশই অর্থ 'পনেলিজিক্'

৭. কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'আত্মচরিত' (কলিকাতা, বাসন্তী চক্রবর্তী, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৩-৮৫ ; J.N. Bhattacharya, *Hindu Castes And Sects*, P. 34

৮. F.A. Sachse, *Bengal District Gazetteers, Mymensingh* (Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1917), PP. 33, 36, 40, 153

৯. 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

১০. James Wise, *Notices of the Races, Castes and Traders of East Bengal* (London, Harrison and Sons, 1883) P. 147

১১. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্যকীর্তি', 'বিক্রমপুর', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত (মাসিক পত্রিকা), মাঘ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

১২. দ্রষ্টব্য, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', ২, পৃ. ১৯০৩ ; হরিদাস দাস, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন', ২ খণ্ড (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৬৯, ১৯৭৫), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১৯ ; হিমাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, 'বিক্রমপুর', ৩ খণ্ড (নারায়ণগঞ্জ, দয়াময় চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১-১৯৪৩), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮, ৩৪৫-৩৬৮, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮১, ১২১, ৩৭৬, ৪৪১, ৫০৯ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩১৪। আরও বহু তথ্য এই দুই খণ্ডে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, অমিয় বসু সম্পাদিত, 'বাংলায় ভ্রমণ', ২ খণ্ড (কলিকাতা, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রচার বিভাগ, ১৯৪০), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৪, ৫৬ ; বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর : আত্মজীবনী' (কলিকাতা, যুগযাত্রী প্রকাশক, ১৯৫৫), পৃ. ১৫০।

১৩. দ্রষ্টব্য, 'বাংলায় ভ্রমণ', ২ ; সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ২ খণ্ড (কলিকাতা, শিবশঙ্কর মিত্র প্রকাশিত, ১৯৬৩-৬৫)।

১৪. রাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'সর্বোল্লাসতন্ত্রম্' (কলিকাতা, হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৫৩), Introduction by Dineshchandra Bhattacharya, PP. 1-32

১৫. G.E. Lambourne, *Bengal District Gazetteers, Malda* (Calcuutta, Bengal Secretariat, 1918), PP. 29-30

১৬. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Rajshahi* (Calcutta, Bengal Secretariat, 1916), PP. 58, 66, 157, 164, 165, 167, 172, 176-77.

১৭. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Pabna (Calcutta, 1923), PP. 32, 33, 118-20, 131*

১৮. স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী, সম্পাদিত 'যোগিনীতন্ত্রম্' (কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩২-১৩৪। এখানে "ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা" যোগিনীর বর্ণনা অভব্য।

১৯. *Montgomery Martin, The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, 3 Vols. (Delhi, Indian Reprint, 1976), Vol. 3, PP. 737-755, 929.

২০. VIB, 300-303.

একাদশ অধ্যায়

কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রচারিত সকল বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব এবং তথ্য বৈষ্ণব গৌড়ীয়গণ গ্রহণ করেননি। রাঢ়ে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের এবং চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝবার জন্য তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতকে রাঢ়ে বঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অন্য এবং ভিন্ন কথা বলা হতে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আলোচ্য।

গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি অপ্রকাশিত নৃসিংহ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্'। নৃসিংহ কাটোয়ার কাছে সুপ্রাচীন অম্বলগ্রামের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুথিটির রচনাকাল ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ। এই পুথিতে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর গভীর প্রভাব থাকলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য। পুথিটি সংস্কৃত পুরাণের রীতিতে রচিত হয়েছে। নৃসিংহের যে সব বিবরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল :

১. রাধাকৃষ্ণের গান্ধর্ব বিবাহ। রাধার স্বর্ণডিম্ব প্রসব। রাক্ষস কর্তৃক সেই ডিম্ব ভক্ষণ।

২. গৌরাঙ্গের জন্মতারিখ :

মুনিবেদনিশানাথে শাকে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
নিশানাথ গ্রহং প্রাপ্য শচ্যাং জাতো জনার্দনঃ ॥

অর্থাৎ ফাল্গুনে পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে) জনার্দন শচীতে জাত হলেন। (অঙ্কের "বামা গতি"তে এই তারিখ পাওয়া যায়।)

৩. লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহের পরেও নবদ্বীপের গোয়ালার মেয়ে মালতীর গৌরাঙ্গ সম্পর্কে "রাধাভাব"।

৪. 'ভাগবতপুরাণ'-এর টীকা রচয়িতা শ্রীধর স্বামীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন ; শ্রীধর স্বামীকে ধর্মশিক্ষাদান।

৫. গৌরাঙ্গের বংশীবাদনে তাঁর দেহ থেকে গোপিনীদের আবির্ভাব ; তাঁদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের রাসলীলা।

৬. গৃহে পত্নী লক্ষ্মীদেবী থাকলেও "কায়ব্যূহ" প্রক্রিয়ার সাহায্যে "কামশাস্ত্রপ্রবীণ" গৌরাঙ্গ অসংখ্য নায়িকার সঙ্গে রতিলীলা করতেন।

৭. ঈশ্বর পুরী যবন হরিদাসকে দশাক্ষরী মন্ত্র দেন ; ঈশ্বর পুরী গৌরাঙ্গেরও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

৮. শচীদেবীর অভিযোগে "উন্মত্ত" গৌরাঙ্গকে "যবনরাজ"-এর দরবারে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। গৌরাঙ্গ "যবনরাজ"কে ধর্মোপদেশ দান করেন। "যবনরাজ" গৌরাঙ্গের পদবন্দনা করে তাঁকে মুক্তি দেন।

৯. ভারের ঘোরে নিত্যানন্দ "মদ আন্ মদ আন্" বলে চেঁচাতেন, এবং সর্বদা "মুণ্ডী মুণ্ডী" বলতেন।

১০. বিষ্ণুপ্রিয়ার মতে গৌরাঙ্গ ছিলেন "রতিশাস্ত্রবিচক্ষণ"।

১১. আদ্যাশক্তির ভূমিকায় অভিনয়কালে গৌরাঙ্গ ভক্তদের স্তন্য পান করিয়েছিলেন।

১২. গৌরাঙ্গ মদ্যপান করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণরা ও শ্রীবাস বাঁধা দেওয়াতে তাঁর আর মদ খাওয়া হল না।

১৩. দুর্বাসার শাপে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ।

১৪. নবদ্বীপের "যবনরাজ" গৌরাঙ্গের দ্বারা তামসী মায়াতে সৃষ্ট এক মহাভয়ঙ্করী "সিংহিকা" দেখেই "পপাত ধরণীতলে"।

১৫. গৌরাঙ্গ সমস্ত পুরুষের রূপ ধারণ করে "সর্ব্বনারীরূপধৃতাং" বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে রতিক্রীড়া করেন।

১৬. "বিবেক"-এর পরামর্শে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। শোকে উন্মাদিনী বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করেন।

১৭. "যবনরাজ" জনৈক "নিশাচর"-এর কাছ থেকে চৈতন্যের সব খবর জেনে এই আদেশ দিলেন যে, কেউ যেন চৈতন্যকে একটুও বিরক্ত না করে।

১৮. সনাতন ও রূপের দীক্ষাগুরু ছিলেন অদ্বৈত আচার্য।

১৯. সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে চৈতন্যের সঙ্গে বিভীষণের দেখা হয়।

২০. নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত বৃদ্ধা শচীদেবীর দেখাশোনা করতেন।

২১. নিত্যানন্দের পরিকর গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি গৌড়ে ফিরে আসেন এবং যুগাবতারের রূপ ধারণ করে নির্বাণ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের, শচীদেবীর, এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মৃত্যু হয়।

এই পুথির রচয়িতা 'ক্রমদীপিকা', 'তন্ত্রসার', 'যামল', 'মন্ত্রচূড়ামণি' প্রভৃতি তান্ত্রিক নিবন্ধ পড়েছিলেন। এ পুথিতে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক সমন্বয়ের প্রয়োজনে গৌরাঙ্গলীলার একটি তান্ত্রিক প্রেক্ষিত স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এটা অনিবার্য ছিল। তান্ত্রিক পরিমণ্ডলে রাধা সম্মাননীয়া ছিলেন। 'রাধাতন্ত্রম্' রচিত হয়। বিশিষ্ট তান্ত্রিক সর্বানন্দ তাঁর 'সর্বোল্লাসতন্ত্রম্'-এ 'রাধাতন্ত্রম্' থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন : "রাধাংশেন পুমান জ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণাংশাৎ শক্তিরূপধৃক্" অর্থাৎ, রাধা পুরুষ, কৃষ্ণ শক্তি, এবং এটাই না কি "বৈষ্ণবস্য মতং ধ্রুবং"।[১৫] তাছাড়া কৌল সাধকদের "সভায়"

বৈষ্ণব হওয়ার কথাও প্রচলিত ছিল। আলোচ্য পুথিতে অনেক জায়গায় "শিবগৌরীসংবাদ"-এ গৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত হয়েছে। এ সব তথ্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের কিছুটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কোনও কোনও পর্যায়ে তান্ত্রিকতা সুস্পষ্ট হয়। রূপ গোস্বামী লিখেছেন যে, বৃন্দাবনের কুমারীরা 'মহাযোগিন্যধিশ্বরী' কাত্যায়নী মহামায়ার কাছে কৃষ্ণরূপ পতিপ্রাপ্তির বর চেয়েছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর 'সাধনদীপিকা' গ্রন্থেও তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণবদের মধ্যেও যোগতান্ত্রিক রহস্যবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়।

নৃসিংহ স্পষ্টভাবে কোনও সহজিয়া মতবাদ প্রচার করেননি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, চৈতন্যের ঐতিহ্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের বিরোধী ছিল না। পুথিটিতে উল্লিখিত বংশ ও গুরুপরম্পরা থেকে এমন মনে হয় যে, রাঢ়ে কোনও কোনও গ্রামে এমন এক ধরনের গৌরাঙ্গপূজা প্রচলিত হয়েছিল, যা ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ও বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার অথবা সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে যোজকস্বরূপ। সম্ভবত এ কারণেই হরিদাস দাস লিখেছেন : "...গ্রন্থখানা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে।" তবুও, একটি স্থানীয়, মিশ্র, এবং হয়তো সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কোনও গ্রামীণ বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, চৈতন্যলীলার একটি কৌতূহলোদ্দীপক ভাষ্যরূপে পুথিটি যথেষ্ট মূল্যবান। "কায়ব্যূহ"-অবলম্বনে গৌরাঙ্গ বহু নায়িকার সঙ্গে "লীলা" করলেও নৃসিংহের বিবরণ অনুসারে তিনি কিন্তু অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ছিলেন। "রাজরাজেশ্বর" রূপধারী গৌরাঙ্গ না কি জাতিবর্ণভিত্তিক পেশা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে, "দ্বিজসেবন"-ই শূদ্রদের প্রধান কর্তব্য। পঞ্চোপাসনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাও না কি তিনি বলেন। স্ত্রী সর্বদা স্বামীর সেবা করবেন,—এটাও না কি তাঁর মত ছিল।

নৃসিংহ নিত্যানন্দকে অসামান্য গুরুত্ব দিয়েছেন। চৈতন্যই না কি নিত্যানন্দকে অদ্বৈতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের কোন্দল শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতাহাতিতে পরিণত হয়; নিত্যানন্দ একবার বাপের বয়সী অদ্বৈতকে বলেন : "মুষ্ট্যাঘাতেন তে প্রাণং নয়ামি যমমন্দিরং", অর্থাৎ "ঘুষি মেরে তোকে মেরে ফেলব।"-নৃসিংহ জানতেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মাধব-সম্প্রদায়ের সংযোগ মেনে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মতে মাধবেন্দ্র পুরী মাধব সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে নূতন সংবাদ।

২

চৈতন্যের ধর্মমতের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যা প্রেমদাস-রচিত 'বংশীশিক্ষা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়।[২] এই ব্যাখ্যার সঙ্গে বৃন্দাবনী গৌড়ীয় তত্ত্বের মিল নেই। পূর্বে বাঘনাপাড়ার শ্রীপাট উল্লিখিত হয়েছে। জাহ্নবাদেবীর দ্বারা

পালিত নবদ্বীপের বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র রামচন্দ্র এই শ্রীপাট গড়ে তুলেছিলেন। তিনি জঙ্গল কেটে শ্রীপাট তৈরি করেন।

বাঘনাপাড়ায় উদ্ভাবিত তত্ত্বের দুটো পরস্পরবিরোধী ধারা আছে। প্রাচীনতর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে রাজবল্লভ গোস্বামী-রচিত দুষ্প্রাপ্য 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থে। রাজবল্লভ বংশীবদনের প্রপৌত্র ছিলেন। অর্বাচীন তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে উপরে উক্ত 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ, প্রেমদাস (মিশ্র) ভাল লেখক ছিলেন। তিনি ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। প্রেমদাসের আসল নাম ছিল পুরুষোত্তম মিশ্র; উপাধি ছিল 'সিদ্ধান্তবাগীশ'।

'মুরলীবিলাস'-এ প্রধানত জাহ্নবা দেবীর মত ব্যাখ্যাত হয়েছে।[২ক] এই মতে আদ্যন্ত রূপ গোস্বামীর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব দেখা যায়। ডিমোক্ লিখেছেন যে, পালিত-পুত্র রামচন্দ্রের প্রভাবে জাহ্নবাদেবী সহজিয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। সাহেব এটা না জেনে লিখেছেন। জাহ্নবাদেবী "বৈধী" ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। 'মুরলীবিলাস'-এ কোথাও সহজিয়া মত প্রকাশিত হয়নি। রামচন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। 'মুরলীবিলাস' কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্বাবলিকে সমর্থন করেছে।

কিন্তু প্রেমদাস 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে ভিন্ন কথা লিখেছেন। তিনি জাহ্নবাদেবীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর রচনায় স্ত্রী-গুরুর কোনও স্বীকৃতি নেই; তাঁর সিদ্ধান্ত :

স্ত্রীজাতির উপদেশে কিবানর্থ হয়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি ক্ষয়॥

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করাও অসম্ভব ছিল। 'বংশীশিক্ষা'তে চৈতন্যের কথাতেই "রসরাজতত্ত্ব" প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্ভজীবনী এবং বৃন্দাবনে উদ্ভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত হয়নি। অথচ, প্রেমদাস যে বিশেষভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়েছিলেন, তা স্পষ্ট। যাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত জেনেও 'রসরাজ'-তত্ত্ব মানতেন, তাঁদের জন্যই 'বংশীশিক্ষা' রচিত হয়েছিল। এমনই কয়েকজন বৈষ্ণবের নামধাম প্রেমদাস উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন পানাগড়ের হরিদাস ঠাকুর, কায়স্থ কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর, শালডাঙ্গা-মনসবপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ বড় ঠাকুর, কাটাবনীর গোকুলানন্দ ঠাকুর, কোগ্রাম-উজানীর এক 'ঠাকুর' (পূর্ণ নাম নেই), ধামাস গ্রামের বৈষ্ণব সাধু রামচন্দ্র, এবং হরি ঠাকুর। কিন্তু প্রেমদাসের গুরু রামকৃষ্ণ রসরাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন :

আরে আরে প্রেমা তুই কৈলি সর্বনাশ।
নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব করিলি প্রকাশ॥

গুরুর নির্দেশে তিনি তাঁর রচনা খুব ভাল করে সম্পাদনা করেন; অর্থাৎ, তিনি সব কথাই লেখেননি।

প্রেমদাসের মতে চৈতন্য দুই রকমের বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাস করতেন। প্রথমটি

ছিল বহিরঙ্গ, এবং দ্বিতীয়টি ছিল অন্তরঙ্গ। রসরাজতত্ত্ব অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব। চৈতন্য তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট নবদ্বীপের বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়কে এই তত্ত্বের কথা বলেন। বংশীবদন পূর্বজন্মে ছিলেন কৃষ্ণের বাঁশী। বংশীবদনের জন্মকালে চৈতন্য সূতিকাগৃহে উপস্থিত ছিলেন :

শচীর কুমার দেখি সুকুমার বালক লইয়া কোলে।
পুলকিত অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ আমার মুরলী বলে ॥

এটাও তো এক বিচিত্র সংবাদ। যাই হোক, বংশীবদনই যখন আবাল্য চৈতন্যের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরিকর, তখন তাঁকেই যে চৈতন্য রসরাজতত্ত্ব বলবেন, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

রসরাজ কৃষ্ণ সব রসের ঝরনা। দৃশ্যত তিনি পরস্ত্রীদের সঙ্গে কেলি করেন। কিন্তু আসলে এই স্ত্রীলোকরা কৃষ্ণেরই স্ত্রী। গোপিনীদের মধ্যে রাধাই প্রধান। অন্যান্য গোপিনীরা রাধার অংশকলা। সমস্ত রসের মধ্যে শৃঙ্গাররসই শ্রেষ্ঠ। এই রসের বত্রিশটি লক্ষণ আছে।

আদ্যরস শৃঙ্গারের বত্রিশ লক্ষণ।
আর যে বত্রিশ বিপ্রলম্ভের গণন ॥
চমৎকার রস এই চৌষট্টি প্রকার।
আশ্রয় বিষয় হয় রসরাজ যাঁর ॥

কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণপ্রেম পবিত্র। কিন্তু কৃষ্ণের রতিক্রীড়া নিরন্তর। কৃষ্ণের ব্রজধামে দুঃখ নেই, দুর্বলতা নেই, মৃত্যুও নেই। যাঁরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, অথবা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী, তাঁরা কখনই ব্রজধামে যেতে পারেন না। কৃষ্ণই পুরুষ। রাধা প্রকৃতি। একমাত্র কৃষ্ণেই অদ্বৈততত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর পঞ্চাকার যথা, ব্রহ্মণ, আত্মন, ভগবান, গুরু, এবং ভক্ত। কৃষ্ণের অংশরূপী ভক্তও এক অসামান্য ব্যক্তি। গুরুও দেব। তাঁর সমালোচনা করা উচিত নয়। গুরু ভক্তের মা-বাপ। গুরু মৃত্যুহীন। জীবন ও মন তাঁকেই সমর্পণ করা উচিত। কিন্তু যে গুরু ভক্তির উপদেশ দিয়ে শিষ্যকে মুক্তি দিতে পারেন না, তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। স্ত্রীলোকের পতি পরমগুরু ; তবুও,

রসরাজকৃষ্ণ লাগি বিপ্রপত্নীগণ।
আপন আপন স্বামী করেন বর্জন ॥

কৃষ্ণের চেয়ে রাধা কোন অংশে কম নন। তিনি কৃষ্ণের সমান। কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রীগণ, এবং গোপিনীগণ প্রকৃতিরই দুইটি সত্তা। দুই সত্তাই কৃষ্ণ থেকে এসেছে। কৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত, অথচ

আহ্লাদস্বরূপ হঞা হ্লাদিনীরমণ।
যাঁহার কর্তৃক সদা আহ্লাদিত হন ॥

আত্মবিদ্যার অনুশীলনই ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মজ্ঞানী রসরাজ কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেন। হ্লাদিনীগুণ থেকে ভক্তি হয়। ভক্তির প্রাণবস্তু হল প্রীতি, ভালবাসা। বৃন্দাবনের রাখালরা কৃষ্ণের স্বরূপ থেকে আসে ; গোপীরা আসে রাধার স্বরূপ থেকে।

'বংশীশিক্ষা'-র তৃতীয় উল্লাসে চৈতন্য নিজেকে রসরাজ কৃষ্ণদাস রূপে পরিচিত করেন। চৈতন্য একই সঙ্গে কৃষ্ণ এবং গুরু। ইন্দ্রিয়ের কর্মসমূহকে গুরুরূপী কৃষ্ণকে নিবেদন করতে হবে। "আনুকূল্য"-অভ্যাসে তা করা যায় :

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কৃষ্ণের সেবনে।
নিরমল আনুকূল্যা ভক্তি করি গণে ॥
প্রাতিকূল্য অর্থে নিজ সুখাদিতে আশ। ...

রসরাজ-তত্ত্বে বিশ্বাসী বৈষ্ণব মনে মনে ভাবেন যে তাঁর হৃদিবৃন্দাবনে প্রস্ফুটিত কমলের অষ্টদলে আছেন অষ্টসখী ; কমলের মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণ নিরন্তর রতিক্রীড়া করেন। এই রকম বৈষ্ণবের জীবনধারা সর্বদা দ্বিধাবিভক্ত :

মুখে হাস্যমাখা তার চক্ষে বহে নীর।
জাগিয়া ঘুমায় সেহ বচন সুধীর ॥
পিতামাতাভ্রাতা আদি বিহীন সে জন।
তথাপি তাদের সঙ্গে রহে অনুক্ষণ ॥
কামশূন্য হঞা করে কামের করম।
সাপের মাথায় ভেকে করায় নর্তন ॥

স্ত্রীগুরুকে অস্বীকার করলেও প্রেমদাস স্ত্রীলোকের ধর্মীয় অধিকার মেনে নিয়েছেন। বহু রকমের কৃত্য পালনের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। বৈষ্ণবদের তিনি সন্ন্যাসী হতে বলেননি। রসরাজের নিরন্তর ভাবনায় যাতে চরিত্রটি নষ্ট না হয়, তার জন্য প্রেমদাস চৈতন্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, পিতা "প্রজাপতি", মাতা "পৃথিবী", ভাই "মরুতপতি", বোন "দয়া", অতিথি "ধর্ম", অভ্যাগত "অগ্নি", পত্নী "প্রীতি", পুত্র "জ্ঞান, বৈরাগ্য", কন্যা "স্নেহের স্বরূপা"। অর্থাৎ রসরাজের লীলা ভেবে ভেবে এঁদের অবহেলা করা চলবে না। অথচ, প্রচলিত কামশাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে কামকে "মথন" করার নির্দেশ দিয়ে প্রেমদাস লিখেছেন :

মন্মথের মথনেতে যেবামৃত ক্ষরে।
রসিক ভকতে তাহা নিত্যপান করে ॥

সুশিক্ষিত প্রেমদাস ভাল কবিতা লিখতেন। সংসারের বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন :

কুম্ভশ্রেণী শিরে ধরি বাজীকরগণ
রজ্জু দিয়া নেচে করে গমনাগমন ॥
দৃষ্টি তার রহে পদে কুম্ভে রহে মন।
সে লাগি তাহার শির না নড়ে কখন ॥
অতএব রজ্জু হৈতে কুম্ভের সহিত।
পতন তাহার নাহি হয় কদাচিত ॥
তৈছে জীব মায়ারজ্জু পদেতে বাঁধিয়া।
বিষকুম্ভশ্রেণী শিরোপরেতে রাখিয়া ॥

পদে দৃষ্টি রাখি আর কুম্ভে রাখি মন।
অভদ্র সংসারে সদা করিছে ভ্রমণ ॥

বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 'বংশীশিক্ষা' ছিল একটি সহজিয়া গ্রন্থ।[৩] কিন্তু গৌড়ীয় মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ভেবেছিলেন যে, তাতে কোনও কোনও কথার সহজিয়া অনুষঙ্গ থাকলেও সহজিয়া মতবাদ নেই।[৩ক] কেদারনাথ নিজেও বাঘনাপাড়ার শ্রীপাটের ভক্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বর্ধমানে সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রভাব ছিল। মনে হয়, সে প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য 'বংশীশিক্ষা'-য় প্রস্তাবিত 'রসরাজ' উপাসনায় একই সঙ্গে 'রহিরঙ্গ'-সদাচারের উপরে, এবং "অন্তরঙ্গ"-আদিরসাত্মক মননক্রিয়ার উপরে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

৩

'মুরলীবিলাস'-এ জাহ্নবা দেবীর যে তত্ত্বাবলি আলোচিত হয়েছে, তাতে দাস্যভাবের কোনই গুরুত্ব নেই। দাস্যভাব প্রচারক নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবী দাস্যভাবকেই প্রায় বর্জন করলেন, এবং বর্জন করার কোন কারণ ব্যাখ্যা করলেন না। ঐতিহ্য অনুসারে বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়াদের বৈষ্ণব করলেও দাস্যভাবের প্রচারকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

কিন্তু বীরভূমে মঙ্গলডিহি গ্রামে দাস্যভাব বেঁচে রইল। সুন্দরানন্দ গোপালের মতানুবর্তী নয়নানন্দ ঠাকুর, জগদানন্দ ঠাকুর, এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর অপ্রতিহতভাবে নিত্যানন্দের দাস্যভাব প্রচার করেন। বীরভূমে মঙ্গলডিহির বৈষ্ণবদের আদিপুরুষ ছিলেন সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পান পাতার ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ গোপালচন্দ্র। পানের ব্যবসা করতেন বলে তিনি "পানুঙা ঠাকুর", অথবা "পানুয়াগোপাল" নামে সুপরিচিত ছিলেন। পানুয়াগোপালের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্যামচাঁদ ও বলরাম। তাঁর সঙ্গে ফকির আবদুল্লা শাহ্-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পানুয়াগোপালের পোষ্যপুত্র কানুরামের পৌত্র নয়নানন্দ ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে দাস্যভাবের ব্যাখ্যামূলক "প্রেয়োভক্তিরসার্ণব" রচনা করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগদানন্দ রচনা করেরন "শ্যামচন্দ্রোদয়"। জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর 'গোবিন্দবল্লভ' নামক সঙ্গীতনাটক রচনা করেছিলেন।[৪]

'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব' এবং 'কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রেক্ষিতে দাস্যভাব আলোচিত হয়েছে। প্রথমেই যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল এই যে, 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব'-গ্রন্থে নয়নানন্দ সুন্দর ভাষায় রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' থেকে প্রমাণ আহরণ করে দাস্যভাবের আলোচনা করেছেন। 'গোস্বামীশাস্ত্র'-কে এড়িয়ে যাওয়ার তো উপায় ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে যখন বৈষ্ণবতা যৌনতারই প্রায় নামান্তর হয়ে উঠেছে, তখন পবিত্রহৃদয় নয়নানন্দ এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র জগদানন্দ যৌনতাকে দূরে সরিয়ে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র প্রমাণ দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বমূলক দাস্য-সখ্যভাব সম্বন্ধে রুচির নিবন্ধ রচনা করে একটা ভাল

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব'-গ্রন্থে "উত্তম" বৈষ্ণবের সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হয়েছে :

সর্বভূতে সম দয়া লাভালাভে সম।
শাস্ত্রযুক্তিনিপুণ যে সেই সে উত্তম ॥
কৃষ্ণপূজে ভক্তি করি বৈষ্ণবে সম্মান।
অনুগতে অনুগত সমত্বে সমান ॥

নয়নানন্দের মতে তাবৎ বৈধী ভক্তি; যাবৎ 'ভাবোদ্গম' না হয় ; ভাবভক্তি হলে বৈধীভক্তি থাকে না। সখ্যভাবেও 'মাধুর্যরস' থাকে। "ঐশ্বর্য-জ্ঞানে কভু সখ্যতা না হয়" ; সখ্যরস "পরমরস" ; সখ্যরস "হেতুশূন্য" ; আর "দাস্যরতি"তে

কৃষ্ণে প্রভুত্ব জ্ঞান আপনে অধীন।
সেব্য-সেবকতা যাহে আপনাকে হীন ॥

সখ্যরসের সঙ্গে "বিভাব"-এর মিশ্রণ হলে তা "প্রেয়োভক্তি"তে রূপান্তরিত হয়। কৃষ্ণের সখারা সকলে কৃষ্ণের সমান। কৃষ্ণ সখাদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত খান। কৃষ্ণ চিরকিশোর ; তাঁর সখারাও চিরকিশোর। সখ্যরতি বৃদ্ধি পেলেই "প্রণয়" জন্মে। "প্রণয়" গাঢ় হলে 'স্নেহ' হয়। বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ চলে গেলেন ; তাতে তাঁর সখাদের প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নয়নানন্দ ভাবে বিভোর হয়ে সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণনা করেছেন। তাতে কোথাও আদিরসের উৎপাত নেই। গোবিন্দলীলার এমন বর্ণনা অন্য কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় না, কারণ এই বিবরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রেয়োভক্তি, মধুররতি নয়। 'শ্যামচন্দ্রোদয়'-এ জগদানন্দ ঠাকুর বড় সুন্দর কথা লিখেছিলেন :[৪ক]

কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত সুবর্ণমণিতে যুক্ত
রতনমণির হারগাথা ॥

৪

বগুড়া জেলার অরোরা গ্রাম-নিবাসী কবি বল্লভ 'রসকদম্ব' রচনা করেছিলেন।[৫] এ গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। বল্লভ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন না। 'রসকদম্ব' ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। বন্ধু মুকুট রায়ের মাধ্যমে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তিনি গৌরনাগরবাদ গ্রহণ করেননি। তাঁর গুরু উদ্ধব দাস নরোত্তম দত্তের শিষ্য হলেও তিনি নরোত্তম দত্ত-প্রচারিত বৃন্দাবনী বৈষ্ণব তত্ত্বকেও গ্রহণ করেননি। গ্রন্থের শুরুতে চৈতন্য এবং অদ্বৈতকে নমস্কার করা হলেও তাতে অন্যত্র তাঁরা উল্লিখিত হননি।

'রসকদম্ব'-এর বিষয়বস্তু কৃষ্ণের দ্বারকালীলা ; বৃন্দাবনের এবং বৃন্দাবনের গোপীদের কোনও বিবরণ এতে নেই। এ গ্রন্থের প্রধানা নায়িকা রুক্মিণী। 'পদ্মপুরাণ'-এর "পাতালখণ্ড"তে, এবং 'ভাগবতপুরাণ'-এর তৃতীয় স্কন্ধে প্রদত্ত সৃষ্টির বিবরণ কবি বল্লভ হুবহু বাংলা পয়ারে তুলে দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে কৃষ্ণ নিজেকে

শিব এবং রুক্মিণীকে পার্বতীরূপে উল্লেখ করেন। এমনও বলা হয়েছে যে, জীবের দুঃখকষ্টের জন্য কৃষ্ণ দায়ী থাকেন না। নিত্য বৃন্দাবনের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণের উৎস 'পদ্মপুরাণ' এবং 'ববাহসংহিতা'। রাধা একবার উল্লিখিত হয়েছেন। বল্লভের বৃন্দাবন যেন একটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ মণ্ডল; এর অনেক "কোণ", "দ্বার", এবং "দিক্"। কৃষ্ণের প্রেমিকাদের সংখ্যা চার লক্ষ; এক এক "দ্বার"-এ এক এক লক্ষ প্রেমিকার অবস্থান। প্রেমিকারা সকলেই যুবতী। তাঁদের ভক্তি নিষ্কাম। নিষ্কাম ভক্তি সুদৃঢ় হলে পুরুষ ভক্তও নিজেকে কৃষ্ণের "প্রেমিকা" ভাবতে পারেন।

পুরুষ-ভক্ত "নিবৃত্তি"-র পদ্ধতি অবলম্বন করেও কৃষ্ণের উপাসনা করতে পারেন। প্রকৃতিতে বিলীন হওয়ার বাসনা থাকলে তাঁকে 'প্রবৃত্তি'-মার্গ অবলম্বন করতে হবে। নিবৃত্তি থেকে প্রবৃত্তি ভাল। ৫৯৪-৫৯৭ পয়ারে বল্লভ সর্বোত্তম 'সখীভাব'মূলক উপাসনার কথাও লিখেছেন। ভক্ত বৈষ্ণবকে দানশীল হতে বলা হয়েছে। কবি "শান্তরতি"র উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে শান্তরতিতে কামভাব আধ্যাত্মিক অর্থে শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। "বিরহ" ভাবেও কৃষ্ণচিন্তা সুতীব্র হয়ে ওঠে।

বল্লভ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' নামক গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করেছেন। কোনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সন্ত-জীবনীর উল্লেখ তিনি করেননি। তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তির অভিন্নতা প্রমাণ করা। 'রসকদম্ব'-এর বিভিন্ন পুথি মালদহ, বগুড়া ও রংপুর জেলায় পাওয়া গেছে। সম্ভবত স্থানীয় কোনও উপসম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ ছিল এটি; হয়তো বল্লভই সেই উপসম্প্রদায় গঠন করেন। কিন্তু খেতুরি-উৎসবের পরে এই উপসম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে যায়।

৫

শ্রীকৃষ্ণকে রাধার পরকীয় নায়করূপে প্রতিপন্ন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাই রাঢ়ে-বঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের অপরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক হলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁদের তত্ত্বাচার্য বলে ভাবতেন। বহু সহজিয়া নিবন্ধ রচিত হয়; অনেক নিবন্ধ বাঙ্গালা গদ্যেও রচিত হয়। গদ্যের নমুনা :[৬]

> শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব।
> আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল।
> তত্ত্ব বস্তু হৈতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চআত্মা। একাদশেন্দ্র।
> ছয় রিপু। ইচ্ছা। এই সকল যেক যোগে ভাণ্ড হইল।

গদ্যের গুণমাণ বিচার্য ছিল না। নিগূঢ় ধর্মের তত্ত্ব বাংলা গদ্যভাষায় রচিত হয়েছিল। এটাই ছিল তাৎপর্যবহ। বহু সহজিয়া পুথি পয়ারে রচিত হয়। সহজিয়া পদাবলীও আছে। বেশ কয়েকটি সহজিয়া নিবন্ধ ছিল সুরচিত। অনেক সহজিয়া গুরু যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন, এবং শিক্ষিত পাঠকদের জন্যই নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই রকম একটি সহজিয়া নিবন্ধ 'বিবর্ত্তবিলাস' গ্রন্থ।[৭] এটি

লিখেছিলেন অকিঞ্চন দাস। তাঁর গুরু ছিলেন রসিকবিহারী। রসিকবিহারীর গুরু ছিলেন রঘুনাথ। কালনা ও বাঘনাপাড়ার মধ্যে কোনও গ্রামে রঘুনাথের আখড়া ছিল। অকিঞ্চন দাস সেই গ্রামের নাম উল্লেখ করেননি।

কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সহজিয়া গুরুরা এক রকম কথা বললেও তাঁদের বিচারধারা সর্বত্র এবং সর্বদা এক ছিল না। তাঁদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল ছিল। একটি দল বামাচারী তান্ত্রিকদের খুব কাছে চলে আসে। সহজিয়া বৈষ্ণবী নায়িকা পঞ্চ 'ম'-কারভিত্তিক তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ভৈরবী হয়েছেন। তারও বিবরণ আছে।[৮] অন্য দল বৈষ্ণব উপাসনাই করতেন। 'বিবর্ত্তবিলাস'-গ্রন্থে সহজিয়া বৈষ্ণব-তত্ত্বই বিবৃত হয়েছে।

উল্লিখিত গুরু রঘুনাথের সঙ্গে এককালে কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটের সংযোগ ছিল। রঘুনাথ সহজিয়া গুরু হওয়ার পরে সে সংযোগ নিশ্চিতভাবেই বিনষ্ট হয়। রঘুনাথের কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। "কেশুরিয়া"-গাছের রস লেপনে তাঁর রোগ সেরে গিয়েছিল। অকিঞ্চন দাস নিজের দীক্ষাগুরু রসিকবিহারী সম্বন্ধে কোনও তথ্য দেননি। 'বিবর্ত্তবিলাস'-এ ব্যাখ্যাত তত্ত্ব আসলে ছিল রঘুনাথপন্থী সহজিয়া বৈষ্ণবদের তত্ত্ব। রঘুনাথ কীর্তিমান ছিলেন; কোনও এক মহিলাকে অথবা "প্রকৃতি"কে "প্রেম" দিয়ে তিনি পাগল করে দেন। তারপরে "প্রেম কাড়িয়া লইল/ পূর্বপ্রায় যথারূপ শরীর হইল॥"[৭ক]

অকিঞ্চন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অথবা তাঁর ভাষায় 'কবিরাজ চাঁদ'-কে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। 'বিবর্ত্তবিলাস' অনেকটা 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আলোচিত কোনও কোনও তত্ত্বের সহজিয়া বৈষ্ণব ভাষ্যরূপে রচিত হয়েছিল। একটি উৎসরূপে "শিবকৃত লতাতন্ত্র" উল্লিখিত হয়েছে। 'লতাতন্ত্র', অর্থাৎ বামাচারী কৌলতন্ত্র। যে কোনও কৌলতন্ত্রই প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায়, "Practical"। কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণব নিবন্ধ সাধারণত সুস্পষ্ট হয় না। এড্‌ওয়ার্ড্‌. সি. ডিমোক 'নায়িকাসাধনাটীকা'র প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদ করেছেন; সম্ভবত 'টীকা' হওয়ার জন্যই তার ভাষা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু 'বিবর্ত্তবিলাস' দুর্বোধ্য। এখানে প্রায় একশত পঁচাশিটি প্রযৌক্তিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের অর্থ কেবলমাত্র রঘুনাথ-পন্থী সহজিয়া বৈষ্ণবদেরই সুস্পষ্টভাবে জানা ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-উদ্ভাবিত একশত প্রযৌক্তিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু এ সব শব্দেরও কোন ব্যাখ্যা নেই। অকিঞ্চন দাস প্রথমেই লিখেছেন : "বিস্তারিয়া সার অর্থ কহিতে নারিব"।

চৈতন্য স্পষ্ট কথা বলে, সহজবোধ্য সহজে গেয় নামগান নগরকীর্তন গেয়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণবভক্তি প্রচার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা প্রচারিত ভক্তির এই পরিণাম হল যে, পরিভাষা জানা না থাকলে তা বোঝা যায় না। পরিভাষার অর্থ গুরু শিষ্যকে বুঝিয়ে না বললে শিষ্যের তা বোঝার উপায় নেই। অকিঞ্চন দাস এমন কথাও লিখেছেন যে, গুরু কর্তৃক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র-দান অনেকটা যৌন সঙ্গমেরই নামান্তর :[৮ক]

শোনিত, হরিনাম হয়, শুক্র, মন্ত্রবীজ।
গুরুজিহ্বা, লিঙ্গ হয়, যোনি, কর্ণ নিজ ॥

এ তো সাংঘাতিক কথা! চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম কোথা থেকে কোথায় নেমে এল!

অকিঞ্চন দাস আমাদের জানিয়েছেন যে, চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের সহজিয়া ব্যাখ্যা করে পাঁচজন ব্যক্তি বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোবিন্দ অধিকারী এবং মুকুন্দ গোসাঁই। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্ব কোনও কোনও সহজিয়া-মণ্ডলে প্রামাণিক বিবেচিত হত। সহজিয়া ঐতিহ্য অনুসারে মুকুন্দ ছিলেন মুলতানের অধিবাসী। তিনি বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিকর হয়েছিলেন। অর্থাৎ, কৃষ্ণদাস কবিরাজই ছিলেন কালনা-বাঘনাপাড়া অঞ্চলের সহজিয়া বৈষ্ণবদের আদিগুরু; সেই আদিগুরুর মতবাদই মুকুন্দ গোসাঁই বঙ্গে এসে প্রচার করেন।

সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বকে সহজিয়া বৈষ্ণব অভ্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যাঁরা সম্পূর্ণভাবে "অকাদেমিক"-ভঙ্গিতে সহজতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা নিজেরা সহজিয়া বৈষ্ণবরূপে পরিচিত ছিলেন না। কোনও নায়িকা নিয়েও তাঁরা সাধনা করেননি। অতএব, তাঁদের ব্যাখ্যার একটা সন্দেহাতীত "অকাদেমিক" মূল্য থাকলেও, তাঁদের ব্যাখ্যা হয় আভিধানিক, নয় তা আনুমানিক।[৯] এখানে সে জন্যই 'বিবর্ত্তবিলাস'-এর ব্যাখ্যা দেওয়া গেল না। 'তারুণ্যামৃত লাবণ্যামৃত কারুণ্যামৃত স্নান', 'বাণ মারা', 'মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন', 'রাধাকৃষ্ণ দুই দেখি নাচে তিনজন', 'বিন্দুপান', 'রাধিকার রুদ্ধরেতা মন', 'ইন্দ্রিয়সমাজ', 'অটল শৃঙ্গার', 'রসের ভিয়ান', 'প্রকৃতির সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড', 'মানসিক পুরাণ', 'কায়ব্যূহ' প্রভৃতি শব্দের, এবং শব্দে বিধৃত অভ্যাসের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল না।

কিন্তু অকিঞ্চন দাস বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সম্বন্ধে, এবং চৈতন্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার উদ্ধৃতি প্রয়োজনীয়:[১০]

গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া।
গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥
শ্রীরূপ করিল সাধন মীরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণাবাই সাথে ॥
লক্ষ্মীহীরা সঙ্গে করিলা গোসাঞি সনাতন।
পিরীতি প্রেমে সেবা সদা আচরণ ॥
গোসাঞি লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে...
গৌয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম।
গোসাঞি কৃষ্ণদাস সদা আচরণ ॥
শ্যামা নাপিতানী সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞি
পরম পিরীতি কৈলা যার সীমা নাই ॥
রঘুনাথ গোস্বামী পিরীতি উল্লাসে
মীরাবাই সঙ্গে তেঁই রাধাকুণ্ডে বাসে ॥

গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোসাঞি
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই ॥
রাই রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে...
শাঠিকন্যা সঙ্গে প্রভুর সদা ব্যবহার।
ত্রিভুবনে তুলনা হে নাহিক যাহার ॥
ধন্য শাঠিকন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যার সঙ্গে মহাপ্রভু সতত বিহরে ॥

এ সব কথার আলোচনা নিন্দনাত্মক এবং নেতিবাচক হতে পারে।[১০]

সূত্রের উল্লেখ

১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, "নৃসিংহ-রচিত শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্" 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', বর্ষ-৯১, সংখ্যা-১, পৃ. ৩৩-৪২

১ক. 'সর্বোল্লাসতন্ত্রম্', পূর্বোক্ত, মূলাংশ, পৃ. ১

২. প্রেমদাস, 'বংশীশিক্ষা', দিমাইচাঁদ গোস্বামী সম্পাদিত (নবদ্বীপ, নিমাইচাঁদ গোস্বামী, তারিখ নেই)

২ক. দ্রষ্টব্য: রাজবল্লভ গোস্বামী, 'মুরলীবিলাস', নীলকণ্ঠ গোস্বামী এবং বিনোদবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত (বাঘনাপাড়া, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত, গৌরাব্দ ৪০৯, (খ্রিষ্টাব্দ ১৮৯৫)

৩. 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', পৃ. ৪৭৭

৩ক. 'সজ্জনতোষণী', (কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত। কার্য্যাধ্যক্ষ: রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, কলিকাতা), এপ্রিল ১৮৯৩: পৃ. ১৬, "...কোন কোন স্থানে কিছু কিছু এমত কথাও আছে যাহা সহজিয়া মতের পুষ্টিসাধন করে। গ্রন্থখানি সমগ্র বিচার করিলে ইহাকে সহজিয়া মতের গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না।"

৪. নয়নানন্দ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব, কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব, শ্যামচন্দ্রোদয়': এক খণ্ডে হরিদাস দাস-সম্পাদিত, (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৯); দ্বারকানাথ ঠাকুর, 'গোবিন্দবল্লভনাটকম্', হরিদাস দাস-সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৯)

৪ক. 'শ্যামচন্দ্রোদয়', পৃ. ১০৯

৫. কবিবল্লভ 'রসকদম্ব', তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)

৬. Sushil Kumar De, Bengali Literature In the Nineteenth Century (Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhayay, 1962), P. 421

৭. 'বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ: বৈষ্ণব ও ফকির সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী', শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংশোধিত (কলিকাতা, তারাচাঁদ দাস এন্ড সন্স, ৮২ নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, ৫ম মুদ্রণ, ১৩৬৪ সাল)। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীরসকদম্বকলিকা গ্রন্থ' (কলিকাতা, বেণীমাধব দে এন্ড কোম্পানী, ২৮৬, চিৎপুর রোড, তারিখ নেই); রসিকলাল চন্দ্র, "শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষা অর্থাৎ শ্রীমতী মিরাবাইয়ের কড়চা" (কলিকাতা, যুগলকিশোর চন্দ্র, সুলভ লাইব্রেরী, ১ গড়ানহাটা স্ট্রীট, তারিখ নেই); মহামহোপাধ্যায় নরোত্তম দাস, 'শ্রীরাধারসকারিকা' (কলিকাতা, বেণীমাধব দে এন্ড কোং, ১২ জয় মিত্র স্ট্রীট, ১৩৩৬ সাল); গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী-সঙ্কলিত ও সংশোধিত, 'রাগময়ীকণা বা রাগতত্ত্বনিরূপণ' (কলিকাতা, যুগলকৃষ্ণ চন্দ্র, কার্ত্তিকচন্দ্র ধরের কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১ নং গড়ানহাটা স্ট্রীট, তারিখ নেই); রসিকচন্দ্র দাস, 'অথ রসতত্ত্বসার' (কলিকাতা, বেণীমাধব দে এন্ড কোম্পানি, ১৩৩৫ সাল); 'যোগসারতন্ত্র', অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব (কলিকাতা, সীতানাথ রায় এন্ড সন্স, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, তৃতীয় সং, ১৩২৯ সাল); Rahul Peter Das, "Problematic Aspect of the Sexual Rituals of the Bauls of Bengal", *Journal of the American Oriental Society* 112 (1992)

৮. বিমলেন্দু চক্রবর্তী, 'সাক্ষাৎকারে ভৈরবী সাধিকা' (কলিকাতা, চারুবাক্ ১৯৮০), পৃ. ৪৪-৬২, ৬৩-৮৭, ১০৮-১৩৫

৮ক. 'বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ', পৃ. ১১২-১১৩

৯. এ ধরনের মূল্যবান আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, পরিতোষ দাস, 'চৈতন্যোত্তর চারিটি সহজিয়া পুথি' (কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৩২) ; সুধীর চক্রবর্তী, 'বাংলা দেহতত্ত্বের গান' (কলিকাতা, ১৯৯০) ; শক্তিনাথ ঝা, 'ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল শিল্প' (কলিকাতা, সংবাদ, ১৯৯৫)। শেষোক্ত লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে, কয়েকজন বাউল তাঁকে "সন্তান স্নেহে...লৌকিক সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিয়েছিলেন"।

১০. 'বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ', পৃ. ১০৬-১০৮ ; প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, 'শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষা অর্থাৎ শ্রীমতী মিরাবাইয়ের কড়চা', পৃ. ৫, ১৮-১৯

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব গুরুবাদ এবং তার বিভিন্ন মাত্রা ও তাৎপর্য

ভক্তির অভ্যাসে জাতির বিচার ও পৌরোহিত্য অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু মহান্ত এবং গুরুগণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে আটজন প্রধান মহান্ত চৌষট্টিজন মহান্তের পরিচালক ছিলেন। প্রধান মহান্তগণ ছিলেন স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ। এই প্রসিদ্ধ মহান্তদের এবং তাঁদের চৌষট্টি পার্ষদদের ভোগ দেওয়ার বিধিও নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রধান মহান্তদের জাতবিচার করা হয়নি। বলা হয়েছে[১]

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥
শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন ভাগবত জানিহ সংসারে।

কৃষ্ণের ভজন যে করে, তার জাতির বিচার না করা হলেও, বলা হয়েছে যে বৈষ্ণব গুরুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরুই শ্রেষ্ঠ :[২]

মহা ভাগবত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সুব্রাহ্মণ।
সকল বর্ণের গুরু বেদের লিখন॥
ইনি সর্বলোক মধ্যে শ্রীহরির ন্যায়।
পূজনীয় সদাকালে কহিনু তোমায়॥
অতএব নিজশ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু করিবে নিশ্চিত॥

এ সব কথা বলার একটা সুস্পষ্ট প্রেক্ষিত ছিল। চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনে সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের ও বৈদ্যদের প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাযুজ্য প্রমাণ করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি বড় ভাগ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। পদাবলীর সংস্কৃত টীকা পর্যন্ত রচিত

হয়েছিল। যাঁরা সংস্কৃত জানতেন, তাঁরাই হলেন অগণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে মাননীয় শিষ্টবর্গ। এই বিশেষ বর্গে অবশ্যই সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদের প্রাধান্য ছিল।

চৈতন্য থেকে শুরু করে সমস্ত বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক রাজাদের, জমিদারদের, ভুইঞাদের, উচ্চপদস্থ আমলাদের বৈষ্ণবধর্মে আকর্ষণ করেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বীর সম্ভবত বাগদি-জাতীয় ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি 'চৈতন্যদাস'রূপে বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত হলেন। রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ আমলা বৈষ্ণবধর্মের পরিশীলিত সংস্কৃত রূপের পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁরা pedestrian অথবা 'পথচারী' বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁরা বৃন্দাবনে উদ্ভাবিত "গোস্বামী শাস্ত্র"-এর সমর্থক ছিলেন। এইরূপ বৈষ্ণব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমস্ত জোর এসে পড়ে ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধাচারের উপরে; এই শুদ্ধাচারই বিভিন্ন ভাবে কীর্তিত হয়েছে। নরোত্তম দত্তের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-র একটি কবিতার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:[৩]

> ধর্মাচরণের নিমিত্তই যাঁহারা জীবনধারণ করেন, পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তই যাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন, এবং বিপ্রসুখার্থেই যাঁহারা রন্ধন করেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

বৈষ্ণব সমাজে 'বিপ্র'-জাতীয় বৈষ্ণবদের প্রাধান্য যখন প্রশ্নাতীত, তখন অব্রাহ্মণ, অথচ অভিজাত এবং ধনী বৈষ্ণবরা বৈষ্ণবাচার পালনের দ্বারা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, অথচ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—এমন গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু দীক্ষিত বৈষ্ণবের জাতি-পরিচয় কী? সম্ভবত এ প্রশ্ন বৃন্দাবনে তোলা হয়েছিল। বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে 'হরিভক্তিবিলাস'-রচয়িতা গোপাল ভট্ট গোস্বামী, এবং তাঁর ভাষ্যকার সনাতন গোস্বামী সিদ্ধান্ত করলেন:[৪]

> ১. অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। (অর্থাৎ, বৈষ্ণবকে বিপ্রের সহিত একত্র গণনা করিবে]
>
> ২. ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। ... অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং...
>
> (অর্থাৎ, এইভাবে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সাম্য স্থির হইল...অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের হইতেও নীচজাতিজাত বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠতা স্থির হইল)

খ্যাতনামা পণ্ডিত এম. এন. শ্রীনিবাস sanskritization অথবা সংস্কৃতকরণের তত্ত্ব বহুকাল পূর্বে প্রচার করেছিলেন।[৫] বহু ব্যবহারে তত্ত্বটি এখন কিছুটা বিবর্ণ হলেও, অন্তত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ 'সাম্য'তত্ত্ব তার আলোকে বেশ কিছুটা পরিষ্কার হয়। সনাতন গোস্বামীর ভাষায় "নীচজাতিজাত" বহু ধনী এবং অভিজাত ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে, এবং সে ধর্মের ব্রাহ্মণ্যতানিষিক্ত আচারানুষ্ঠান পালন করে এটাই প্রতিপন্ন করলেন যে, অন্তত তাঁদের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত বিধিনিষেধ গ্রাহ্য বিবেচিত হবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অনেক মাত্রা সহ এক নব ব্রাহ্মণ্য

মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে শূদ্র শিষ্টবর্গ ব্রাহ্মণ শিষ্টবর্গের সমান হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করলেন, এবং প্রায় সর্বত্রই সাফল্য অর্জন করলেন। ব্যাপক sanskritization-এর এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ এবং কায়স্থ নরোত্তম দত্ত 'ব্রাহ্মণ'রূপে পরিচিত হলেন। বহু ব্রাহ্মণ তাঁদের শিষ্য হয়েছিলেন।

এমনও দাবি করা হল যে, "বৈষ্ণব"ও একটি স্বতন্ত্র "বর্ণ", যা ব্রাহ্মণ-"বর্ণ"-থেকে শ্রেষ্ঠতর। "এই বৈষ্ণব স্বতন্ত্রবর্ণ-নিজের দ্বারাই নিজে শাসিত ও পরিচালিত।"[৬] মেদিনীপুরে অবস্থিত গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দী শ্রীপাট থেকেই সম্ভবত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমতার তত্ত্ব প্রচারিত হয়। লক্ষণীয়, গোপীবল্লভপুর-শ্রীপাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, "অষ্টাদশ রাজবংশ ও শতাধিক জমিদার বংশ ও শত সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বংশ"।[৭] এঁদের অব্রাহ্মণ শূদ্ররূপে চিহ্নিত করা যে বাঞ্ছনীয় ছিল না, গোপীবল্লভপুরের গুরুদের তাই ছিল সুদৃঢ় মত।

২

লক্ষণীয়, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমতার তত্ত্ব উচ্চারিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে দুই-চারটি ব্যতিক্রম-সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুরুদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া হয়। বিখ্যাত ব্যতিক্রম ছিলেন কয়েকজন অব্রাহ্মণ 'প্রধান' মহান্ত (যেমন, রামানন্দ বসু, বাসুদেব ঘোষ) এবং অবশ্যই শ্যামানন্দ আর নরোত্তম দত্ত। যাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁদের আলাদা করে দেওয়া হল। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গুরু বিশ্বম্ভরানন্দদের গোস্বামী লিখেছিলেন: "বৈষ্ণব ইচ্ছা করিলে...উপবীত ধারণ করিতে পারেন। সে জন্য নিত্যতাও নাই, নিষেধও নাই..."[৮] এখানে "বৈষ্ণব" শব্দটির অর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

কিন্তু গোপীবল্লভপুরের এই ঐতিহ্য সম্ভবত সর্বত্র প্রচলিত হয়নি। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কৌলীন্য-প্রথাকেও সমর্থন করেন। 'প্রেমবিলাস'-এর 'সন্দেহজনক' চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে কৌলীন্যের বিবরণ যথেষ্ট অর্থবহ। সেখানে এই তথ্য আছে যে, কুলীনদের 'মেল'-বন্ধনের স্রষ্টা দেবীবর ঘটক বীরভদ্রের শিষ্য ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত এবং 'ভক্তিরত্নাকর'-এ উল্লিখিত ঐতিহ্য অনুসারে কৌলীন্য-প্রথার সমর্থক বীরভদ্র 'কায়স্থ'-গুরু জয়গোপাল দাসকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে অপাংক্তেয় ঘোষণা করেন। অথচ, জয়গোপাল খুব ভাল গুরু ছিলেন; তাঁর বর্ণনা এই রকম:[৯]

> স্নিগ্ধ সুবলিত তনু রসে ঢলঢল জনু
> শ্যামলবরণ অনুপাম।
> বদন রিমল ইন্দু যেন অমিয়া সিন্ধু
> শ্রীজয়গোপাল দাস নাম॥
> মলয়জ পরিমলে তিলক অলক ভালে
> এ হরিমন্দির মনোহর।

বুক বাঞা অনিবার বহে প্রেম জলাধার
পুলক অঙ্কুর কলেবর॥
পরিধান শুক্ল বস্ত্র বিচারেন ভক্তিশাস্ত্র
নির্মাল্য চন্দনমালা অঙ্গে...

এই তথ্য থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, রাঢ়ে বঙ্গে সর্বত্র সমানভাবে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সাম্যতত্ত্ব মানা হয়নি। বৃন্দাবনে উদ্ভাবিত হলেও এই তত্ত্ব শ্যামানন্দী বৈষ্ণবগণ যে ভাবে অভ্যাসে স্পষ্ট করেন, রাঢ়ে বঙ্গে সর্বত্রই তা সেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার একটা বড় কারণ ছিল প্রথমাবধি স্মার্ত ব্রাহ্মণদের অপ্রতিহত বৈষ্ণববিদূষণ, বৈষ্ণবদের সমালোচনা। অনেক ব্রাহ্মণ জমিদার গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মের খাতিরে শূদ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের স্তরে নেমে আসতে চাননি। তাঁদের ব্রাহ্মণাচার অব্যাহত ছিল।

৩

রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে লিখেছিলেন : ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্, নৈবাভ্যসেদ্বহূন্॥ [১০] অর্থাৎ, বেশি শিষ্য করবেন না, বেশি বই পড়বেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছিলেন : [১১]

অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে॥

কিন্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ পালন করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নির্দেশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মদনগোপাল গোস্বামী লিখেছেন : [১২]

> বহু শিষ্য না করিবে—অর্থাৎ অযোগ্য বহু শিষ্য করিবে না ; অন্যথা শিষ্য না করিলে ভক্তিসম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যায় ; অর্থাৎ স্ব সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য অনধিকারী শিষ্য সংগ্রহ করিবে না। বহু গ্রন্থ—অর্থাৎ ভগবদ্বহির্মুখ বহু গ্রন্থ। কলা-নাট্যাদি অর্থাৎ ভগবদ্বহির্মুখ নাট্যাদি...

এই মত অনুসারে বহু শিষ্য অবশ্যই করা যায় ; তবে "অনধিকারী" বহু শিষ্য করা যায় না। শিষ্যত্বের "অধিকার"-এর বিচার করার অধিকার গুরুকে দেওয়া হল। নিত্যানন্দ 'বণিক'-দের উদ্ধার করলেন। তাঁর পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়াদের বৈষ্ণব করলেন। নরোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণজাতীয় ডাকাতদের বৈষ্ণব করলেন। অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার বৃন্দাবনী ভাষ্য যে গুরু মানতেন, তাঁর বহু শিষ্য করার অধিকার ছিল ; বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুদের সে অধিকার ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানা নেই। বহু গরিব মানুষও তাঁদের শিষ্য হয়েছিলেন, এবং এখনও হয়ে থাকেন। যে যেমন পারেন, তেমন গুরুদক্ষিণা দেন। উনিশ শতকের শেষে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : ...some of them have almost princely incomes from the contributions of their

disciples... ব্রিটিশ সরকার নবদ্বীপের কোনও কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আখড়া থেকে বার্ষিক চল্লিশ পাউণ্ড আয়কর আদায় করত। [১৩]

কিন্তু সব গুরুই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন না। পঞ্চোপাসক ব্রাহ্মণগণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁদের অবজ্ঞা এবং ঘৃণা করতেন। 'কিশোরী ভজন'-নামক সম্প্রদায় শ্রীহট্টে এবং ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে কিছুটা জনপ্রিয় ছিল। শ্রীহট্টে রঘুনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর বন্ধু ও শিষ্য শ্যামকিশোর ঘোষ 'কিশোরীভজন'-গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। বিক্রমপুরে দুইজন গুরু প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তাঁরা হলেন ফুরশাইল গ্রামের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার এবং ইছাপুরা গ্রামের শশিমোহন স্মৃতিভূষণ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন খ্যাতনামা স্মার্ত পণ্ডিত। 'কিশোরীভজন' সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রকারভেদ মাত্র ছিল। এই ধরনের উপাসনায় তান্ত্রিক প্রভাবও পড়েছিল। কৌল তান্ত্রিকরা 'কুমারীপূজা'-র তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান প্রচলিত করেন।

রাঢ়ে-বঙ্গে নিম্নজাতির লোকদের মধ্যে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীতে যাঁরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সকলেরই অর্থের লোভ ছিল না। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টে বৈষ্ণবদের সংখ্যা ছিল ৫,৬০,৩৭৯। [১৪] সাধারণ বৈষ্ণব গুরুরাই সেখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। সেখানে জগন্মোহনী বৈষ্ণব সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপীনাথ গোস্বামীর শিষ্য জগন্মোহন গোস্বামী। এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু কৈবর্ত-জাতীয় রামকৃষ্ণ গোস্বামী বিথংগল গ্রামে একটি বিশাল আশ্রম নির্মাণ করেন। এটা সপ্তদশ শতকের ঘটনা। এক সময়ে এই আশ্রমের বার্ষিক আয় ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। রামকৃষ্ণ গোঁসাই ধর্মীয় বিভেদ মানতেন না। তিনি সুদূর আজমীরে গিয়ে খ্বাজা মইনউদ্দীন চিস্তির সমাধিতে ফুলমালা দিয়েছিলেন। বিথংগলের বৈষ্ণবরা চৈতন্যকে পরমগুরুরূপে শ্রদ্ধা করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি।

শ্রীহট্টে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মও ছিল। তার স্বরূপ উদ্ধৃত গান থেকে বোঝা যায়। গানটির রচয়িতা বাউল কবি রাধামোহন : [১৫]

মাইয়া [স্ত্রীলোক] কৃষ্ণভজনের মূল।
মাইয়ার প্রেমপাথারে সাঁতার দিয়ে
অনায়াসে মিলবে কূল।...
মাইয়া যার পানে চায় আড় নয়নে
তার কি রাখে জাতিকূল।
তুমি সহজ মাইয়ার সঙ্গে কর
শ্রীরাধারমণের কূল॥

সময়টা গুরুবাদী সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভবের অনুকূল ছিল। মুঘল যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত কালে 'উপভোগ' করত যারা, এবং যারা 'উৎপাদন' করত, তাঁরা সকলেই গুরুবাদকে সমর্থন করেছে, গুরুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। বৈষ্ণবগুরুদের 'বৈষ্ণবোত্তর' জমি দেওয়া হয়েছে। তখন পরিব্যাপ্ত কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির, এবং বিশেষভাবে বস্ত্রশিল্পের অসামান্য সমৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গুরুদেরও প্রণামী ও দক্ষিণা লাভ সহজ ছিল ; পরে যখন ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নব্যধনীরা প্রচুর পরিমাণে ধনসঞ্চয় করল, তখনও তাঁরা গুরুদের প্রচুর পরিমাণে প্রণামী ও দক্ষিণা দিয়েছেন। ম্যাক্স বেবর লিখেছেন :[১৬] The increasing number of small burghers and the proletarian masses, and the increase of wealth among the burgher strata of the cities raised the chances of fees of the guru demagogues who were orientated towards them. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বঙ্গে নাগরিকবর্গ সমৃদ্ধ হয়েছিল ; রাজা রামমোহন রায় তা লক্ষ করেন।[১৭] মুগল যুগে বাঙালি ধনীদের আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছিল। তপন রায়চৌধুরীর মতে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না।[১৮] বৈশ্যজাতীয় ধনী কৃষকগণ বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংখ্যাতীত ধরণের ধান বঙ্গের উর্বর জমিতে উৎপাদিত হত ; তাই আবুল ফজল লিখেছিলেন : If a single grain of each kind were collected, they would fill a large vase.

একদিকে সমৃদ্ধি, অন্য দিকে অপচয়। রানী ভবানী ধর্মের প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। গ্রামে গ্রামে অর্থশালী ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর, শিবের, কালীর, কৃষ্ণের মন্দির তৈরি করেন।[১৯] ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও তখন গ্রামাঞ্চলে সাধারণ রায়ত-প্রজাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের মত প্রতিভাশালী কবিকে অত্যাচারে বিপর্যস্ত অবস্থায় দেশত্যাগ করতে হয়। কবি জীবন মৈত্রকে উপবাসের দুঃখ সহ্য করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধনী মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয় দুর্গতদের। তপন রায়চৌধুরী সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য বিচার করে লিখেছেন যে, বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণে বঙ্গের সমৃদ্ধির বর্ণনা থাকলেও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।[২০] রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, শাসনের ক্ষেত্রে বিবিধ দুর্বলতা, গরিবের উপর ধনীর অত্যাচার (যা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ এবং ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাস ভোগ করেছিলেন), গরিব চাষির ক্রমবর্ধমান ঋণ, তাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনযাত্রা, বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি—এসব তথ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের কোনও সন্দেহ নেই। নুনভাত, আমানি, কখনও বা একটু দই আর গুড়—এই ছিল দরিদ্র বাঙালির খাদ্য। নেশা করার মত পর্যাপ্ত অর্থ তাদের হাতে থাকত না।

এ অবস্থায় যে গ্রামে নগরে মানুষের জীবনধারায় ধর্মবিশ্বাস, গুরুপূজা একটি বিশেষ মাত্রা অর্জন করে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। উৎসব, আনন্দ

ধর্মকে কেন্দ্র করেই যখন আবর্তিত হচ্ছিল, তখন ধর্মীয় গুরুদেরও যে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে, তাতেও কোনও সন্দেহ থাকে না।

৫

সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতকে এমন পরিস্থিতিতেই বহু গুরুবাদী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। তাদের বিবরণ এইরূপ :[২১]

কিশোরীভজা ভজন খাজা কত বলি হায়।
গুরুভোগী গুরুত্যাগী আরও যে বাহিরায়॥
অসীমাত্যজা, প্রণতিমজা, আর বাসুদেবী খল।
দারী সন্ন্যাসী, শিষ্যাবিলাসী, গুরুপ্রসাদী দল॥
উপনয়নত্যজা, পরমহংস সাজা, সঙ্করবর্ণ যত।
অসৎসঙ্গ দ্বিপাদভঙ্গ সেবাপরাধী মত।
নিতাই রাধা গৌরশ্যাম বলিব বা কত॥
সীতারামিয়া রাধাশ্যামিয়া শাউড়ির দল আর।
ঘরপাগলা গৃহীবাউলা সব চিনে উঠা ভার॥
বর্ণবিরাগী আশ্রমরোধী গৈরিকবিরোধী ষণ্ড।
ধামাপরাধী নামাপরাধী বৈষ্ণবাপরাধী ভণ্ড॥
অদ্বয়বাদী মধ্ববিরোধী এসব পাষণ্ড।
কানুপ্রিয়া নাথভায়া অকালকুষ্মাণ্ড॥
গৌড়েশ্বর বংশীধর উলাইচণ্ডী বাদ।
স্মরণপন্থী অধোমন্থী যুগলভজন সাধ॥
দাদা ও মামা ক্ষেপা বামা আর যত অপসম্প্রদায়।
দেশবিদেশে সাধুর বেশে ঘুরছে ফিরছে হায়॥

বর্ণানুক্রমিকভাবে সম্প্রদায়গুলির নাম : অদ্বয়বাদী, অসীমত্যজা, আউল, আশ্রমরোধী, কর্তাভজা, কালীকুমারী, কানুপ্রিয়া, কিশোরীভজন, খুসিবিশ্বাসী, ক্ষেপাবামা, গুরুপ্রসাদী, গৌরবাদী, গৌরশ্যাম, গৃহীবাউল, গৈরিকবিরোধী, গৌরেশ্বর, গোবরাই, ঘরপাগলা, চূড়াধারী, চরণপাখী, জগন্মোহনী, দর্পনারায়ণী, দররেশ, দারীসন্ন্যাসী, নরেশপন্থী, নাথভায়া, নিতাই বাধা, নেড়া, পরমহংস, প্রতাপচাঁদী, বর্ণবিরাগী, বলরামী, বংশীধর, বাউল, বাওলা, বামকৌপীন, রাতভিখারি, রাধেশ্যাম, রামদাস, রামবল্লভী, যাদুরাই, যুগলমিলন, শম্ভুচাঁদী, শিষ্যাবিলাসী, সহজ, সখিভাবক, স্পষ্টদায়ক, সাঁই, সাহেবধনী, সীতারাম, স্মরণপন্থী, সাধ্বীপন্থী, হরিবোলা, হজরতি, হরিদাসী।

উপরে উদ্ধৃত ছড়ায় এ সব সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। গোড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্বন্ধেও কটূক্তি করা হয়েছে :[২২]

পেট-নাদড়া, পুঁজিপড়া, মাগমরা, যমে পোড়া।
মাগীর তাড়া, জাতির হুড়া, এ ক' বেটা বৈষ্ণবের গোঁড়া॥

এ সর অবলুপ্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উনিশ শতকেও ছিল ; অক্ষয়কুমার দত্ত কয়েকটি সম্প্রদায়ের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল এই যে, বাঙালার বহু প্রশংসিত উনিশ শতকীয় "র‍্যনেশাঁস" এই "গৌণধর্ম"-এর মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসংস্কৃতির বিদগ্ধতা উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভক্তির অন্তর্নিহিত উদ্ধারণতত্ত্ব তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের শাসকশ্রেণী ইসলাম অথবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ; গ্রাম-নগরের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুস্তর সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ; যোগাযোগ ব্যবস্থা অনাধুনিক ; পথঘাট বিপদসঙ্কুল ; গ্রামজনপদসমূহ বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থার এইরূপ অবস্থায় মানুষ কালী, কৃষ্ণ, মঙ্গলচণ্ডী, শনি, শীতলা, ধর্ম, মনসা, শিব ও গুরুর শরণ নেয়। গুরু মন্ত্র দিয়ে রক্ষা করেন, দীক্ষা দিয়ে শক্তিশালী করেন, ঔষধ, তাবিজ, কবচ দিয়ে মনোবল বৃদ্ধি করেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে দণ্ডাত্মিকা লীলার স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনে নিমগ্ন নিষ্ঠাবান সুশিক্ষিত সুসংস্কৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুজনদের বিশেষ কোনও ভূমিকা পালনের প্রমাণাভাব। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বাস্তব জীবনের অনুষঙ্গ তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ উদ্ধারকর্তা যে গুরু, তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাই বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করেছিলেন।

সকলেরই গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। যে কেউ ফকির হতে পারতেন। মা, শাশুড়ি, বউ, দাদা, সকলেই গুরু হতেন। কুলগুরুগণ প্রযোজন হলেই শিষ্যবাড়িতে যেতেন। বড় বড় শ্রীপাটে শিষ্যশিষ্যারা আসতেন। গুরুগিরি একটি ভাল পেশা ছিল। কিন্তু গুরুপূজাকে কেন্দ্র করে যে ভাবে বৈষ্ণব ধর্মে ফাটল ধরল, সে ভাবে শৈব-তান্ত্রিক ধর্মে কোনও অঘটন ঘটেনি। তান্ত্রিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু কৌলাচারের প্রভেদ মেনে নেওয়া হয়, এবং তা চৌষট্টি তন্ত্রে প্রতিফলিত হয়। অথচ, প্রভিন্ন কৌলাচারই তান্ত্রিক ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের মধ্যে মৌলিক বিভিন্নতা ছিল। কোনও কোনও বৈষ্ণব ছিলেন পঞ্চোপাসক। কেউ কৃষ্ণের "স্বকীয়ালীলা"-র তত্ত্ব মানতেন। যাঁরা 'পরকীয়া'-বাদী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একদল সেই লীলার স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনেই বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিন্তু অন্যান্য বহু দল ও গোষ্ঠী "পরকীয়া"-তত্ত্বকে বাস্তবে "নায়িকাসাধনা"তে রূপান্তরিত করেন। তারই দুর্নিবার পরিণতি ছিল "চূড়াধারী", "বাউল", "বাওলা", "শিষ্যাবিলাসী", "কিশোরীভজন", "সহজ", "গুরুপ্রসাদী" প্রভৃতি গুরুবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব। আউল বাউলরা বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সঙ্গে সূফী-তত্ত্ব মিশ্রিত করতে চাইলেন। সংরক্ষণশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনও সংগঠন ছিল না। বহু শ্রীপাট গঠিত কিংবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। বৃন্দাবনের মতবাদ গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই তা বুঝতেন কি না, কিংবা সমানভাবে মেনে চলতেন

কি না, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা সহজিয়া বৈষ্ণবদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য কোনও চেষ্টা করেননি। সহজিয়া বৈষ্ণবরা স্বাধীনভাবে চৈতন্যের, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের, কৃষ্ণদাস কবিরাজের, নরোত্তম দত্তের নাম ব্যবহার করে তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে কোনও জাতির বিচার আদৌ ছিল না ; বিক্রমপুরের শশিমোহন স্মৃতিভূষণের মত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শূদ্রা শিষ্যাদের সঙ্গে কিশোরীভজন ধর্ম পালন করেছেন। তান্ত্রিক ভৈরবীচক্রে "পঞ্চমকারাত্মক" অনুষ্ঠান যাঁদের পছন্দ হয়নি, তাঁরা মদ্যমৎস্যমাংস ও মুদ্রাবিহীন নিরামিষ সহজিয়া নায়িকা সাধনাই পছন্দ করেন। কিন্তু কালক্রমে সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনসঙ্গিনীও তান্ত্রিক ভৈরবীচক্রে যোগ দিতে থাকেন।[২৩] ফলত বৈষ্ণবীয় বামাচার বদ্ধমূল হয়ে উঠল। ভক্তির সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণে বৈষ্ণব ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাতে সুপ্রাচীন ভারতীয় দেবতা বিষ্ণু শেষ পর্যন্ত দিগন্তে মিলিয়ে গেলেন ; অমাবস্যায় অসংখ্য "চাঁদ"-এর উদয় হল, এবং এই আজগুবি চন্দ্রালোকে চিত্তভ্রংশী এক রসের খেলা শুরু হল। তার ফলে বঙ্গের ধর্মীয় সংস্কৃতি বিপন্ন হল। বিপন্ন হল বঙ্গের সভ্যতা।

যেখানে অথবা যে স্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীরা সাধারণত যেতেন না, সেখানে গিয়েছেন লালন ফকির, লালনের গুরু সিরাজ সাঁই, পাবনার শম্ভুচাঁদ, কর্তাভজাদের গুরু লালশশী, বিক্রমপুরের সুধারাম বাউল, রংপুরের রূপচাঁদ গোঁসাই, ফকির পাঞ্জ শাহ্ এবং ঠাকুর হরিচাঁদ, 'মতুয়া'-সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। প্রসঙ্গত এ তথ্যও উল্লেখ্য যে নিম্বার্কমতাবলম্বী বৈষ্ণবদের পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। স্বয়ম্ভুরাম দেব, মথুরা দেব আচার্য, নরহরি দেব আচার্য বর্ধমানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্ধমান জেলার উখরা সহরে, মেদিনীপুর জেলায় চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুরে, বীরভূমে কেঁদুলীতে এবং গোপীনাথপুরে, বাঁকুড়া জেলায় ইঁদাসে, চুঁচুড়াতে, উত্তর চব্বিশ পরগণায় সদাচারী নিম্বার্কবাদী বৈষ্ণবদের আশ্রম ছিল।

অজ্ঞাত বৈষ্ণবরা বাইতি, ভুঁইমালি, ধোবা, দোয়াই, ডোম, গঁড়ি, জেলে-কৈবর্ত, মালো, কাঁদুরা, কুপোদ, রাজওয়ার, শুঁড়ি, তিয়র প্রভৃতি তথাকথিত নিম্ন জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। কোনও কোনও গোসাঁই যৌনকর্মীদেরও মন্ত্র দিয়েছেন। পাদ্রি ওয়ার্ড লিখেছিলেন :[২৪] At Calcutta nearly all the women of ill-fame profess the religion of Choitunyu before their death, that they may be intitled to some sort of funeral rites. ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে মেছুয়া বাজারের ইসলাম ধর্মাবলম্বিনী শ্রীমতী কুব্জী বাই উইল্ করে গয়াতীর্থে এবং জগন্নাথে একশত টাকা দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রাচীন উইল্-এর সাক্ষী ছিলেন মেছুয়াবাজারের শ্রীমতী নিমি খান্‌কি, শ্রীমতী আনন্দী কস্‌বি, এবং শ্রীমতী শ্রীমতী গোয়ালিনী। সোনাগাছির গোলোকমণি রাঢ় গয়াধামে কাশীধামে

বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রার পূর্বে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে একটি উইল করেন; তাতে বলা হয়েছিল যে, অন্যান্য দেবদেবীদের সঙ্গে যেন বড়তলার ঈশ্বরজীউকে পঁচিশ টাকা, বাগবাজারের মদনমোহনকে পাঁচটাকা, পুরীর জগন্নাথকে ত্রিশ টাকা, খড়দহের শ্যামসুন্দরকে দশ টাকা, এবং বৃন্দাবনের গোবিন্দজীউকে দশ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের চন্দ্রমণি রাঢ় গুরুদেব ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র গোস্বামীর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে একটি উইল করেন।[২৫] গণিকাদের বৈষ্ণব ধর্মে রুচি দেখে যাঁরা কটাক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সমাজতাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কিন্তু তাঁরা এটা দেখলেন না যে, এই মেয়েরা তাঁদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মকেই অবলম্বন করে পবিত্রতার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রভু জগদ্বন্ধুর মতো প্রসিদ্ধ মহাত্মা গণিকাপল্লীর, মেথর-মুর্দাফরাস পল্লীর পথে পথে হরিনাম কীর্তন করে চৈতন্যের, নিত্যানন্দের আদর্শ পালন করেছেন।

যে সব বৈষ্ণব বাবাজীরা দরিদ্র, পতিত, অচ্ছুৎ, বেশ্যা, মুচি-মুর্দাফরাসকে বৈষ্ণব দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যে কেবলমাত্র অর্থের লালসায় তা করেছিলেন, এমন বলা যায় না। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে, কর্তাভজাদের দলে, নিম্নবর্গীয় একাধিক সম্প্রদায়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় স্বাধীনতার চেতনা সুস্পষ্ট ছিল। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মূল্যবোধকে তাঁরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিলেন। বিলেত থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা এদেশে আসার আনেক আগে নরোত্তম দাসের নামে প্রচারিত 'স্বরূপ কল্পতরু'-তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা হয়েছিল :[২৬]

জগৎ জাকে মাতা বলে আমি বলি বাপ।
জগৎ জাকে পূজ্য বলে আমি বলি পাপ॥
জগৎ জাকে ভাল বলে আমি বলি মন্দ।
জগৎ জাকে মন্দ বলে সে মোর আনন্দ॥
জগৎ জাকে ধর্ম বলে সে মোর অধর্ম।
জগৎ জাকে অধর্ম বলে সে মোর ধর্ম॥
জগৎ জাকে গ্রাহ্য করে সে মোর অগ্রাহ্য।
জগৎ জাকে অকার্য বলে সে মোর আর্য্য॥

নিম্নবর্ণে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে 'মা গোঁসাই'-এদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন, এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন। তাঁদেরও অপবাদ সহ্য করতে হয়।

নিম্নবর্গের বৈষ্ণব গুরুরা শুধু মন্ত্রই দিয়েছেন। যাঁরা মন্ত্র পেয়েছিলেন, তাঁদের কিছু নিয়মবিধি অবশ্যই পালন করতে হত। কিন্তু তাতে তো সামগ্রিকভাবে তাঁদের সমাজের ও জীবনের কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকদের লক্ষ্য ছিল না। আবার এটাও অনস্বীকার্য যে কতগুলো ক্ষেত্রে বৈষ্ণব "রসতত্ত্ব" এক ধরনের দৌশ্চারিত্র্যের মৌল কারণ হয়ে উঠেছে। তার একটি বিবরণ এমন বিশদ যে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত না করে

থাকতে পারা গেল না।[২৭] সখীচরণের কথা :

একবার ওনাতে আমাতে উত্তর দেশে যেতে যেতে একদিন শিষ্যিবাড়িতে পৌঁছিতে না পেরে পথের মাঝে এক মুদিখানায় থাকলাম, রাত্রিতে উনিও যে ঘরে শুলেন, আমিও সেই ঘরে শুলাম। মা গোঁসাই আমাকে বললেন বাছা সখীচরণ আমার চরণ দুটো বড় দরজ কোচ্চে, তুই না কি একটু তেলটেল দিতে পারিস ! আমি বোল্লাম পারব না কেন মা গোঁসাই আচ্ছা দিচ্ছি এই বোলে আমি তেলের বাঁশা থেকে তেল বের কোরে ওনার চরণতলে বোসে তেল দিতে লাগলাম...উনি বোল্লেন ও ভাল হোচ্চে না, একটু সোরে এসে ভাল করে দে...তখন উনি বোল্লেন সখীচরণ তুই বৃন্দাবন দেখিছিস তাতেই আমি বোল্লেম কই না...মা গোঁসাই বোল্লেন...ঐখানেই গুপ্তবৃন্দাবন আছে...উনি বোল্লেন দেখলি !...দেখলি তো পরিক্রিমা কর্ আমি বোল্লাম মা গোঁসাই পরিক্রিমা কেমন কোরে করে তা তো আমি জানি না, উনি বোল্লেন রোস্ তবে আমি দেখাই...সনাতন কোই তা নৈলে কি বৃন্দাবন পরিক্রিমা হয়...

সূত্রের উল্লেখ

১· প্রধান মহান্তদের তালিকা : 'শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পূর্বে উক্ত, পৃ. ৬৬৪-৬৬৬ ; উদ্‌ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য, তদেব পৃ. ৫৬৬

২· রামচন্দ্র গোস্বামী, "পাষণ্ড দলন", 'শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পৃ. ৫৫৪ ; জয়ানন্দ লিখেছিলেন : "বিশেষ ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব হয়। গজেন্দ্রদশন যেন হেমে-বান্ধা রয়॥" 'চৈতন্যমঙ্গল', পৃ. ৩

৩· 'শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পৃ. ৩২৩

৪· মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস : বৈষ্ণববিবৃতি' (আলাটী, জেলা হুগলী, সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত, ২য় সং, ১৩৩৩ সাল) পৃ. ২০২-২০৩, উদ্‌ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৫· দ্রষ্টব্য : M.N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Bombay, Orient Longman Limited, 1982), Ch. I: "Sanskritization", pp. 1-45

৬· মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, উপরে উক্ত, দ্রষ্টব্য : দশম উল্লাস, পৃ. ১৯১-২২০

৭· তদেব, পৃ. ২৫৩

৮· তদেব, পৃ. ২৫৩

৯· সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ৩য় সং, ১৯৭৫), পৃ. ২৬

১০· রূপ গোস্বামী, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ৫ম সং, ১৯৩৩) পৃ. ৮৬, পূর্বলহরী ২ : ৫১

১১· চৈ. চ, পৃ. ৫৪২

১২· তদেব, পৃ. ৫৪২

১৩· Yogendranath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, pp. 367, 368

১৪· *Report on the Census of Assam*, 1901, ch. IV. p. 41

১৫· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'রাধারমণ গীতিসংগ্রহ' (কলিকাতা, সরস্বতী বুক ডিপো, ১৯৮৮), পৃ. ৪০৪-৪০৫

১৬· Max Weber, *The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism* Translated and ed. Hans H. Gerth, Don Martindale [Free Press of Glencoe, 3rd Printing, 1962), p. 335

১৭· প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭২) পৃ. ২৫৮-৫৯

১৮· Tapan Raychudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir: An Introductory Study In Social History* (Delhi' Munshiram Monoharlal, 2nd Impression, 1969), part II, ch. V, pp. 192-209

১৯· Hitesh Ranjan Sanyal, "Temple Promotion and Social Mobility in Bengal", D.P. Chattopadhyay ed. *Essays In Honour of Professor Niharranjan Ray* (Calcutta, K.P. Bagchi Co. 1976), p. 362.

২০· Tapan Raychaudhuri, উপরে উক্ত, p. 209

২১· নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী, বিদ্যারত্ন 'বৈষ্ণবব্রতদ্বিননির্ণয়' (সংবৎ ১৯৩১), পৃ. ৫১-৫২ ; ননীগোপাল গোস্বামী, 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' পৃ. ১৬৩-২০১ ; VIB, p. 349; সুধীর চক্রবর্তী, 'গভীর নির্জন পথে' (আনন্দ পাবলিশার্স লি. কলিকাতা ১৯৮৯) পৃ. ১৭

২২· মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, পৃ. ৩৬৮

২৩· 'সাক্ষাৎকারে ভৈরবী সাধিকা', পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৪-৬২, ৬৩-৬৭, ১০৮-১৩৫

২৪· W. Ward, *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindos* (4 Vols. Serampore, Printed at the Mission Press, 1811) Vol. II p. 262

২৫· এ সকল প্রাচীন দলিল আমাকে দেখিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট এবং অক্লান্ত ইতিহাস-অনুসন্ধানী শ্রীঅমিত রায়।

২৬· পঞ্চানন মণ্ডল, 'পুঁথি-পরিচয়', (বিশ্বভারতী, ১৯৬৩), পৃ. ৩৯২-৯৩

২৭· নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি-রচিত 'কলিকৌতুক' (শ্রীরামপুর, ১৮৫৮) থেকে উদ্‌ধৃতি : জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' (কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১) পৃ. ১১১৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাত বৈষ্ণব প্রসঙ্গ

'বৈষ্ণব' জাতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ এবং সুবিস্মৃত বিবরণ দিয়েছিলেন এইচ্. এইচ. রিজ্‌লি। তাঁর গ্রন্থে অখণ্ড বঙ্গের সমস্ত জেলার বৈষ্ণব-জাতির ১৮৭২ এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কৃত লোকগণনাভিত্তিক সংখ্যাও উল্লিখিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৈষ্ণব জাতির সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কয়েকটি সংখ্যা এইরূপ :[১]

জেলা	১৮৭২	১৮৮১
বর্ধমান	৩৭,৩৬২	২৮,৬৫২
মেদিনীপুর	৯৩,১৭৮	৮১,৮৮৮
চব্বিশ পরগণা	৩৬,৫৬৩	৩৩,৭৮৮
দিনাজপুর	১৬,৭১০	১৯,৩৪৯
রংপুর	২৪,৫৪১	২৬,৯৭৪
ঢাকা	১১,৮৮৬	১৭,২৩৯
ময়মনসিংহ	১১,৯৯১	১৮,০২৮

রিজ্‌লি লিখেছেন যে, 'জাতি' রূপে বৈষ্ণবদের "সংযোগী" এবং "বান্তাশী" বৈষ্ণব বলা হয়। একটি মত অনুসারে "আশ্রমান্তর গ্রহণের পর পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে "বান্তাশী" কহে অর্থাৎ বমন কবিয়া যে তাহা পুনরায় ভক্ষণ করে।"[২] বিভিন্ন জাতির লোকরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে জাত-বৈষ্ণব হয়ে যান। তাঁদেরও বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিন্তু বর বধূকে নিজের সাম্প্রদায়িক মন্ত্র দিলে, এবং বধূ তা গ্রহণ করলে বিবাহের বাধা থাকে না। জাত-বৈষ্ণবদের কোনও গোত্র থাকে না। কিন্তু তাঁদের পনেরটি "পরিবার" আছে, যেমন "অদ্বৈত পরিবার", "নিত্যানন্দ পরিবার", "শ্যামচাঁদ পরিবার", "জগদীশ পণ্ডিত-পরিবার" ইত্যাদি।[৩] এই জাত-বৈষ্ণব ঐতিহ্য থেকে এটাই বলা যায় যে, চৈতন্যের কালে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, নদীয়া জেলার যশড়া গ্রামের প্রখ্যাত বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, গদাধর পণ্ডিত, অভিরাম গোপাল মানুষের জাতি-পরিচয়কে কখনই প্রাধান্য

দেননি। নিয়ম অনুসারে শুধু হিন্দুই জাত-বৈষ্ণব হতে পারেন।

দীক্ষার প্রকরণ খুব সরল। গুরু, অথবা মঠধারী, অথবা "ভেক-গোসাঁই" শিষ্যশিষ্যার কানে একাক্ষরী মন্ত্র দেন; শিষ্যের হাতে তুলে দেন 'ডোরী', 'কৌপীন' ও 'বহির্বাস'; তাঁর গলায় পরিয়ে দেন তুলসীর মালা; হাতে তুলে দেন কড়ঙ্গ অথবা নারকেলের খোলা।

জাত-বৈষ্ণবরা বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী। রিজ্‌লির বিবরণ অনুসারে জাত-বৈষ্ণবদের মধ্যে বয়স্কা অবিবাহিত কন্যার যৌন-সংসর্গে তেমন কিছু গুরুত্ব দেওয়া হত না।[৪] কিন্তু বিবাহের পূর্বে তাকে দীক্ষা দেওয়া হত। বিবাহকালে প্রচলিত হিন্দু-অনুষ্ঠান বর্জিত হত। গুরু-গোসাঁই চৈতন্যকে সচন্দন ফুল দিয়ে পূজা করতেন, চৈতন্যকে "মালসা ভোগ" দিতেন। "মালসা ভোগ", অর্থাৎ অন্ন, ফল, এবং অন্যান্য খাদ্য-ভোগ। কীর্তন-গান হত। এ সবই ছিল বিবাহের অনুষ্ঠান। কন্যার অভিভাবক কন্যাদান করতেন। বরকন্যার পারস্পরিক কণ্ঠীবদল করে বিবাহ নিষ্পন্ন হত। জাত-বৈষ্ণবদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহের বিধান ছিল। কিন্তু বিধবার ক্ষেত্রে 'কন্যাদান' হত না। পতিপত্নীর বৈবাহিক সম্পর্ক ভাল হলে পুনর্বিবাহ অনুমোদিত হত।

জাত-বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার ছিলেন গোস্বামী অথবা গোসাঁই। দীক্ষাদানের প্রয়োজনে, এবং জাত বৈষ্ণব সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, সমগ্র বঙ্গ প্রদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলের পরিচালক ছিলেন একজন গোসাঁই। তাঁর এলাকাতে অন্য অঞ্চলের গোসাঁই হস্তক্ষেপ করতেন না। গোসাঁইকে সাহায্য করতেন "অধিকারী"; "অধিকারী"-কে সাহায্য করতেন "ফৌজদার"; "ফৌজদার"-কে "খুড়ো" বলা হত। তাঁকে সাহায্য করতেন "ছড়িদার"। যাঁরা দীক্ষিত হতেন, তাঁদের দেওয়া পাঁচসিকা দক্ষিণার ষোল আনা নিতেন গোসাঁই, চার আনা নিতেন 'খুড়ো'। অনুমান করি, ষোল আনার কিছু ভাগ "অধিকারী"র প্রাপ্য ছিল। "ছড়িদার"-ও ভাগ পেতেন।

২

রিজ্‌লির বিবরণে বৈরাগী-বোষ্টমদের জাত-বৈষ্ণবদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।[৫] জাত-বৈষ্ণবরা ছিলেন গৃহস্থ বৈষ্ণব। বৈরাগী-বোষ্টমরা ভিক্ষা করতেন। তাঁদের সম্পর্কে জেমস্ ওয়াইজ্ লিখেছিলেন যে, তাঁদের দুর্নাম ছিল। আত্মীয় পরিজনহীন ব্যক্তি, সহায়সম্বলহীন বিধবা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি, বেশ্যা—এঁরাই বোষ্টম বোষ্টুমী হতেন। তবে, ওয়াইজ্-এর মতে, A few undoubtedly join from sincere and worthy motives.[৫ক] বোষ্টম-বোষ্টমীরা গ্রামে-নগরে ভিক্ষা করেন, নামগান করেন, গাছতলায় বসে ভিক্ষা করেন। তাঁরা গাঁজা খান, এবং ভাইবোন সেজে থাকলেও একে অপরের সঙ্গে অবৈধ যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত ওয়াইজ্ লিখেছেন যে, তাঁরা সন্তানদের শৈশবেই মেরে ফেলেন; এই জন্য তাঁদের সন্তানসন্ততি দেখা যায় না। এখন এমনও শোনা যায় যে,

বৈরাগীবোষ্টমরা অব্যর্থ জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি জানতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা অভিভাবকহীনা কুমারীদের ও বিধবাদের নিজেদের দলে টেনে আনতেন। অনেক বিবাহিতা মহিলাও তাঁদের দলে যোগ দিতেন।

প্রাচীন গৌড় নগরে রূপ-সনাতন-সায়রের পারে, রাজশাহীর খেতুরিতে এবং এমন কি নারায়ণগঞ্জের কাছে লাঙ্গলবন্ধে যে সব মেলা হত, তাতে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বোষ্টম-বোষ্টমীদের "প্রেমতলা" চিহ্নিত করা হয়ে থাকত। সেখানে "ফৌজদার"-কে পাঁচসিকা দক্ষিণা দিলেই বৈরাগী-বোষ্টমের একজন বোষ্টমী লাভ হত। "প্রেমতলা"তে আগের বোষ্টমীকে ত্যাগ করে অন্য কোন বোষ্টমীকে গ্রহণ করা যেত। এজন্য আবার পাঁচসিকা দক্ষিণা দিতে হত। বোষ্টমী-বর্জন, এবং গ্রহণ সহজ ব্যাপার ছিল; তাই এক ঢাকাই বোষ্টমের গান ছিল এইরূপ:

পাঁচসিকার বৈষ্টুমী ধনি! তুই লো আমার
আরে তব মান বাড়াইমু কত আর॥

গানটির পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। এ সব বৈরাগী-বোষ্টমদের আখড়াও ছিল। তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ধার ধারতেন না। অনেক বৈরাগী-বোষ্টম হাতে কিছু টাকা-পয়সা জমলে গৃহস্থ হতেন।[৫খ]

৩

'দ্বিজ' এবং উচ্চশূদ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নিশ্চয় জানতেন যে, "জাত-বৈষ্ণব" এবং "বৈরাগী-বোষ্টম" এক ছিলেন না। অনেক ব্রাহ্মণও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় দ্বিজত্ব বর্জন করে জাত-বৈষ্ণব হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উচ্চ মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত নায়ক-নায়িকা জাত-বৈষ্ণব। "দ্বিজ" এবং উচ্চ-শূদ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা আপামর জনসাধারণের মধ্যে "প্রেমভক্তি"র প্রচার পছন্দ করেননি। অথচ জাত-বৈষ্ণবদের সংখ্যাধিক্য তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাত-বৈষ্ণবদের একেবারে নস্যাৎ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চৈতন্য-তত্ত্বের "ডারউইনী"-ভাষ্যকার, গৌড়ীয় মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবদের একটা উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ করলেন; তা এইরূপ[৬]:

১. গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু।
২. অন্যান্য উচ্চ-জাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধুসন্ত মহান্ত।
৩. উচ্চ-জাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহস্থ।
৪. জাত-বৈষ্ণব।

এই বিন্যাসে ব্রাহ্মণ-গুরুদের ঐতিহ্যসম্মত আধিপত্য নূতনভাবে স্বীকৃত হল। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার পালন করেও সংস্কারবিরোধী বৈষ্ণব ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু হতে পারেন। নিম্নজাতির মানুষদের একই রকম সংস্কার নাও থাকতে পারে। কেদারনাথ দত্ত বাউল, চরণপাখি এবং কর্তাভজাদের হিন্দুত্বের পোষাক পরা মুসলমান রূপে চিহ্নিত করলেন। নিম্নজাতির গৃহস্থ বৈষ্ণব 'বাবাজী' তাঁর বিচারে

একটা আধ্যাত্মিক সাংকর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভাবলেন যে, জাত-বৈষ্ণবদের কোনও সামাজিক পরিচিতি নেই। তাঁর কারণ ব্রাহ্মণরা জাত-বৈষ্ণবদের অস্পৃশ্য মনে করতেন। জাত-বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও কৃত্য পালন করতেন না। তাঁদের "কণ্ঠীবদল" করে বিবাহ নামে মাত্র বিবাহ ছিল। তাঁরা না কী বিবাহোত্তর যৌন-সম্পর্ককেও মেনে নিতেন। কেদারনাথ দত্তের বিচার অনুসারে জাত-বৈষ্ণবদের দলে ভারী করেছে যত সব জারজগণ। অর্থাৎ, যখন রিজ্‌লি এবং ওয়াইজ সাহেব পর্যন্ত জাত-বৈষ্ণব ও ভিক্ষোপজীবী বৈরাগী-বোষ্টমদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখতে পান, তখন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তা দেখতে পাননি। বৈষ্ণবব্রাহ্মণ সমতার তত্ত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হ'ল যে, রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ বৈষ্ণব অস্পৃশ্য, জারজ এবং বদমাস।

এইচ. এইচ. রিজ্‌লি বৈষ্ণবদের উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাজন মানেননি। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনার প্রতিবেদনে "বৈষ্ণব"দের বেশ কিছুটা নিচে রেখে দিলেন। বৈষ্ণবভাবাপন্ন স্মার্ত ব্রাহ্মণরা এবং উচ্চ শূদ্র বৈষ্ণবরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁরা দাবী করলেন যে, ব্রাহ্মণদের ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে "বৈষ্ণব"-দের স্থান দিতে হবে।[৭] অর্থাৎ, যখন সরকারি প্রতিবেদনে উচ্চ স্থান দাবী করা হবে, তখন অবশ্যই "জাত"-বৈষ্ণবদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে হবে। কিন্তু সর্বদা এটাই মনে রাখতে হবে যে, "জাত"-বৈষ্ণবরা সংখ্যায় বেশি হলেও মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, ''out-caste Vaishnavas'', অসভ্য, জারজ এবং অস্পৃশ্য।[৮]

কেদারনাথ দত্ত শূদ্র ছিলেন। তিনি সর্বদা শূদ্র জাত-বৈষ্ণবদের একেবারে ভাগাড়ে ফেলে দিতে চাননি। বিশেষভাবে এ তথ্য স্মরণীয় যে, তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একক প্রচেষ্টায় 'গৌড়ীয় মিশন' স্থাপন করেন। এর জন্য সমস্ত "শ্রেণীর" বৈষ্ণবদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজনীয় ছিল। বৈষ্ণব "অস্পৃশ্য"দের জাতে তুলবার জন্য তিনি কিছু প্রস্তাব করেন ; সেগুলো সংক্ষেপে ছিল এইরূপ :[৯]

১. জাত বৈষ্ণবরা তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বর্জন করে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করবেন।

২. তাঁরা বর্ণাশ্রম ও সনাতন ধর্ম মেনে চলবেন।

৩. তাঁরা একবারই বিবাহ করবেন।

৪. ভ্রাম্যমাণ বৈরাগী বোষ্টম না হয়ে তাঁরা কুটীর শিল্প গড়ে তুলবেন।

৪

জাত-বৈষ্ণবগণ এ সব কথা তখন শুনেছিলেন কি না, তা জানা নেই। তাঁদের সমাজ ও ধর্মাচরণ উচ্চবর্ণের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সমাজ ও ধর্মাচরণের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তাঁরা উচ্চজাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বাবলি সম্বন্ধে কখনই ঔৎসুক্য দেখাননি। সাম্প্রতিক কালে সুশিক্ষিত জাত-বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান এক প্রাবন্ধিক কেদারনাথ দত্তের প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে কতগুলো প্রশ্ন তুলেছেন। সেগুলো এইরূপ :[১০]

১. "জাত-বৈষ্ণব কি ভাবে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ফিরে যাবে ? কোন বর্ণে প্রবেশ করবে ?"

২. জাত-বৈষ্ণবকে কি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিতেই হবে ?

৩. "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কি বহুপত্নীকতা নিষিদ্ধ ছিল ?"

৪. "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি বিষয়ে কোথাও টুঁ শব্দ করেছেন বলে তো জানা নেই। তাই প্রশ্ন হঠাৎ জাত-বৈষ্ণব সমাজের ক্ষেত্রে এমন আরোপণ কেন ?"

৫. জাত-বৈষ্ণবদের জল-অচল করা হয়নি। "জল-অচল সমাজ থেকে কেউ জাত-বৈষ্ণব সমাজে এলে জল-সচল হয়ে যায়।"

এ সব প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে, চৈতন্য যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার করেন তখন কারও জাত-বিচার করা হয়নি। বৈষ্ণব কবির সেই অমর বাণী মনে পড়ে :

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই ॥

চৈতন্যের পরিকরদের জাতির হিসাব এই শতকের তৃতীয় দশকে বিখ্যাত বৈষ্ণব অদ্বৈতদাস বাবাজীর দৌহিত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদারই দিয়েছিলেন। তাঁর আগে এমন খুটিনাটি জাতির হিসাব আর কেউ করেননি। তা করাই বারণ ছিল। বৈষ্ণবদাস তাঁর "শ্রীশ্রী বৈষ্ণব বন্দনা"-তে লিখেছিলেন :[১১]

জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে ॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দির সবে জগতে দুর্লভ ॥

চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রচারিত বৈষ্ণব ভক্তি ছিল অতিশয় সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক উপযোজন অথবা acculturation। সবাইকে তাঁরা আহ্বান করেছিলেন। 'ভাগবতপুরাণ'-এর একটি সুন্দর শ্লোকে "কীরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দ পুক্কশা" প্রভৃতি অনার্য অস্পৃশ্য উপজাতিদেরও বৈষ্ণব হওয়ার ক্ষমতা উদার ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। রামচন্দ্র গোস্বামী 'পাষণ্ড দলন'-এ লিখেছিলেন :[১২]

ওরে ভাই ! যাঁহাদের গোবিন্দভক্তিতে।
অধিকার হইয়াছে জানিবে নিশ্চিতে ॥
তাঁহাদের জাতিব্যাখ্যা করিবে বর্জন।
সকল শাস্ত্রেতে ইহা ফুকারিয়া কন ॥
গোবিন্দের প্রতি সদা ভক্তি করে যাঁরা।
বরণ সঙ্কর হইলেও পূত তাঁরা ॥

অধিকাংশ বঙ্গীয় বৈষ্ণবের বিচারধারা এ সকল উদার কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যখনই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ "সমতা"-র তত্ত্ব প্রচারিত হল, তখনই এই ভাবনা স্বাভাবিক হয়ে উঠল যে, গোবিন্দভক্তিতে অধিকার থাকলেও বর্ণসঙ্কর বৈষ্ণব কিছুতেই ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের অথবা উচ্চ-শূদ্র বৈষ্ণবের সমান হতে পারেন না। অথচ এটাও দেখা যায় যে, তথাকথিত "জাত"-বৈষ্ণবদের বিভিন্ন "পরিবার" ঐতিহ্য অনুসারে যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন চৈতন্যের বিশিষ্ট পরিকর। তাঁরা বৈষ্ণবদের জাতির বিচার করেননি।

ম্যাকস বেবর্ লিখেছিলেন : সূফী ধর্ম, তাও ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, কৃষ্ণ থেকে শুরু করে খ্রিস্ট পর্যন্ত সমস্ত বিখ্যাত "উদ্ধার কর্তা" নাগরিক বর্গদ্বারা সমর্থিত, এবং সেই সমর্থনে পুষ্ট হয়েছেন। নাগবিক বর্গ বলতে বেবর্ "artisans, traders, enterprisers engaged in cottage industry and their derivatives existing only in the modern occident" বুঝিয়েছেন।[১৩] যাঁরা ব্যবসায়ী, যাঁরা ব্যবসায়ে উদ্যোগী, যাঁরা কুটীর শিল্পে নিযুক্ত থাকেন, তাঁরাই কৃষ্ণকে যিশু খ্রিস্টকে ভক্তি করেছেন। নবদ্বীপে স্বাভাবিক ভাবে চৈতন্য "তেলীমালীসনে প্রেমার বিহার" করেছিলেন। জাতির বিচার তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল না। চৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ বৈষ্ণবীয় উদ্ধারণতত্ত্ব অথবা "soteriology"কে জনসংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত ঐতিহ্য উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ভক্তির তত্ত্বে ব্রাহ্মণ্য সদাচারের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

যেখানে ব্রাহ্মণরা থাকবেন, ব্রাহ্মণ্য সদাচারের ও সাংস্কৃতিক বিদগ্ধতার আর্দর্শ থাকবে, সেখানে জাতবিচার থাকবে, থাকবে বিভিন্ন জাতির ও বর্গের মানুষের বিভিন্ন জীবনধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। মনু থেকে শুরু করে রঘুনন্দন পর্যন্ত সমস্ত স্মার্ত সংহিতা স্রষ্টাগণ তাই করে এসেছেন। এইরূপ তুলনামূলক বিচারই ছিল ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাত-বৈষ্ণবদের ধর্মের ও জীবনাচরণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমালোচনায় সেই বৈশিষ্ট্যই দেখা গেল।

৫

আখড়ার মহান্ত যদি জাত-বৈষ্ণবদের গুরু হতেন, তবে তাঁর পক্ষে ধনসম্পত্তি অর্জন করা সাধারণত সম্ভব হত না। অধিকাংশ 'গৌণ'-বৈষ্ণব অর্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংগঠনের অভাবে, অর্থের অভাবে, সময়ের পরিবর্তনে এবং ব্রাহ্মণদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিরন্তর সমালোচনার জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এককালে গুরুদের একটা সামাজিক ভূমিকা ছিল। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক সর্বদা সর্বত্র নিতান্ত আর্থিক সম্পর্ক ছিল না। রাজশাহী জেলার জাত-বৈষ্ণব গুরুদের সম্পর্কে ও'ম্যালি লিখেছেন যে, বৈষ্ণবাচার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, তা তাঁরা দেখতেন। মদ্যপান, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ এবং দৌশ্চারিত্র্য কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কতগুলো অপরাধের সামাজিক বিচার হত ; গুরু বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ

করতেন।[১৪] কেমন 'নিয়মশৃঙ্খলা ও সংযম থাকলে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট 'পণ্ডিত মশাই'-এর মতো সচ্চরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ, ত্যাগী পরোপকারী জাত-বৈষ্ণব গৃহস্থ তাঁর বিশেষ অর্থবহ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতেন, তা সহজেই অনুমেয়। এ সব তথ্য ভাল করে বিচার না করে মেল্‌ভিল্ কেনেডি গোস্বামীদের 'পরজীবী' বলেছেন।[১৫] নৈতিক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁদের না কি কোনও অবদান থাকত না। বৈষ্ণব ধর্ম তৃণমূলস্তরে প্রচারিত হয়। রাঢ়ে বঙ্গে তৃণমূলস্তরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের বড় একটা বাধা ছিল বৈষ্ণব ধর্ম, কীর্তন, এবং চৈতন্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অবিমিশ্র ভক্তি। তাই বহু খ্রিস্টান লেখক সুযোগ পেলেই বৈষ্ণব ধর্মের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন।[১৬]

যাঁদের 'প্রেমতলী'-র বোষ্টম বোষ্টমী রূপে দেখা হয়েছে এবং নিন্দা করা হয়েছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে, এমন কি তীব্রভাবে ঘৃণা করা হয়েছে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, জীবনাচরণ, নৈতিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে গভীরভাবে গবেষণা করা হয়েছে, তাঁদের বুঝতে চাওয়া হয়েছে।[১৭] তাঁরা প্রায় একটি "অপরাধী" উপজাতিরূপে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বাতাবরণে কোনও রকমে বেঁচেছিলেন। বোষ্টম-বোষ্টমীদের ব্যক্তিস্বরূপ অজ্ঞাত ছিল ; ভুলে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের মনুষ্যত্ব। অথচ বৈষ্ণব ধর্মে তাঁদেরও স্থান ছিল। কেনেডির মতে এঁরা ছিলেন "last gift of Buddhism"।[১৮] অর্থাৎ, বৈষ্ণব ধর্মে যা কিছু ভাল, তার উৎস ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম ; যা কিছু খারাপ তার উৎস বৌদ্ধ ধর্ম। এরূপ বিচারধারা অনৈতিহাসিক এবং কৃত্রিম।

সূত্রের উল্লেখ

১. H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, 2 vols. (Calcutta, Firma Mukhopadhyay, Reprint 1981), Volume-2, pp. 339-348. প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, Joseph T. O'Connell, "Jati-Vaisnavas of Bengal : Subcaste (Jati) without caste (varna), *Journal of Asian and African Stuties*, XVII, 3-4 (1982), pp. 189-207, O'connell প্রধানত জাত-বৈষ্ণবদের 'বর্ণত্ব' অর্জনের জন্য আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এই আন্দোলন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে শুরু হয়। এই আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন নিত্যানন্দ বংশের সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং গুরু প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ; ১৯১০-এ প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব জাতীয় সম্মেলনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন রাধাকান্ত গোস্বামী।

২. মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, পূর্বে উক্ত, পৃ. ৩৬৫

৩. Risley, p. 341

৪. Risley, p. 341

৫. Risley, pp. 344-45 : "mendicant vaisnavas." মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতির মতে (পৃ. ৩৭১-৭২) বৈষ্ণবদেরও গোত্র আছে ; তাঁর মতে "পরিবার" শব্দটি "প্রবর" শব্দের অপভ্রংশ।

৫ক. Risley, p. 344

৫খ. Risley, p. 341-42

৬. কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' (১৮৯২-১৮৯৩), চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩ ; কেদারনাথের মতে (পৃ. ১১১) "ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল"। 'সজ্জনতোষণী', ১৮৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৮, ১৩১

৭. মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, পৃ. ৩৬০-৬১

৮. Bipinchandra Pal, *Bengal Vaisnavism* (Calcutta, Modern Book Agency, 1933) pp. 129-30; দ্রষ্টব্য : Melville T. Kennedy, *The Chaitanya Movement : A Study of Vaishnavism In Bengal* (Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1993 ed.) Chapter VIII, pp. 148-179.

৯. 'সজ্জনতোষণী', ১৮৮৫, ২, পৃ. ১৪২-১৪৩

১০. অজিত দাস, 'জাত বৈষ্ণব কথা' (কলিকাতা, চারুবাক, ১৯৯৩), পৃ. ৪৮-৪৯

১১. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান', পৃ. ৫৬৭ ; "শ্রীশ্রী বৈষ্ণব বন্দনা", রাধানাথ কাবাসী-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রী বৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

১২. 'শ্রীশ্রী বৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পৃ. ৫২১

১৩. H. H. Gerth and C. Wright Mills, *From Max Weber : Essays In Sociology* (London, Routledge and Kegan Paul, 1957), pp. 273-280, 283-84

১৪. L. S. S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers, Rajshahi* (Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1916) p. 58

১৫. M. Kennedy, উপরে উক্ত, p. 156

১৬. দ্রষ্টব্য, VI B, pp. 409-414.

১৭. পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন বহু পণ্ডিত ; তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট, আহমদ শরীফ, আবুল আহসান চৌধুরী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পীযূষকান্তি মহাপাত্র, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শক্তিনাথ ঝা, সনৎকুমার মিত্র, সুধীর চক্রবর্তী। বিদেশী গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : এডওয়ার্ড সি. ডিমোক্, জোসেফ টি ও' কোনেল, এবং রাহুল পিটার দাস।

১৮. M. Kennedy, p. 12.

চতুর্দশ অধ্যায়

কীর্তনের ক্রমবিকাশ

অপভ্রংশ অবহট্ট ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছিল। তাতে বৈষ্ণব কীর্তনের সূত্রপাত হয়। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-গ্রন্থে এ ধরনের বহু পদ সঙ্কলিত হয়েছে। নাথ সিদ্ধদের গান, বৌদ্ধ দোহা বৈষ্ণব কীর্তনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। এ সব গান ছিল প্রাক্-ইসলমি সুরতালের উপর প্রতিষ্ঠিত।' বৌদ্ধ সহজিয়াগণ একটা সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন।

রাধা-মাধবের গোপন প্রেমের গান যে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকেও প্রচলিত ছিল, প্রথম অধ্যায়ে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যে গান একাদশ শতকে বাউল গেয়েছিলেন, অনুমান করি তা ছিল কোনও পল্লীগীতি। সম্ভবত জয়দেব রাধামাধববিষয়ক পল্লীগীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় ভেবেছেন যে, 'গীতগোবিন্দম্'-এর সঙ্গীত সম্ভবত কানাড়া দেশে উদ্ভাবিত হয়।[১] জয়দেবের পৃষ্ঠপোষক সেন-রাজারা কানাড়া থেকে বঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু জয়দেবের কাব্য ভাষার ও ছন্দের অসামান্য সৌন্দর্যের জন্যও বিখ্যাত হয়েছিল। শ্যামাপদ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন :[২]

> সংস্কৃত কাব্য হলেও অসামান্য বাক্‌শিল্পী জয়দেবের কাছে বাঙলা কাব্য ঋণী...গতি এ কাব্যের মূল সুর, এ গতি দেহের তথা মনের। এই গতিকেই মূর্ত্তি দিয়েছেন জয়দেব প্রয়োজন মত সমবিষম মাত্রায় রচিত বিচিত্র ভঙ্গীময় গানে গানে।

জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী গান্ধার রাগের এক বিশেষজ্ঞ শিল্পী ছিলেন। কবি নিজেকে 'পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী' রূপে উল্লেখ করেছেন। পদ্মাবতী নর্তকী ছিলেন। টীকাকার শঙ্কর মিশ্রের মতে জয়দেবও ছিলেন নর্তক। চৈতন্য এবং তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণবগণ জয়দেবকে বৈষ্ণব কীর্তনের প্রকৃত স্রষ্টারূপে শ্রদ্ধা করতেন।

'গীতগোবিন্দম্'-এর টীকা "রসিকপ্রিয়া"-র রচয়িতা ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভ।[৩] এই টীকাতে কাব্যটির সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। রাণা কুম্ভ অবশ্য তাঁর সমকালীন গীতরীতির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 'গীতগোবিন্দ' গানের রাজস্থানী আঙ্গিকের স্রষ্টা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

দাক্ষিণাত্যের এবং উড়িষ্যার দেবদাসীরা 'গীতগোবিন্দম্' অভিনয়ের সুচারু আঙ্গিক সৃষ্টি করেন।

জয়দেব এটা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, কীর্তনের একটা ঘটনামূলক ভিত্তি থাকা দরকার। যে কোনও বৌদ্ধ চর্যাগীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গান। তাতে উদ্দেশ্যমূলক "সন্ধ্যাভাষায়" সাধকের আধ্যাত্মিক অনুভূতি অথবা অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে থাকে।[৪] ইঙ্গিত এবং উদ্দেশ্য, এবং পরিভাষার অর্থ জানা না থাকলে চর্যাগীতির অর্থ পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। এ রকম গানের সঙ্গে সুরতাল-যুক্ত অসামান্য সুন্দর ভাষায় রচিত জয়দেবের গানের কোনও তুলনাই হয় না। ভক্তিমূলক গীতিকবিতার প্রারম্ভিক আদর্শরূপে 'গীতগোবিন্দম্' অতুলনীয় ছিল। জয়দেব যে এক 'জিনিয়াস্' ছিলেন তা বলা বাহুল্য। প্রাচীনকাল, আদি মধ্যকাল সরে যাচ্ছে। সময়ের সরণীতে সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রবল ইস্‌লামধর্মাবলম্বিগণ। এই উত্তরণের মুহূর্তে দেশ ও কাল যখন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠল, তখন কবি জয়দেব মেঘমেদুর অম্বরের, সবুজ তমাল বনের, সুখী গ্রাম্যসমাজের, সুন্দরী প্রণয়িনী তরুণীদের, এবং কৃষ্ণবর্ণ, তরুণ, অশেষ শক্তিশালী, অথচ প্রেমিক এক লোকপ্রিয় দেবতার স্মরণে মননে দু'দণ্ড শান্তি খুঁজে পেলেন।

২

চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়ে লীলাশুক-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' আবিষ্কার করেন।[৫] এটি ছিল গেয় কাব্য। এতে ১১২টি শ্লোক আছে। চৈতন্যের পুরীতে অবস্থানকালে এ সকল শ্লোকের সুর ও তাল নির্দিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :[৬]

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের [রামানন্দ রায়ের] নাটক গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

ত্রয়োদশ শতকে মিথিলা ও উড়িষ্যা ছিল শাস্ত্রীয় গীতিচর্চার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য-রচিত 'বর্ণরত্নাকর' নামক গ্রন্থে মিথিলার সাঙ্গীতিক সংস্কৃতির বিবরণ আছে।[৭] গ্রন্থটি চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে মিথিলাতে রচিত হয়। ছেচল্লিশটি রাগরাগিণী এবং বিবিধ নৃত্যশৈলী এখানে উল্লিখিত হয়েছে। কোনও কোনও রাগরাগিণীর ভিত্তি ছিল প্রচলিত লোকগীতি।

বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার এইরূপ সুপরিণত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রত্নস্বরূপ ছিলেন। ৭০০-এর বেশি গেয় পদ তিনি রচনা করেন। নেপালে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর পুথিতে নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায় :[৮]

পদ সংখ্যা	রাগ/রাগিণী
৬	আসাবরি
৭	আহিরি অথবা আহিরিনি
৪	কেদার
৩৬	কোলবা
৮	গুর্জরি
৮১	ধন্‌চি (ধানেশ্রী)
২	নট
৮	বসন্ত
১৫	বিভাস
২২	বরাড়ি
৬১	মালব
১৩	মলারি
৫	ললিত
৯	সারঙ্গ

অষ্টাদশ শতকে মিথিলার কবি লোচন শর্মা (ঝা) (জন্মকাল ১৬৮১) মিথিলার রাজা নরপতি ঠাকুরের আদেশে 'রাগতরঙ্গিণী' নামক একটি সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।[৯] কবি বিদ্যাপতির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য লোচন শর্মা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতির ৫১টি পদের রাগরূপ তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। উল্লিখিত রাগরাগিণীর মধ্যে রয়েছে 'মাধবী', 'নেপাল বরাড়ী', 'দেশ দেশাখ', 'কেদার', 'কামোদ কেদার', 'শ্রীরাগ', 'সুরপঞ্চম', 'মালব', 'বিজয়পুরমালব', 'জোগিয়ামালব', 'যোগিয়া আসাবরী', 'মলারিকা', 'বিভাসী', 'ভীম পলাসি', 'গোপীবল্লভ', 'দেশী', 'অভিরাম', 'শোভনা', 'সারঙ্গি', 'দেশ', 'স্মরসন্দীপন', 'কোভার' ইত্যাদি। নেপাল-পুথিতে উল্লিখিত রাগরাগিণীর সঙ্গে লোচন শর্মার বিবরণ মিলিয়ে দেখে এমন ভাবা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিদ্যাপতির গীতি বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়। তাতে বৈষ্ণবীয় 'কীর্তন'-এর উপাদান কতটুকু ছিল তা দুর্নির্ণেয়।

৩

বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকাহিনীমূলক প্রাচীন কীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ গ্রন্থে তেরটি কৃষ্ণলীলা নাট্যগীতিতে বর্ণিত হয়েছে।[১০] তার মধ্যে আছে "দানখণ্ড", "নৌকাখণ্ড", "ভারখণ্ড", "কালিদয়মন" এবং "রাধাবিরহ"। বড়ু চণ্ডীদাস শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর প্রমাণ থেকে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে গ্রামে গঞ্জে মার্গসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস নীচে লিখিত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন :

আহের, ককু, ককুগুজ্জরী, কোড়া, কোড়া-দেশরাগ, কেদার, গুজ্জরী,
দেশাগ, দেশ বরাড়ী, ধানুষী, পাহারিআরাগ, পঠমঞ্জরী, বেলাবলী,
বসন্ত, বঙ্গালরাগ, বঙ্গালবরাড়ী, বিভাষ, বিভাষককু, ভাঠিয়ালীরাগঃ,
ভৈরবী, মল্লার রাগ, মহারঠারাগ, মালবশ্রী, মালব, রামগিরীরাগ
রামকিরী, ললিত, শৌরীরাগ, শ্রীরাগ, সিন্ধোড়ারাগ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ যেরূপ রাগরাগিণীর মিশ্রণ দেখা যায়, সেরূপ মিশ্রণ পদাবলীর সুরেও প্রায়শ দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ গানের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য বড়ু চণ্ডীদাস কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যথা :[১১]

'দণ্ডক'—ঘটনার বিবরণমূলক গান।

'লগনি'—কথোপকথনমূলক নাটকীয় গান।

'লগনিদণ্ডক'—কথোপকথনের ঘটনার বিবরণমূলক গান।

'লগনিচিত্রক'—সত্য অথবা কল্পিত ঘটনার বিবরণমূলক সাঙ্গীতিক কথোপকথন।

'বিচিত্র লগনিদণ্ডক'—যে গানে কথোপকথন থাকে, এবং তার পটভূমিরূপে ঘটনার বিবরণও থাকে।

'পকিন্নলগনি'—গানে কথোপকথনে ঘটনার আংশিক বিবরণ।

'পকিন্নকলগনিদণ্ডক—সম্পূর্ণভাবে ঘটনার বিবরণমূলক গান।

'কাব্যোক্তিপকিন্নকলগনি—যে গানে মনের ভাব প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গানের গঠন থেকে এ সব অর্থসমূহ অনুমিত হয়েছে। যে চণ্ডীদাসের পদাবলি চৈতন্যের কালে গাওয়া হত, তাঁর রচিত ১০১টি পদ বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।[১২] ড. মজুমদারের মতে এই পদগুলো "প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ভাব, ভাষা, ভণিতা দেওয়ার ধরণ বা কোন পুঁথিতে অন্য কবির ভণিতায় পাওয়ার দরুণ কিছু সন্দেহ জাগিয়াছে যে, হয়তো উহা শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালের রচনা।"[১৩] বিমানবিহারী মজুমদার কোনও রাগরাগিণীর উল্লেখ করেননি; তার উল্লেখ করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীদাসের অনেক পদাবলী বড়ু চণ্ডীদাস-নির্দিষ্ট "কাব্যোক্তিপকিন্নকলগনি"।[১৪]

৪

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কীর্তন ছিল গণবিনোদনের একটি মাধ্যম। তাতে সর্বদা ভক্তির ভাব তেমন স্পষ্ট নয়। নরনারীর প্রেম যে মানসিক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে, চৈতন্যপূর্ব কীর্তনে তা সুস্পষ্ট। পদাবলী-রচয়িতা উপাস্য দেবতাকে মনের কথা খুব কম ক্ষেত্রেই জানিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্য যে চণ্ডীদাসের গান শুনেছেন, তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন। চণ্ডীদাসের গীত-পদ "হায় হায় প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে" গেয়েছিলেন মুকুন্দ নামক চৈতন্য পরিকর :[১৫]

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥
নির্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব সৈন্য ॥

চৈতন্য কীর্তনকে জনসংযোগের একটি সার্থক মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন। চৈতন্যের কীর্তন ছিল 'নামকীর্তন' এবং 'নগরকীর্তন'। এসব কীর্তনের জাতবিচার ছিল না। কবি লোচনদাস লিখেছেন :[১৬]

সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।

"নব প্রেমার" প্রকাশ হয়েছিল নর্তন উল্লাস সহ নাম ও নগরকীর্তনে। কীর্তনীয়াদের সাতটি দল গঠিত হয়েছিল। কবি প্রেমানন্দ লিখেছেন :[১৭]

হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥

নিত্যানন্দ-ভক্ত বলরাম দাস লিখেছেন :[১৮]

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী ॥

চৈতন্য যে ভাবে গানকে ভক্তি-প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন, তার কোনও সমান্তর বঙ্গে ছিল না। নাম এবং নগরকীর্তনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করা হত। এই কীর্তনের কোন কাহিনীমূলক ভিত্তি ছিল না, কোনও বিশেষ বিদগ্ধতাও ছিল না। তাতে কোনও বুদ্ধির, যুক্তির প্রকাশ ছিল না। তার কোনও সুসংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব ছিল না। ভক্তির দুর্নিবার প্রক্ষোভে কীর্তন গায়কগণ, শ্রোতাগণ হেসেছেন, কেঁদেছেন, নেচেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন : "ভাবে কম্পিত, লুঠত ভূতলে, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া"—লিখেছেন কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ।[১৯] স্ত্রীলোকগণ হুলুধ্বনি করেছেন।

কীর্তনের পদ ছিল :[২০]

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

"চৈতন্য চন্দ্রের এই আঁদি সঙ্কীর্তন", লিখেছেন বৃন্দাবনদাস :[২১]

তুয়া চরণে মন লাগুহুঁরে।
সারঙ্গধর। তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে ॥

সরলতা এবং ভাবের গভীরতাই ছিল এইরূপ কীর্তনের মৌল বৈশিষ্ট্য। কীর্তননৃত্যরত চৈতন্যের অসাধারণ বর্ণনা :[২২]

জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা ॥

ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
বাহু তুলে হরি বোলে শ্রীচন্দ্রবদনে ॥

বৃন্দাবন দাস-প্রদত্ত 'কাজী দলন'-এর বিবরণ পড়ে মনে হয়, শুধুমাত্র ভক্তের অশ্রুপাতের জন্যই নাম ও নগর কীর্তন উদ্ভাবিত হয়নি। নিরঙ্কুশ ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সনৃত্য কীর্তনকে মোক্ষম প্রতিবাদের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে চৈতন্য যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, পরবর্তীকালের বৈষ্ণবরা তা মনে রাখেননি।[২৩] প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা তাঁদের রাগভক্তিমূলক বিদগ্ধ কীর্তনে কখনই উচ্চারিত হয়নি।

৫

বৃন্দাবনে ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব উদ্ভাবিত হল। রাঢ়ে বঙ্গে বিভিন্ন মহোৎসবে তা প্রচারিত হল। তার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হ'ল পদাবলীকীর্তন। তার আভ্যন্তর অনুপ্রাণনার বিবরণ এইরূপ :[২৪]

> বৈষ্ণব কবিগণ যে ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও, এবং মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সেই ঐশ্বর্য্য মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও ব্রজবাসিগণ তাহা জানিতে চাহেন না, বুঝিতে চাহেন না, মানিতেও চাহেন না। বৈষ্ণব কবিগণের ভগবান—নন্দ যশোদার দুলাল, ব্রজরাখালগণের বন্ধু, ব্রজবধূগণের প্রিয় দয়িত, "রসিকশেখর রসময় কলেবর।"

অর্থাৎ পদাবলীর প্রধান তিনটি 'ভাব'-এর বিকাশ হল : এই তিন 'ভাব' যথাক্রমে বাৎসল্য ভাব, সখ্য/দাস্য ভাব এবং মধুর ভাব। দুই শতেরও বেশি "মহাজন" পদাবলী রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল কবি ছিলেন : অনেকেরই সাঙ্গীতিক জ্ঞান ছিল সুগভীর। দশ হাজারেরও বেশি পদাবলি রচিত হয়। প্রতিটি পদই কীর্তন। পদরচয়িতারূপে অতি বিশিষ্ট ছিলেন বাসুদেব ঘোষ, নরহরি দাস, যদুনন্দন, কবিশেখর, জ্ঞানদাস, লোচন দাস, নরোত্তম দত্ত, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, উদ্ধব দাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, দীনবন্ধু, এবং শশিশেখর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করেছেন।

প্রত্যেকটি পদে রচয়িতার 'ভাব' প্রকাশিত হয়েছে। 'ভাব' সময় অনুসারে বিভিন্ন। কৃষ্ণের ও তাঁর লীলার বর্ণনা প্রধানত রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র সূত্রানুসারে করা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, গোপীপ্রেম ছিল কামগন্ধহীন। বহু পদে সময় অনুসারে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত হয়েছে। বহু পদে রচয়িতার আধ্যাত্মিক আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের কথোপকথনমূলক পদাবলিও রচিত হয়। বেশ কিছু পদে রচয়িতার দ্বারা কল্পিত অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ পদের জন্য রাগ-রাগিণী নির্দিষ্ট হয়েছে। বহু পদের 'যথারাগ' ; অর্থাৎ সেগুলো যে কোনও রাগ-রাগিণী অনুসারে গাওয়া যায়। পদাবলী-কীর্তন কখনই পল্লীগীতি হতে পারে না। ভাল পদ ভাল কবিতাও বটে ; তা আবৃত্তি করলেও ভাল শোনায়। পদের ভাব, সুন্দর ভাষা, চমৎকার ছন্দ তাকে

প্রচলিত অবৈষ্ণব মঙ্গলকাব্য থেকে অনেক উচ্চস্তরে তুলে দিল। কিন্তু এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, পদাবলীর ভাষা এবং ছন্দ সর্বদা চিত্তাকর্ষক ছিল না। কখনও কখনও তাতে কষ্টকল্পনা, ভাষার ও ভাবের আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা, এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা অভব্যতাও দেখা যায়।

পদাবলী-রচয়িতাগণ স্বাধীনভাবে পদ রচনা করতে পারেননি। কাব্যিক অনুভূতিকে পূর্বে উল্লিখিত স্থায়ীভাবের দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করে রাখার জন্য বৈষ্ণব পদাবলীও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। তার কোনও বৈচিত্র্য থাকে না। অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদন প্রধানত ভক্ত বৈষ্ণবরাই পূর্ণভাবে করতে পারেন।

এই কবিতা যে ধর্মীয় কবিতা, তা বিনয়কুমার সরকার মেনে নিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন : Most of what has been passing in India for other worldly literature and art is in reality the literature and art of human passions, human ideals, human interests and conflicts... in the Chandidasa-Vidyapati complex... it is the masses that speak.[২৫] ড. সরকারের এই অর্থবহ মন্তব্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হলেও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। পদাবলীতে ড. সরকার উল্লিখিত "sunshine of Bengali villages and towns," গ্রাম-নগরের সূর্যালোক, দুর্লক্ষ্য। সর্বদা এক গভীর আর্তির ও অভাববোধের ব্যঞ্জনা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ পদ অশ্রুসিক্ত। কৃষ্ণ যে কখন কোথায় থাকেন, কখন কোথায় যান, তা সুনিশ্চিত নয়। এই মৌলিক অনিশ্চয়তাকে দূর করার জন্য কৃষ্ণলীলার অষ্টকালীন বিনিশ্চয় উদ্ভাবিত হল। কিন্তু তাতেও বিরহের দুঃখ থাকে, থাকে ভক্ত কবির গভীর অভাববোধ, গভীর আর্তি। তা থাকাই স্বাভাবিক। ধরা এবং অধরার মাঝে বৈষ্ণব কবির স্থায়ী অবস্থান।

ক্রমশঃ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ও ছন্দ কৃত্রিম হয়ে উঠেছিল। তার কতগুলো কারণ ছিল। প্রথমত ব্রজবুলি ছিল তৈরি করা কৃত্রিম ভাষা। যা সহজ বাংলা ভাষায় লেখা যায় তাই ব্রজবুলিতে লিখতে হলে শব্দের অর্থ ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হয়, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হয়। অনেকেই তা পারেননি। কেউ কেউ আবার ব্রজবুলির সঙ্গে বাংলা ভাষাকে মিশিয়েছেন। সকলেই গোবিন্দদাস কবিরাজ ছিলেন না। ছন্দ, "ধ্বনিপ্রসাধন" এক ধরনের "মৌতাতি উগ্রতা"র সৃষ্টি করে। অনুপ্রাস মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, কবিতা সর্বানুপ্রাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য কেউ কেউ তার মধ্যেই প্রচলিত বাংলায় সুন্দর কবিতা লিখেছেন।

ব্রজবুলির সঙ্গে এক অনির্দেশ্য আভিজাত্যের সংযোগ ছিল। অভিজাত বৈষ্ণবরা শব্দালংকারের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ চণ্ডীদাস এবং লোচনদাস যে ভাষায় সুন্দর গীতিকবিতা লিখেছিলেন, তা আর চলেনি। বৈষ্ণব পদাবলী মৌতাতি স্বভাব অর্জন করে। বাসুদেব ঘোষ যে প্রাণস্পর্শী ভাষায় চৈতন্যলীলা বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন, তার লেশমাত্র অষ্টাদশ শতকীয় নরহরি চক্রবর্তী-রচিত

চৈতন্য বিষয়ক পদাবলীতে নেই। শেষ পর্যন্ত পদাবলীর সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। শুধু তাই নয়; কোনও কোনও কবি কৃষ্ণকে নাপিতানী, বাজীকর, বিদেশিনী সাজালেন। এসব পদাবলীর কৃষ্ণ লাম্পট্যদোষদুষ্ট। বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের এইরূপ চরিত্রহনন যে অবাঞ্ছিত ছিল, তা মহাজনগণ বুঝতে চাইলেন না।

৬

নামকীর্তন গাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল। এইজন্য কবি পরমানন্দ লিখেছিলেন :[২৬]

নাচিতে জানিনা তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে জানিনা তমু গাই।

কিন্তু লীলাকীর্তন পালাকীর্তন গাইতেন বিশেষজ্ঞ কীর্তনশিল্পী। এই কীর্তনের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাঁরাই জানতেন, যাঁদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জানা ছিল। কীর্তন একেবারে দুর্বোধ্য হলেও রাগরাগিণী অনুসারে তা গাওয়ার নমুনা আধুনিক কালেও শোনা গেছে। প্রভু জগদ্বন্ধু এমন সব পদ রচনা করেন, যার অর্থ বোঝা যায় না, যেমন :[২৭]

ললিত। দাস পাড়িয়া
কুঞ্জদ্বারে কুকুভরে কক কাকু কয়।
প্রাণেশ্বরী পুপু পপ উঠ দাসী রয় ॥
(রাধে উঠ উঠ বে) (সুখনিশা অবসান)
গান্ধার। অষ্টতাল
ত্রিভদ্র ত্রিযামক ত্রৈধ বপু চিহ্ন
মার দদন দত্তি দদ বিন্ন ভিন্ন ॥
(ছি ছি লাজ নাই মা) (এই বেশে রাই পাশে)

লীলাকীর্তন গাইবার জন্য বৈষ্ণবীয় কান্তিবিদ্যার চর্চা প্রয়োজনীয় ছিল। গোপালভট্ট গোস্বামী লীলাকীর্তনের শাস্ত্রীয় চরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন। কথিত আছে যে, নরোত্তম দত্ত যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রীয় কীর্তনের অনুশীলন করেন। খেতুরি-উৎসবে তিনি ধ্রুবপদ-কীর্তন প্রচলিত করেন; এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক দেবীদাস। কিন্তু এরূপ কীর্তন গাওয়ার আগেও 'গৌরচন্দ্রিকা' অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী গাওয়ার বিধিও ছিল। নরোত্তম-প্রবর্তিত কীর্তনকে 'গড়ানহাটি' কীর্তন বলা হয়। তার ১০৮টি তাল ছিল।

৫৪-টি তাল বিশিষ্ট 'খেয়ালাঙ্গ' মনোহর শাহী কীর্তন ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ও কাঁদরাতে, এবং বীরভূম জেলার ময়নাডাল ও পায়ের গ্রামে উদ্ভাবিত হয়। এই ঘরানার স্রষ্টারা ছিলেন বিশিষ্ট কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজ, এবং গোবিন্দদাসের গুরু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্য।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগুরু রঘুনন্দনও এই কীর্তনগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিত্যানন্দ দাস 'প্রেমবিলাস'-এ লিখেছেন যে, কবি গোবিন্দদাসের বড় ভাই, এবং মনোহরশাহী কীর্তনের পৃষ্ঠপোষক, রামচন্দ্র কবিরাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বদা নরোত্তম দত্তের সঙ্গেই থাকতেন। এ তথ্য থেকে মনে হয়, নরোত্তম দত্তও মনোহর শাহী কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বীরভূমে এই কীর্তনের এক বিশেষজ্ঞরূপে গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী মঙ্গলঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন। মঙ্গলঠাকুরের শিষ্য ছিলেন নৃসিংহ মিত্র। ক্রমশ এই কীর্তন-ঘরানাই রাঢ়ে বঙ্গে প্রাধান্য লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গে কীর্তনের আরও তিনটি ঘরানা ছিল। এ সব হল 'রেনেটি', 'মন্দারিনী', এবং 'ঝাড়খণ্ডী'। পশ্চিম রাঢ়ে রেনেটি কীর্তন জনপ্রিয় ছিল। এ কীর্তন ছিল 'ঠুংরি'-আঙ্গিকের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ২৬টি তাল ছিল। 'মন্দারিনী' কীর্তন-গায়নের সঙ্গে মঙ্গলকাব্য গানের সাদৃশ্য ছিল। 'ঝাড়খণ্ডী' কীর্তনে উচ্চাঙ্গের ঝুমুর গানের প্রভাব পড়েছিল। পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও যে লীলা-পালা কীর্তন গাওয়া হত, তার আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গেও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়।[২৮]

৭

কীর্তনের সঙ্গে আঞ্চলিক পল্লীগীতির সংমিশ্রণ উচ্চবর্গীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাল লাগেনি। তাঁরা কীর্তনের পবিত্রতা সংরক্ষণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস, তাঁর পুত্র পীতাম্বর দাস, অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং তাঁর শিষ্য নন্দকিশোর গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং পদাবলী-সংকলনের সূত্রপাত করেছিলেন। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে, অথবা তার কাছাকাছি সময়ে কেতুগ্রাম-ও ভানুগ্রামের বৈষ্ণবদের অনুরোধে রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী' রচনা করেন। স্থানীয় বৈষ্ণবরা সংস্কৃত জানতেন না। তাঁদের রসতত্ত্ব বোঝাবার জন্য এই নিবন্ধ রচিত হয়। রামগোপাল দাস তাঁর এই নিবন্ধে বিশ্বনাথ, মম্মট ভট্ট ও ভানুদত্ত প্রভৃতি সংস্কৃত আলংকারিকদের বচনসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। নিদর্শনরূপে বহু পদাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। 'রসকল্পবল্লী'-ও একটি পদাবলী সংকলন। পীতাম্বর দাস রসতত্ত্বের বিচারমূলক 'অষ্টরসনিরূপণ' রচনা করেছিলেন।[২৯]

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসারে রচিত পদাবলীর সংকলন প্রকাশ করেন গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম। এই রচনাটির আখ্যা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই রচনা স্পষ্টত কীর্তন-গায়কদের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল।[৩০] রূপ গোস্বামীর "অবতার" রূপে প্রসিদ্ধ পূর্বে উক্ত তাত্ত্বিক, মুর্শিদাবাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রস্তুত করেছিলেন 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'। এখানে 'হরিবল্লভ' ছদ্মনামে তাঁর দ্বারা রচিত ৫১-টি পদ সহ ৩১৫টি পদ সংকলিত হয়েছিল।[৩১] পুরাতন পদাবলী-সংকলনেব মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের

'পদামৃতসমুদ্র', বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু', 'পদমেরু', গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ', দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত', নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার', কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' প্রসিদ্ধ।[৩২]

বৈষ্ণব গায়কগণ কীর্তনের একটি স্থায়ী শাস্ত্রীয় সাঙ্গীতিক ভিত্তি বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন। এ বিষয়ে সঙ্গীততত্ত্ববিদ্, বিখ্যাত পাচক এবং অভিজ্ঞ পদাবলী-রচয়িতা এবং ঐতিহাসিক নরহরি চক্রবর্তীর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখা যায়। তিনি তাঁর বিখ্যাত এবং অপরিহার্য গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'-এর পঞ্চম অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। কীর্তন-গায়কদের প্রয়োজনে নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়' নামক আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩] এখানে ৭২টি শুদ্ধ এবং মিশ্র রাগিণী উল্লিখিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে যে রাগরাগিণীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল, বিশিষ্ট কীর্তনীয়াগণ যে অষ্টাদশ শতকে মার্গসঙ্গীতের চর্চা করতেন, তা 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' পড়লে বোঝা যায়।

৮

মনোহরশাহী কীর্তনের প্রধান শৈলী বর্ধমানে বীরভূমে এবং মুর্শিদাবাদে উদ্ভাবিত হয়। বীরভূমে দাস্য ভাব ও সখ্য ভাব জনপ্রিয় ছিল। অথচ মনোহরশাহী কীর্তনে মধুর ভাব অসামান্য গুরুত্ব পেল। মনোহরশাহী কীর্তন-পদ্ধতি অনুসারে 'গোষ্ঠলীলা'-বিষয়ক কীর্তনেও মধুর ভাবের গান গাওয়া হতে থাকে, কারণ 'স্মরণমঙ্গল' অনুসারে গোচারণকালেও কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হতেন। এই সব তথ্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, 'প্রেমভক্তি'-কে দুর্বল করার জন্যই বর্ধমানের গৌরনাগরবাদিগণ, এবং বীরভূমের গদাই গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মধুর-রসমূলক মনোহরশাহী কীর্তনকে ক্রমশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু মনোহরশাহী কীর্তন শাস্ত্রীয় সাঙ্গীতিক গঠন থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়। তার কতগুলো কারণ ছিল। পদাবলীতে বিশেষ বিশেষ ভাবের, বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ মার্গসঙ্গীতের সুরে তালে ফুটিয়ে তোলা বেশ দুরূহ ছিল। মার্গসঙ্গীতের কোনও বিশিষ্ট শৈলীতেই কথার বাহুল্য থাকে না। তা ছাড়া, আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার ব্যাপক ঐতিহ্য ছিল না। রাগরাগিণীর খেলা খুব বেশি লোক বুঝতেন না। এমন কি পদাবলী-রচয়িতাগণ অসংখ্য পদাবলীর জন্য "যথারাগ", যে কোনও রাগরাগিণী নির্দিষ্ট করেছেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে ধানশি, শ্রী, এবং সুহই সুর প্রায়শ উল্লিখিত হয়েছে; ভৈরবী-সুরের কোনই উল্লেখ সেখানে নেই। অথচ, কীর্তনের একটা "বৈঠকী" উচ্চাঙ্গ রীতিও যে প্রচলিত ছিল, তাও মেনে নিতে হয়। কিন্তু শব্দময় অনুপ্রাসপূর্ণ কীর্তনপদকে সর্বদা "বৈঠকী"-স্তরে উঠিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

এইরূপ পরিস্থিতিতে উদ্ভাবিত হয়েছিল 'আখর' এবং 'তুক্'। 'আখর'-এ কীর্তন-গায়ক ভাবপ্রকাশের জন্য, অর্থবা পদের ব্যাখ্যার জন্য, সুরে তালে নিজের

কথা বলতেন। শেষ পর্যন্ত 'আখর'-ই পদাবলী কীর্তনের প্রাণবস্তু হয়ে উঠল। প্রথমে 'আখর' হয়তো গানে পরিবেশিত হত। পরে তা ছিল কথা মাত্র।

'তুক্' ছিল অনুপ্রাসবহুল তাৎক্ষণিক গান, যা আসল পদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত। আধুনিক কীর্তনের একটি রূপ প্রভুজগদ্বন্ধুর রচনা থেকে উদ্ধৃত হল; এখানে বন্ধনীতে উদ্ধৃত বাক্যসমূহ আখর; বন্ধনী প্রভু জগদ্বন্ধুই দিয়েছেন :[৩৪]

কাল-তরঙ্গ-রঙ্গ-সাঙ্গ মঙ্গল ॥
ঐ-প্রসঙ্গ-ভঙ্গ, কীর্তন-কোন্দল ॥
(আর রক্ষা নাই)
(সবে, হরিনাম, লও)
(সদা, হরিকথা, কও)
(নাম সংকীর্ত্তনে, রও)
(তাপ-সাবধান, হও)

পরে ঝুমুর গানও কীর্তনের শুরুতে গাওয়া হতে থাকে। পেশাদার কীর্তন গায়কগণ শেষ পর্যন্ত কীর্তন গানে প্রতিযোগিতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। বড় বড় আসরে বিভিন্ন কীর্তনীয়া এমন ভাবে তাঁদের গান শেষ করতে থাকেন যে, পরবর্তী গায়কের 'স্মরণমঙ্গল'-এর সময়সরণী অনুসারে গৌরচন্দ্রিকা করতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। কৃষ্ণের ও চৈতন্যের দণ্ড পলমুহূর্ত ধরে যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা মনে রাখাই বেশ কঠিন ছিল। কীর্তনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ঝুমুর-পদ গাওয়া হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দিকে নগরকীর্তন পর্যন্ত 'সওয়াল-জবাব' হয়ে ওঠে।[৩৫]

পদাবলীর মধ্যযুগীয় গঠনের কোনও মৌল পরিবর্তন সম্ভাব্য ছিল না। তার মৌল ভাষা ছিল বিমিশ্র ব্রজবুলি। তার মৌল বিষয় ও ভাব প্রচলিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্র থেকেই আহরণ করতে হত। বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ—এই দুই উজ্জ্বলরসাত্মক ভাবনার বাইরে আর অন্য কোনও ভাবনা কীর্তনে প্রকাশিত হত না। খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন :[৩৬]

...কীর্তন সুরের বিলাস মাত্র নয়, কীর্তনের সুরশিল্প শুধু সঙ্গীতের বিকাশের জন্য পরিকল্পিত নয়। কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের ত্রিবেণী।...সুরের আবেদনে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, কাব্যের অলঙ্কারে ও শব্দের ঝঙ্কারে চিত্ত মুগ্ধ হইবে এবং ধর্মের প্রেরণায় অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব হৃদয়ে জাগিবে—ইহাই কীর্তন সঙ্গীতের অভিপ্রায়।

কীর্তনের অসামান্য "সাত্ত্বিক ভাব"-এর একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন সুলেখক এবং সন্ন্যাসী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রাসঙ্গিক এই বিবরণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :[৩৭]

ওদিকে মহোৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিল... গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন... আপাদমস্তক থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিলেন। চারিদিকে বাউল বৈষ্ণবরা গোসাঁইয়ের ভাব দেখিয়া... সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিল...

কি শুনি, কি শুনি, সিংহরব রে নদীয়ায়।
নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী, ভোঁ ভোঁ ভোঁ রব করি,
(হুঙ্কারিয়া) শ্রী অদ্বৈত বগল বাজায় রে নদীয়ায় ॥[ইত্যাদি]

গোস্বামী মহাশয়... হঠাৎ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, অমনই বামহস্তে (বালক) লালকে ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লাল ভাবাবেশে...একপাশে সরিয়া পড়িল। গোস্বামী মহাশয় লালের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মল্লবেশে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন... ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং বাণযোদ্ধার ন্যায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনী লালের দিকে সন্ধানপূর্বক ঘন ঘন আকর্ণ আকর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন... লাল তৎক্ষণাৎ বাম হস্ত সম্মুখের দিকে ঢাল আকারে বিস্তার করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে পশ্চাদ্দিকে হঠিয়া যাইতে লাগিল... (উন্মাদ) শ্রীধর নতশিরে... সধূম ধুনুচির দ্বারা আরতি করিতে করিতে (গোসাঁইয়ের) পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। এ সময়ে মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

কীর্তনকালে 'ভাব' দেখিয়ে আসর মাত করার দৃষ্টান্ত আছে। তা এইরূপ :[৩৮]

যাদবপুরে কৈবল্য ধামে...১৩ই ফাল্গুন তারিখে... কীর্ত্তন চলিতেছিল।... একটি যুবক কীর্ত্তনের তালে তালে নাচিতেছিল। তাহার গায়ে একটি নূতন গরম কোট ছিল।...একটু পরে...সে কোটটি খুলিয়া অপর একজন ভদ্রলোকের নিকট রাখিয়া দিল। বিভাসবাবু জনান্তিকে আমাকে বলিলেন : "এইবার এই লোকটা আছাড় খাবে।" ঠিক তাহাই হইল... লোকটা ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল এবং মাটিতে গড়াগড়ি শুরু করিল। সহজেই বোঝা গেল যে শুধু নূতন কোটটির মায়াতেই সে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই...ইহার "দশা" আর কিছুতেই ভাঙ্গিতে চাহিল না।

৯

কীর্তন ছাড়া বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের একটি সুন্দর মাধ্যম ছিল কথকতা অথবা পাঠকতা। মিথিলাতে প্রচলিত কথকতা সম্বন্ধে লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে কিছু তথ্য আছে। রাজ্যেশ্বর মিত্র অনুমান করেছেন যে, বিদ্যাপতিও একজন কথক ছিলেন।[৩৯] বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর "সভায়" ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামী ভাগবত পাঠ করতেন ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :[৪০]

পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥

ভাগবত পাঠে রাগরাগিণীর তরঙ্গবিভ্রম মিথিলাতেই সম্ভবত উদ্ভাবিত হয়, এবং মথুরা-বৃন্দাবনে তা স্পষ্টতর হয়। যাঁরা 'ভাগবত পুরাণ'-এর পাঠের বৃন্দাবনী রীতির সঙ্গে বৃন্দাবনে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। সুদর্শন ও সুপণ্ডিত শ্রীনিবাসের জীবিকা ছিল ভাগবতপাঠ। তাঁর পাঠকতায় বীরভদ্র আনন্দে নেচেছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন গোবিন্দদাস

কবিরাজ। তাঁর কোনও কোনও পদে যে চিত্রলক্ষণ দেখা যায়, সুর প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখা যায় তাতে ভাগবত পাঠকতার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

কথকতার মাধ্যমে বাংলা দেশে এল নূতন নূতন গান, যা প্রচলিত কীর্তন থেকে সম্ভবত ভিন্ন ছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' (পরে 'চৈতন্যভাগবত'রূপে আখ্যাত) প্রমথাবধি ছিল গেয় কাব্য। এই কাব্যগায়নে হয়তো 'ভাগবত'-পাঠের কোনও প্রচলিত রীতি অবলম্বিত হত। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠ বৈষ্ণবদের ধর্মীয় কৃত্য হয়ে ওঠে। এই পাঠ শুধু আবৃত্তি ছিল না। মূলের ব্যাখ্যাতে গানেরও ভূমিকা ছিল। মনে হয়, পদাবলী কীর্তনের 'আসর' কথকতা থেকেই এসেছে, বিষ্ণুপদী ভজন কিংবা ঠুংরি থেকে নয়।

শ্রীনিবাস আচার্যের সমকালীন এবং সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতকের কোনও কথক/পাঠকের নাম জানা নেই। অথচ কথকতা/পাঠকতা যে সে সময়ে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রাধাবল্লভ চক্রবর্তী 'ভাগবত'—অনুসারে রাসলীলার পদাবলী রচনা করেন। দাস্য-ভক্তিমূলক 'ভাগবত'-কাহিনীও বঙ্গভাষায় রচনা করা হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে বহিষ্কৃত গুরু জয়গোপাল দাসের শিষ্য ঘনশ্যাম রচনা করেন 'হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত'। সমকালীন কবি বংশীদাস "শ্রীভাগবতানুসারেণ" বেশ কিছু গান লিখেছিলেন।[৪১] উনিশ শতকের শুরুতে কথকতা-পাঠকতা বঙ্গের সাঙ্গীতিক সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট ছিল। জয়নারায়ণ ঘোষাল লিখেছিলেন :[৪২]

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব্ব সুন্দর
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
অনেক পাঁচালী ভাঁতি রামায়ণ সুর
ভবানীভবের গান মালসী মায়ুর
বাইশ আখড়া ছোপ প্রেমে চুরচুর
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
কালীয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছোপের লহর
গড়াহাটী রানীহাটী বিরহ মাথুর
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর
কথকতা তরজাতে সারিতে প্রচুর
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপূর
বাঙ্গালার নবগান নূতন ঝুমুর ॥

এই সুরচিত তালিকার অধিকাংশ গানই বৈষ্ণব গান।

সূত্রের উল্লেখ

১. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃ. ৪০১ ; দ্রষ্টব্য : Ramakanta Chakrabarty; "Vaisnava Kirtana In Bengal", Jayasri Banerjee ed. *The Music of Bengal : Essays In Contemporary Perspective* (Baroda, Indian Musicological Society. 1988), pp. 12-30; হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস' (কলিকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৯)।

২. শ্যামাপদ চক্রবর্তী, 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' (কলিকাতা, কৃতাঞ্জলি, ১৯৮৮), পৃ. ৫

৩. Jayadeva, *Gitagovindam* (with the Rasikapriya Commentary of King Kumbha and Rasamanjari Commentary of Mahamahopadhyaya Sankara Misra), ed. M. R. Telang and W. L. Sastri Pansikar (Bombay, Nirnayasagar Press, 1929).

৪. 'সন্ধ্যাভাষা' সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য, শক্তিনাথ ঝা, 'ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল শিল্প' (কলিকাতা, সংবাদ, ১৯৯৫), পৃ. ২৯৫-৯৮।

৫. চৈ. চ. পৃ. ৩২২ ; Sushilkumar De, ed. *Srikrsna Karnamrtam of Lilasuka* (Dacca, Dacca University, 1938).

৬. চৈ. চ, পৃ. ২১২

৭. Sunitikumar Chatterji, Babua Misra, ed. *Varnaratnakara of Jyotirisvara Kavisekhara* (Calcutta, The Asiatic Society, 1940), pp. 46-52.

৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, 'বিদ্যাপতির পদাবলী', ভূমিকা দ্রষ্টব্য ; রাজ্যেশ্বর মিত্র সম্পাদিত, 'লোচন শর্মা-বিরচিত রাগতরঙ্গিণী' (কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ)।

৯. "লোচন শর্মা বিরচিত রাগতরঙ্গিণী', উপরে উক্ত।

১০. বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৬)।

১১. সুকুমার সেন, 'বৈষ্ণবীয় নির্বন্ধ' (কলিকাতা, রূপা এন্ড কোং, ১৯৭০), পৃ. ৭৪

১২. বিমানবিহারী মজুমদার, 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় মুদ্রণ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ)।

১৩. তদেব, পৃ. ২ ; দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৩৯-২৫২।

১৪. 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ৪৩-৭২।

১৫. 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', পৃ. ৯ ; চৈ. চ, পৃ. ২২৩।

১৬. 'গৌরপদতরঙ্গিণী', পৃ. ১৬১, পদ-১৯।

১৭. তদেব পৃ. ১৯, পদ-৪।

১৮. তদেব, পৃ. ২৬, পদ-৩৬।

১৯. 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ৫৭১।

২০. চৈ. ভা, পৃ. ২৭০।

২১. চৈ. ভা, পৃ. ২৭১।

২২. চৈ. ভা, পৃ. ২৬৯।

২৩. বৈষ্ণব পদাবলীতে কোথাও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই।

২৪. 'বৈষ্ণব পদাবলী', ভূমিকা, পৃ. ১২

২৫. Benoy Kumar Sarkar, *The Positive Background of Hindu Sociology* (Allahabad, Panini Office, 1937) : "The Positivism of Bengali Poetry", pp. 480-81, 486.

২৬. 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ২৬৭।

২৭. প্রভু জগদ্বন্ধু, 'শ্রীশ্রী হরিকথা' (কলিকাতা, মহা উদ্ধারণ মঠ, ৫ম মুদ্রণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১, ৩ ; প্রভু জগদ্বন্ধু, 'চন্দ্রপাত', উদ্ধারণ দাস-প্রকাশিত (শ্রী-অঙ্গন, ফরিদপুর, তারিখ নেই। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য)।

২৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া' (কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১) ; 'পদাবলী পরিচয়' (কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২য় সং ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) ; খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কীর্ত্তন' (কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৯৪৫)।

২৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ' (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩)।

৩০. ঘনশ্যাম, 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী', হরিদাস দাস সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটির, ১৯৪৫)।

৩১. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', শরৎচন্দ্র শীল সঙ্কলিত (কলিকাতা, শরৎচন্দ্র শীল, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)।

৩২. VIB, pp. 457-460; দ্রষ্টব্য, রাধামোহন ঠাকুর, 'পদামৃতসমুদ্র', রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (বহরমপুর, রাধারমণ প্রেস, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ) ; বৈষ্ণবদাস, 'পদকল্পতরু', পাঁচ খণ্ড, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২-৩৮ বঙ্গাব্দ) ; গৌরসুন্দর দাস, 'কীর্তনানন্দ', বনোয়ারিলাল গোস্বামী সম্পাদিত (বহরমপুর) ; দীনবন্ধু দাস, 'সংকীর্তনামৃত', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৬ সাল)।

৩৩. নরহরি চক্রবর্তী, 'গীতচন্দ্রোদয়'-পূর্বার্ধ, হরিদাস দাস-সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ১৯৪৮) ; গুরু বিপিন সিংহ, 'বৈষ্ণব সঙ্গীত শাস্ত্র' (বারাণসী, ১৯৮২)।

৩৪. "শ্রী শ্রী হরিকথা", পূর্বোক্তি, পৃ. ২১৭ ; পূর্বোক্তি 'চন্দ্রপাত' থেকে (পৃ. ৩) একটি নিদর্শন :

গড় খেমটা
উদ্ধারণ উবেষ্টন শমন শয়ন।
রাই অশ্রু দামদশ্ অনঙ্গভঙ্গন ॥
[তুই ভঙ্গ দিলি রা] [প্রভু পাত মহাপাত]

৩৫. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত, 'সঙ্গীতকোষ' (কলিকাতা, ১৮৯৫ বঙ্গাব্দ) "নগরকীর্ত্তন", পৃ. '৭৫৭-৮০০'।

৩৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'কীর্তন', পৃ. ৪৫-৪৬।

৩৭. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', প্রথমখণ্ড (বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরী ধাম ঠাকুর বাড়ী, ৭ম মুদ্রণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৭০-৭১।

৩৮. ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামঠাকুরের কথা', প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, প্রচেতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২৪।

৩৯. 'লোচন শর্মা বিরচিত রাগতরঙ্গিণী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪ ; রমাকান্ত চক্রবর্তী, "কথকতা পাঠকতা", 'সংস্কৃতি বিষয়ক যোগসূত্র', গৌতম ভদ্র সংকলিত ও সম্পাদিত, (কলিকাতা অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৯৩), পৃ. ১১৬-১৩১।

৪০. চৈ. চ. পৃ. ৭৯০।

৪১. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২, পূর্বোক্তি, পৃ. ২৬, ২৯।

৪২. (আখ্যাপত্রহীন), জয়নারায়ণ ঘোষাল, 'করুণানিধান-বিলাস', পৃ. ২৪৭।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মূল্যায়ন

চৈতন্যের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক মাত্রাসমূহ আরও ব্যাপক ও গভীর গবেষণায় আরও স্পষ্ট হতে পারে। তবুও এ পর্যন্ত এই বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে করা হয়েছে, তা থেকেও কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমেই এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিচার্য। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গে ভক্তি-আন্দোলনের গতিবেগ হ্রাস পায়। এ আন্দোলন মূলত ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত কিংবা পরিবর্তিত করতে চাননি। ভক্তির তত্ত্বে এবং অভ্যাসে জাতির বিচার গ্রাহ্য ছিল না। কিন্তু বৃহত্তর সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ ছিল, জাতপাতের বিচার ছিল। ফলত ভক্তির অভ্যাস এবং ভক্তের সুনির্দিষ্ট সামাজিক জাতি-পরিচয় দ্বৈধ-সূচক হয়ে ওঠে। অবৈষ্ণবরা এই বৈষ্ণবীয় দ্বৈধ মেনে নিতে পারলেন না। তাই দেখে বৈষ্ণবরাও নিজেদের "কুলগ্রন্থ" রচনা করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে নিজেদের জাতির বিশিষ্টতা প্রমাণিত করলেন। বলা হয়েছে :[১]

> প্রধানতঃ নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে আটখানি গ্রামের গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি-সমাজ লইয়া "আট-সমাজী থাক" হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে শ্বেজপাড়া, সিঙ্গুরিণী (চাকদহ), হুগলী জেলার চাঁপদানী (বৈদ্যবাটী) বলরামবাটী (সিঙ্গুর), বলাগড়, চব্বিশ পরগণার প্রতাপপুর, বাদুরিয়া, পুকুরকোণা, এই আট সমাজ লইয়া আট-সমাজী।

এইরূপ 'সমাজ'-বিচার ব্রাহ্মণদের ও উচ্চশূদ্রদের সমর্থন লাভ করেনি। তাঁদের বৈষ্ণব-বিদূষণের ভাষা কখনও কখনও দারুণ অশ্লীল হয়ে ওঠে। এমন অপ্রতিহত বিদূষণের প্রেক্ষিতেই শূদ্র নরোত্তম দত্তের ও সদ্‌গোপ শ্যামানন্দের কণ্ঠে সুবর্ণনির্মিত উপবীত পরিয়ে দেওয়া হল। বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণত্ব দাবী করতে থাকেন। ভক্তির অভ্যাসের ক্ষেত্রে এমন ভাবনা চলে এল যা চৈতন্য বোধহয় কল্পনাও করতে পারতেন না। একবার বলা হল যে, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আবার বলা হল যে, হরিভক্তি-পরায়ণ হলেও কোনও কোনও বৈষ্ণব জারজ, এবং সেইজন্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তার কোনও স্থান নেই। অর্থাৎ, এই তথ্যই পরিস্ফুট হ'ল যে, যেহেতু চৈতন্যের আন্দোলনের সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য কোনই সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা কর্মপন্থা স্বাভাবিক কারণেই ছিল না, তাই এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত প্রবল সামাজিক বিধির পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করল।[২] ব্রাহ্মণ্য-কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের সমালোচনা প্রায় শুরুতেই শেষ হয়ে গেল। চৈতন্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণবরা মূর্তিপূজনের বিরোধী ছিলেন না। মূর্তিপূজনের পদ্ধতি যদি থাকে, তবে অল্পবিস্তর ক্রিয়কাণ্ডও থাকে। ক্রিয়াকাণ্ড যদি থাকে তবে অল্পবিস্তর আচার-বিচারও থাকে। প্রচলিত আচারবিচারের অনেক মাত্রা ছিল। আরও একটি মাত্রা বাড়ল।

এই ঘটনাপ্রবাহকে কোনও ভাবেই তেমন কিছু গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবরা সে কথা বলেন না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :[৩]

> শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক মহত্তম আবির্ভাব, অবিস্মরণীয় প্রকাশ। পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সে এক অভিনব অভ্যুদয়। মুক্তির সে কি অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ! আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলন-উৎসবের সে কি অপরূপ সমারোহ!

আধুনিক কালে ইতিহাস-আলোচনায় "Presentism" অথবা "বর্তমানবাদ" কথাটি প্রচলিত হয়েছে। তার তাৎপর্য হল এই যে, বর্তমান অবস্থার আলোকে ধূসর অতীতকে দেখার চেষ্টা করা হয়, তার বিচার অথবা মূল্যায়ন করা হয়। চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের "বর্তমানবাদী" মূল্যায়ন কখনই বাঞ্ছনীয় নয় এই কারণে যে, এখন আমরা যা ভাবি, যা করি, তা চৈতন্যের কালে, এবং তাঁর পরবর্তীকালে ভাবা যেত না, করাও যেত না। কিন্তু তবুও তো এটাই অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন আর্থ-সামাজিক অর্থে সুগভীর তাৎপর্যবহ ছিল না। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ব্রাহ্মণেতর জাতি অবশ্যই ধর্মীয় স্বাধিকার লাভ করলেন। বৈষ্ণবী স্ত্রীলোক ধর্মীয় স্বাধিকার লাভ করলেন। নিম্নবর্গীয় শূদ্র বৈষ্ণবরা ধর্মীয় স্বাধিকার লাভ করলেন। কিন্তু তারপরেও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে এবং বৈষ্ণব সমাজে রয়ে গেল জাতবিচার, অনৈক্য, দলাদলি। এ সবের সঙ্গে রয়ে গেল বৈষ্ণবভক্তির তত্ত্বে এবং অভ্যাসে ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার, এবং ব্রাহ্মণদের স্বাধিকারের প্রমত্ততা। যাকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন" বলেন, উনিশ শতকের পূর্বে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অস্তিত্ব ছিল কি? 'বাঙ্গালি' বলে কোনও বিশেষ ধরনের প্রাদেশিকতা এবং গর্ববোধসূচক শব্দ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও কি দেখা যায়?

২

নির্মলকুমার বসুর মতে বঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলনে কোনও সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক চিন্তা দেখা যায় না।[৪] গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্পের সঙ্গে মিশ্রিত কৃষিভিত্তিক যে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল, বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রচার তাতে কোনও লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন

করেনি। জাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ব্রিটিশ পুঁজিবাদের মারাত্মক অভিঘাতে ভেঙে পড়ে। বৈষ্ণবভক্তির প্রচার হলেও বর্ণজাতিভেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত হয়ে রইল। তারই সুযোগ নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণরা এবং উচ্চশূদ্ররা একটি দুরতিক্রম্য শিষ্টবর্গ গঠন করেন। একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীরূপে বৈষ্ণবরা উনিশ শতকে সর্বপ্রকার সমাজ-সংস্কার আন্দোলন থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার আগে থেকেই তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক এবং রক্ষণশীল ছিলেন। ভক্তির প্রচারে সামাজিক চলমানতার কতগুলো লক্ষণ পরিস্ফুট হলেও তার কোনও প্রভাব স্মার্ত সমাজবীক্ষণের উপরে পড়েনি।

সমাজের বাইরে থেকে যে বৈষ্ণব ধর্মাচরণ করা যেত না, তা চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ অনুভব করেন। চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে খুব কম লোকই সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। ঘরে ঘরে গৃহস্থদের মধ্যে 'নাম' প্রচার করাই তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশ বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে সন্ন্যাসের তত্ত্ব এবং অভ্যাস প্রচলিত হল। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে"—এই নির্দেশ দেওয়া হ'ল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের। আধ্যাত্মিকতার অতি উচ্চ আদর্শের কথা বিঘোষিত হল ; সেই আদর্শের সঙ্গে মর্ত্য জীবনের সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। অথচ বলা হল : "কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিক আদর্শে এই প্রকারের অমীমাংসিত স্ববিরোধ রয়ে গেল ; তার ফলে একদিকে দেখা গেল চরম সন্ন্যাস, চূড়ান্ত দারিদ্র্যবরণ, চরম দুঃখভোগ ; অন্যদিকে দেখা গেল বহু পরিমাণে সম্পত্তি অর্জনের প্রবৃত্তি, গুরুবাদকে ভাঙিয়ে আত্মোন্নতি, পুষ্পমালা, পতাকা, এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেবাদাসী।[৮]

কিন্তু তবুও দেখা যায় যে, মধ্যকালীন বঙ্গীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্তত একটি বিষয়ে বৈষ্ণবদের কিছু অবদান ছিল। বহু জায়গায় বৈষ্ণবরা কৃষিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। বর্ধমানে রাঘনাপাড়া ছিল বাঘের জঙ্গল। সেখানে রামচন্দ্র বাঘকেই "বৈষ্ণব" বানিয়ে বিশাল শ্রীপাট গড়ে তুলেছিলেন। মেদিনীপুরে গুরু রসিকানন্দের ভাই কাশীনাথ কাশীপুর নামক গ্রাম গড়ে তোলেন। বিশেষভাবে মেদিনীপুরে ও চব্বিশ পরগণার বহু গ্রাম বৈষ্ণব কৃষকদের ও তাঁদের বৈষ্ণব ভূম্যধিকারীদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। মেদিনীপুরে ২৭২টি "বৈষ্ণবোত্তর" ভূমিখণ্ডের উল্লেখ করেছেন ডব্লু ডব্লু হান্টার।[৫] হুগলি জেলায় অনেকগুলো গ্রাম বৈষ্ণব জমিদারদের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়।[৬] ঢাকার বিক্রমপুরে ও দক্ষিণ ফরিদপুরে কোথাও কোথাও বৈষ্ণবদের "নানকার" ভূমি দেওয়া হয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলায় মৃগা গ্রামে পুরীর কয়েকজন মহান্তকে ভূমি দেওয়া হয়। তাঁরা খালিয়াজুরি পরগণাকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেন। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল বরিশালে ; সেখানে অনেক জায়গায় উড়িয়া সেবায়েতদের এনে "জগন্নাথের আখড়ী" স্থাপন করা হয়।[৭] সমস্ত তথ্য তো পাওয়া যায়নি ; সামান্য ভাবে যতটুকু তথ্য দেখা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাঢ়ে-বঙ্গে কোথাও কোথাও বৈষ্ণবধর্মের প্রচার কৃষির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে, এবং গ্রামপত্তনের সহায়ক হয়েছে।

নবদ্বীপ, পুরী এবং বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠলেও বাংলার গ্রামাঞ্চলেই তার বেশি প্রভাব ছিল। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম কখনও নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। চৈতন্যের নয়া-বৈষ্ণবতাব সঙ্গে তাই প্রচলিত গ্রামীণ অর্থনীতির সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। শঙ্কর সেনগুপ্ত ১৯৬০-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সমীক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার বারোমাসে অনুষ্ঠিত মেলার মোট সংখ্যা ৩৪৯৮ লিখেছেন।[৮] অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা'-ব পাঁচটি খণ্ডে অসংখ্য মেলার বিবরণ দেখা যায়। গোপীকান্ত কোঙার বর্ধমান জেলার মেলার সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছেন।[৯] এ সব অধ্যয়ন থেকে এ সিদ্ধান্তই করা যায় যে, শত শত বৈষ্ণবীয় মেলা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সংযোগ শক্তিশালী করে। দীনেন্দ্রকুমার রায় মুরুটিয়া গ্রামের স্নানযাত্রা-মেলার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন ; এ মেলায় অন্যান্য দোকানের সঙ্গে "বারবিলাসিনীগণের দোকান"-ও থাকত। "অর্থোপার্জনের আশায় এখানে নানা পল্লী হইতে তিনশতাধিক রূপোপজীবিনীর সমাগম হইয়াছে।[১০]

বৈষ্ণব অনুপ্রেরণায় বহু মন্দির গ্রামে গ্রামে নির্মিত হয়েছিল। মন্দির-নির্মাণ শিল্পে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকগণের কর্মসংস্থান হয়। এই শিল্পের প্রয়োজনে গ্রামীণ শিল্পেরও বিকাশ হয়। বিভিন্ন জাতির সমৃদ্ধ মানুষ মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থব্যয় করেন। তাতে অবশ্যই সামাজিক চলমানতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১]

৩

চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্য ভারতের বহু দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁরা যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সমকালীন ভক্তি-আন্দোলনের খবর রাখতেন, তা বলা বাহুল্য। বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে কিছু দূরে গেলেই পূর্ব-উত্তরপ্রদেশে যাওয়া যায়। সেখানে রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ সন্ত কবীর 'নির্গুণ'-মতবাদ প্রচার করেন। চৈতন্য এক সময়ে বারাণসীতেও কিছুদিন ছিলেন। কবীরপন্থীদের সেখানে বড় আশ্রম ছিল। তাঁদের সঙ্গে চৈতন্যের যোগাযোগের কোনও তথ্য নেই। 'নির্গুণ'-উপাসক এবং জাতবিচারের বিরোধী সন্তদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিপূজক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। অথচ দেখি, লালন ফকির যেমন চৈতন্যকে জানতেন, তেমনই জানতেন কবীরকে। লালনের নামে প্রচলিত একটি বিখ্যাত গান, "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।" জাতিভেদের অসামান্য সমালোচনাপূর্ণ এই গান কবীরের ৮৪-সংখ্যক "বীজক"-এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ।[১২] সন্তরা জাতিভেদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এইরূপ মৌলিক ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়নি।

কিন্তু একটি বিষয়ে উত্তর এবং পশ্চিমভারতীয় ভক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রে প্রচলিত

প্রাদেশিক ভাষায় ধর্মমতের ও ধর্মানুভূতির প্রকাশের উপরে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হয়েছিল। প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাঙালি বৈষ্ণবরা ভেবেছিলেন যে, "ভাবগ্রাহীজনার্দন" ভক্তের প্রার্থনায় ভাষার সরলতা কিংবা ব্যাকরণের ভুল ধরেন না। যদিও বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত ভাষার চর্চা করে খ্যাতিলাভ করেন, তবুও সংখ্যাতীত পদাবলী বিমিশ্র ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। সন্ত-সাহিত্যেরও প্রধান বাহন ছিল হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী ভাষা। এর অসাধারণ সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল। জ্ঞানদাসের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :[১৩]

> জ্ঞানদাসের কবিতা যখন শুনলুম তখন এই কথাটি বার বার মনে এল, এ যে আধুনিক! আধুনিক বলতে আমি এই কালেরই বিশেষ ছাঁদের জিনিষ বলচিনে। এসব কবিতা চিরকালই আধুনিক...পুরাতনের মধ্যে চিরন্তনকে দেখে চম্‌কে উঠি। যারা নজীর সৃষ্টি করে, নজীর অনুসরণ করে না, তারাই আধুনিক, চিরকালের আধুনিক।

বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা নানা নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও বাংলা ভাষাকে নানা আভরণে সাজিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা, বাংলা কবিতা তাঁদের সর্জনায় বড়ই সুন্দর হয়ে উঠল। এটি চৈতন্যাবদানের সর চেয়ে বড় অংশ। প্রথমে বৈষ্ণবরাই বঙ্গভাষায় মানুষের জীবনী রচনা করলেন।

কবীর প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য দিয়েছেন গবেষিকা লিন্ডা হেস্। কবীরের 'বীজক'-এ কৃষ্ণ উল্লিখিত হননি। কিন্তু কবীরের দোহাবলির 'পশ্চিমী' সংকলনে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ প্রায়শ দেখা যায়। শ্রীমতী হেস অনুমান করেছেন যে, প্রধানত চৈতন্যের ও বল্লভাচার্যের প্রভাবেই তা দেখা যায়।[১৪] অথচ বারাণসীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না।[১৫]

৪

জীবন ছাড়া ধর্ম নেই। চৈতন্যের নিত্যানন্দের প্রভাবকে বুঝতে হলে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। 'বাঙ্গালি' মানে তো কেবল ব্রাহ্মণ আর উচ্চশূদ্র বাঙ্গালি নয়। 'বাঙ্গালি' মানে কৃষক কামার কুমার তেলি মালি জেলে কৈবর্ত ভুঁইমালি নমশূদ্র বাগদি ধোবা, নাপিত, তাঁতি, ছুতার, গৃহভৃত্য, দাসী, ছোট দোকানদার, মুদি, শুঁড়ি, হালুইকর, এবং অবশ্যই মুসলমান। এঁদের উপরে চৈতন্যের নিত্যানন্দের প্রভাব অবশ্যই আলোচ্য।

বিষয়টি সম্বন্ধে এইচ. এইচ. রিজ্‌লি-রচিত 'দি ট্রাইব্‌স্ অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল' গ্রন্থের দুইটি খণ্ডে বহু তথ্য দেখা যায়। তাতে এমন একচল্লিশটি জাতির ও উপজাতির উল্লেখ আছে, যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে বৈষ্ণব ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন :

আগুরি, কণ্ডু, কপালি, কৈরি, কোরা, কুমার, কুর্মি, কৈবর্ত, কামার, খণ্ডাইৎ, ক্ষত্রি,

জাতবৈষ্ণব, গন্ধবণিক, গড়েড়ি, গাঁড়ি, গোয়ালা; চণ্ডাল, চাষাধোবা, ডোম, তাম্বুলি, তাঁতি, তেলি, তিয়র, দোস্যাদ, ধোবা, নাপিত, পটিয়াল, পোদ, বৈদ্য, মালো, মাল; মুচি, ময়রা, রাজওয়ার, যুগি, শাঁখারি, শুঁড়ি, সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর; হালাওয়াই।

প্রসঙ্গত বিজ্‌লি মন্তব্য করেছেন :[১৬] It is a singular fact that while the teaching of Chitanya has united almost all the artisan and agricultural castes in a common faith, the three highest and most intelligent castes in Bengal adhere as a rule to the Sakta ritnal.

সমগ্র বিষয়টিকে বিচার-করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন :[১৭] Even greater than this moral reformation of the upper and middle classes, has been the work of Vaishnavism in uplifting the lower ranks of society and the illiterate masses, by carrying religion to their doors... The Vaishnava Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after ages of neglect, contumely and superstition.

নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসারে বৈষ্ণবদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। পাদ্রি ওয়ার্ড ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, তাঁতি, নাপিত, কৃষক, তেলি, শুঁড়ি, সোনার বেনে প্রভৃতি নিম্নজাতির লোকরা সংস্কৃত পুরাণসমূহের বঙ্গানুবাদ পড়তে পারতেন।[১৮] সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রচিত ৪৯২-টি বৈষ্ণব পুঁথির/গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন।[১৯] তাদের অধিকাংশই এমন সব বৈষ্ণবদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, যাঁরা প্রকৃত অর্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন না। ব্যাপক সাক্ষরতা না থাকলে এ সব রচনার প্রচার সম্ভব হত না। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে কলকাতায় পোস্তার রাজা শিবচন্দ্র বাহাদুরের কন্যা হরসুন্দরী দাসী এক কিশোরী বৈষ্ণবীর সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন।[২০] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের শিক্ষিকারূপে একজন 'বোষ্টমী'-কে নিযুক্ত করা হয়।[২১]

বঙ্গে লোককৃষ্টির বিভিন্ন ধারায় বৈষ্ণব ধর্মের সুগভীর প্রভাব দেখা যায়। কেবল একটি মাত্র নিদর্শনের সাহায্যে এখানে বিষয়টি আলোচ্য। বিভিন্ন ধরনের লোকগীতিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ও প্রেমোন্মাদনার প্রতীক। এই রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। হিন্দু-মুসলমান লোককবিগণ এই রাধাকৃষ্ণকে সমানভাবে ভালবাসেন। প্রেমবিষয়ক লোকগানে পদাবলী-কীর্তনের 'বিরহ'-এর ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু যাঁরা এ ধরনের গান রচনা করেছিলেন, তাঁরা 'ভাব'-এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'ভাব'বিষয়ক সুগভীর তত্ত্ব জানতেন না। এ ধরনের গানে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের দুঃখের ও অভাবের ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করতেন যে, বৈষ্ণবতার প্রভাবে বাংলার লোকগীতির মৌল সংগ্রামী সুরটি হারিয়ে গেছে।[২২] তাঁর এরূপ ভাবনার কোনও প্রমাণ নেই। কানু ছাড়া গীত ছিল কি? যদি, 'ভক্তি'-র প্রসঙ্গ ওঠে, তবে বলা যায় যে, 'ভক্তি',

'প্রেমভক্তি', কিছুটা "ধর্মীয়" লোকগীতিতে সুস্পষ্ট। সারি, জারি প্রভৃতি "কর্মসঙ্গীত"-এ যে রাধাকৃষ্ণ উল্লিখিত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত এটাও বলা যায় যে, কখনও কখনও পদাবলীও লোকভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে বহু মুসলমান-কবি বৈষ্ণব গান রচনা করেছিলেন।[২৩] ময়মনসিংহের মহিলা কবি সুলোচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন। তিনি ছিলেন নমশূদ্রা। ঘাঁটু, ঘাঁটু-তোলেনা, পৌষ-পার্বণ, পটুয়া, রাসলীলা, বাধা-বারমাস্যা, বসন্ত প্রভৃতি গানেও বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়। রাধা-বারমাস্যার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সম্ভবত উত্তর ভারত থেকে বঙ্গে এসেছিল।[২৪] কোনও-কোনও লোকগীতিতে "গৌরনাগর" ভাবের প্রভাব দেখা যায়।

৫

নরোত্তম দত্ত লিখেছিলেন :[২৫]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবীদেবা
এই ভক্তি পরমকারণ ॥

অথচ, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে বঙ্গে ধর্মীয় সমন্বয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বহু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সাংসারিক উন্নতিবিধানের জন্য "সভায়" বৈষ্ণব সাজেন। তাঁরা ছিলেন অন্তরে শাক্ত, বাইরে শৈব, এবং সভায় বৈষ্ণব। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন :[২৬] These so-called Gossains are not recognised as such in any authoritative work of the sect, and in fact they are Sakta Brahmans partially converted to the Chaitanite faith on account of its lucrativeness, but yet conducting themselves now and then as Sakti worshippers... নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের স্বাভাবিক ফল ছিল ধর্ম-সমন্বয় ; বৈষ্ণব হলেও তাঁরা তাঁদের গ্রামদেবতাদের ভুলতে পারেননি। এই গ্রামদেবতাদের "কাঁচাখেকো"-চরিত্র অদ্যাবধি দেখা যায়।

গ্রামে গ্রামে, এবং বহু সম্পন্ন গৃহে বৈষ্ণব ও শৈবমন্দির পাশাপাশি নির্মিত হয়। 'বৃহৎরুদ্রযামলতন্ত্র'-এর একটি অপ্রকাশিত পুথিতে দেখি, কৃষ্ণ নারদকে যৌন-যৌগিক "সিদ্ধাচার"-এর বিবরণ দিতে দিতে অজাচারকেও সমর্থন করেছেন। একজন নাথযোগী কৃষ্ণ এবং চৈতন্যকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেন, এবং সনাতন গোস্বামীকে একজন মুসলমান সাধক "মুর্শিদ"রূপে উল্লেখ করেন।[২৭] আলি রাজা তাঁর 'জ্ঞানসাগর'-এ লিখেছেন :[২৮] বৈষ্ণব সবের বন্ধু/সাবানের [অর্থাৎ সকলের] প্রেমসিন্ধু/ফকির আনন্দ সরোবর ॥" দাস্যভাবের সাধক পানুঙা গোপাল এক ফকিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ; এ তথ্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।[২৯] কবি সৈয়দ মর্তুজা লিখেছিলেন :[৩০]

সৈয়দ মরতুজা ভনে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।

সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়
জীবন মরণ ভরি ॥

কবি নসির মামুদ লিখেছিলেন :[৩১]

আগমনিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বহু মন্দিরে ধর্মসমন্বয় সুস্পষ্ট। বাঁকুড়ার শ্রীধর-মন্দিরে শিবপরিণয়ের ও কার্ত্তিকের আবির্ভাবের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ হয়েছে। ইলামবাজারের (বীরভূমে অবস্থিত) লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে দশভুজা মহিষমর্দিনী উৎকীর্ণ হয়েছেন। মহিষমর্দিনী শোভা পাচ্ছেন হুগলির বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের দেয়ালে। মুর্শিদাবাদের বড়নগরের কালীমন্দিরে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও দানলীলা উৎকীর্ণ হয়েছে। মুসলমান প্রশাসকগণ রাঢ়ে বঙ্গে অসংখ্য মন্দির নির্মাণে বাধা দেননি। মেলায় জাতবিচার ছিল না।

রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতকে যে কোমল শাক্তপদাবলী লিখেছিলেন, তাতে বৈষ্ণবপ্রভাব বড় সামান্য নয়। কৃষ্ণের ও গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনে যে বাৎসল্যরসের প্রকাশ দেখা যায়, তা শাক্ত আগমনী গানে সুস্পষ্ট। মহাকবি ভারতচন্দ্র বেশ কিছু বৈষ্ণব গান রচনা করেছেন।[৩২] এ সব গান কীর্তন নয়।

৬

আসামের রাজা গদাধর সিংহ (১৬৮১-১৬৯১) দেখলেন যে, শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মান্দোলন জনপ্রিয় হওয়ার ফলে আসামের লোকজন বড়ই শান্তিপ্রিয় ও "নিরামিষ" হয়ে পড়েছেন। তাই দেখে গদাধর সিংহ স্থানীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রভাব নষ্ট করে ফেলতে চান। যদুনাথ সরকার রাজার এইরূপ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে লিখেছেন :[৩৩]

> ...by its exaltation of pacifism and patient suffering...(Vaisnavism) sapped the martial instinct of the race and made the people too soft to conduct national defence...it relaxed the fibres of the national character in the field of action...

উড়িষ্যার 'গজপতি'-রাজাদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার জন্য, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের পতনের জন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যায় চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকেই দায়ী করেন।[৩৪] কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন : "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" অর্থাৎ, বাঙালির হিয়া আগে থেকেই যথেষ্ট নরম ছিল ;

নিমাই কায়াধারণ করে তাকে আরও নরম করে ফেললেন। এইরূপ চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায় ; তিনি বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন :[৩৫]

> সেখানে (অর্থাৎ রাঢ়েবঙ্গে) আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল...এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা অধ্যাত্মীয় ; বর্তমান প্রসঙ্গে তা আলোচ্য নয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যে কোন বুদ্ধিতে এমন একটা অসার মন্তব্য করেলেন, তা তো বোঝা যায় না। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, বিখ্যাত *The History of Bengal: Muslim Period* (Patna, Janaki Prakashan, 1977) গ্রন্থে, দশম থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মুগল যুগের বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে-সব তথ্য উল্লিখিত এবং আলোচিত হয়েছে, তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালিদের সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তিকেই নষ্ট করে ফেলেছিল। রঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্য রায়কে "ব্যাঘ্রমানব" বললে অত্যুক্তি হয় না। সীতারাম রায়ও দুর্দান্ত বীর ছিলেন ; তিনি কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাঢ়েবঙ্গে মুগলদের বার বার বিপদে পড়তে হয়। সেখানে মুগল সাম্রাজ্য গঠন সহজ ছিল না। এ সব ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন যদুনাথ সরকার। তা থেকে নিশ্চয় এ তত্ত্ব দাঁড়ায় না যে, বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালিদের দুর্বল করে দেয়। নরোত্তম দত্ত অনেক ডাকাত জমিদারকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব হওয়ার পরে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেছিলেন কি না, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। বিষয়টি সম্বন্ধে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন :[৩৬]

> এ সব ভাবনা অগভীর অলস কল্পনা মাত্র, ইতিহাস সমর্থিত ও যুক্তিসম্মত নয়।... বরং বলিতে পারি চৈতন্য বাঙ্গালীকে একটা বৃহৎ উদ্যমের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে নানারূপ ষড়যন্ত্রে, অযোগ্য ব্যক্তিদের শাসনে উড়িষ্যা দুর্বল হয়ে পড়ে। তার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম দায়ী ছিল না। চৈতন্য যখন পুরীতে ছিলেন তখন বাংলার সুলতান হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করেননি।[৩৭]

এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রের ও সমাজের মধ্যযুগীয় অবস্থায় যখন উদারনীতির সামাজিক-রাজনৈতিক ভাষ্যের নামগন্ধও ছিল না, তখন চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ভক্তি-আন্দোলনে জীবনদর্শন এবং সমাজদর্শন কিছুটা উদার হয়ে উঠল। সেই উদারতার প্রভাবে সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি গতিশীল হয়ে উঠল। এই অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে রেনেসাঁস বললে কোনও অপরাধ হয় না। একটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ থাকার জন্য তা তৃণমূলস্তরেও কিছুটা আসে। এমন ঘটনা কিন্তু উনিশ শতকে ঘটেনি। অথচ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিরন্তর প্রচারে অভিভূত হয়ে আমরা সর্বদা উনিশ শতকের

বাঙালি-রেনেসাঁস-এর প্রসঙ্গ তুলে গর্বে প্রায় উদ্ধত হয়ে পড়ি। অবশ্যই চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের বহু ত্রুটি ছিল। সেগুলো এ গ্রন্থে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি তার অসামান্য অবদানকে অস্বীকার করতে হবে ?

সূত্রের উল্লেখ

১· মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০, পাদটীকা

২· চৈতন্যাবদানের মূল্যায়ন : দ্রষ্টব্য Rajendralala Mitra, ed. *Caitanya-Candrodaya on The Incarnation of Caitanya: A Drama in Ten Acts by Kavi Karnapura* (Calcutta, Printed at the Baptist Mission Press, 1854) "Introduction", p. I

৩· 'বৈষ্ণব পদাবলী', ভূমিকা, পৃ. ১১

৪· নির্মলকুমার বসু, 'হিন্দু সমাজের গড়ন' (কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬ সাল) পৃ. ১, ১-১২, ১১৭-১১৯। এই বিষয়ের জন্য বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Joseph T. O' Connell, *Religious Movements And Social Structure : The Case of Chaitanya's Vaisnavas of Bengal* (Simla 1993) pp. 33-39

৫· W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. p. 96

৬· Ramakanta Chakrabarty, "Vaisnavism In Hooghly District", পূর্বোক্ত, 'হুগলী মহসিন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' দ্রষ্টব্য।

৭· হিমাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, 'বিক্রমপুর'-৩, পৃ. ৩৮১ ; *Bengal District Gazetteers, Mymensingh*, p. 153, নির্মলকুমার বসু 'বিয়াল্লিশের বাংলা' (কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২

৮· শঙ্কর সেনগুপ্ত, 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি', (কলিকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৭২), পৃ. ১৬২

৯· গোপীকান্ত কোঙার, 'বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' (কলিকাতা, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রা. লি. তারিখ নেই)

১০· দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'পল্লীচিত্র' (কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৮) পৃ. ৫৫

১১· এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়, পাদটীকা-১৯।

১২· Linda Hess, Sukhdev Singh, *The Bijak of Kabir* (Delhi, Motilal Banarsidass, 1986), pp. 69-70

১৩· ক্ষিতিমোহন সেন, 'দাদূ' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), ভূমিকা, পৃ. ২

১৪· Linda Hess, "Three Kabir Collections", Karine Schomer, W.H. Mcleod ed. *The Saints: Studies In a Devotional Tradition of India* (Delhi, Motilal Banarsidass, 1987) pp. 123-124

১৫· চৈ. চ. পৃ. ৬৫১-৫২ : চৈতন্য বলেছিলেন : "কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালী। কাশীতে গ্রাহক নাহি বস্তু না বিকায়। পুনরপি দেশে বহি লওয়া নাহি যায়॥"

১৬· Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p. 442*

১৭· *History of Bengal, Muslim Period*, pp. 221-222

১৮· Ward, *Account*, পূর্বোক্ত, IV, p. 71

১৯· 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২ দ্রষ্টব্য।

২০· ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪০৫। উনিশ শতকে এলাহাবাদে প্রখ্যাত সাধক ছিলেন গোপাল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর মাধোদাস বাবাজী। তাঁর পিসিমা 'গোবিন্দ', এবং ভগ্নী 'হরি' পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্রষ্টব্য, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' (কলিকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৩১) "প্রয়াগ", পৃ. ৯৩-৯৪

২১· দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬২), পৃ. ২৫২ ; সুশীলকুমার রায় সম্পাদিত, 'বঙ্গপ্রসঙ্গ' (কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশনা ভবন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫

২২· হেমাঙ্গ বিশ্বাস, "লোকসঙ্গীতের সঙ্কট", 'সাহিত্যপত্র', আষাঢ় ১৩৭৭, পৃ. ৯

২৩· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, "বঙ্গের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) ; দ্রষ্টব্য, Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (Princeton, New Jersey, 1983); Edwards C. Dimock, *Jr.* "Muslim Vaisnava Poets of Bengal", David Kopf, ed. *Bengal, Regional Identity* (East Lansing, Michigan, 1969)

২৪· M.S. Randhwa, *Kangra Paintings of Love* (New Delhi, National Museum, 1962), pp. 133-46

২৫· 'শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিতত্ত্বসার', পৃ. ৩১৬

২৬· Hindu Castes and Sects, p. 367.

২৭· পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি পরিচয়', ১, পৃ. ৬৭

২৮· আলি রাজা, 'জ্ঞানসাগর', আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪ সাল) পৃ. ২৯

২৯· হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' (কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭২), পৃ. ৩৩, ৪১

৩০· 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃ. ১০৭০

৩১· তদেব, পৃ. ১০৭৪

৩২· ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় সং ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), যেমন : পৃ. ১৬৭-৬৮, "গুণসাগর নাগর রায়", পৃ. ১৬৯-৭০, "ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে" ; পৃ. ১৭৪, "এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে" ; পৃ. ১৮২-৮৩, "নবনাগরী নাগর মোহিনী"। এবং পৃ. ২২১, "বড় রসিয়া নাগর হে" ।

৩৩· *History of Bengal, Muslim Period, pp. 222-23*

৩৪· *Prabhat Mukherjee, The History of Mediaeval Vaisnavism In Orissa* পূর্বোক্ত, ch. II, pp. 170-78

৩৫· 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২ যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত (কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২য় সং, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৯১

৩৬· সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

৩৭· Prabhat Mukherjee, উপরে উক্ত, pp. 177-78

নির্ঘণ্ট

অকিঞ্চন দাস ১২৭-১২৯
অজামীল ৩১
অচিন্ত্য ভেদাভেদ ৬২-৬৩
অচ্যুত (রাজা) ১০৩
অচ্যুতানন্দ ৭৪-৭৫, ৮৮
অদ্বৈত আচার্য ৩৫, ৩৭, ৪১, ৭৪-৭৬, ১০১, ১০৪, ১০৮, ১১১, ১৪৩
অদ্বৈত পরিবার ১৪৩
'অদ্বৈত প্রকাশ' ৭৫
'অদ্বৈত মঙ্গল' ৭৫
অতিবড়ি ৪৭, ৬৬
অধিকারী ১৪৪
অনন্ত দাস ৭৫
অনিরুদ্ধ ভট্ট ১৪
অনুসূচিত জাতি ১৭০-১৭১
অপভ্রংশ ১৫১
অবহট্ট ১২, ১৩, ১৫১
অভিনন্দ ১৩
'অভিরামলীলামৃত' ১০১
অভিরাম রামদাস ৭৮, ১০১-১০২, ১৪৩
অমূল্যধন রায় ভট্ট ৯৮
অমৃতবাজার গ্রাম ১১২
অম্বিকা কালনা ৯৭
অম্বুয়া ৮০
অরোরা গ্রাম ১১৪, ১২৫-১২৬
অর্থনীতি ১৬৮-১৬৯
'অলঙ্কারকৌস্তুভ' ৮৫
অষ্টকালীন লীলা ৯৩-৯৪
অষ্টশিক্ষা শ্লোক ৪৮-৫০

আউল মনোহর দাস ১০৪
আওরাংজেব ৭৩
আকনা ৮০
আকবর ৭৩, ১০৩
আকাইহাট ৯৭
আখর ১৬০-১৬১
আজমীর ১৩৫
আটপুর ১০১-১০২
আড়িয়াদহ ৭৮
আড়িয়াল ১১১
আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ৭৭
'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' ৮৫
আনন্দ কসবী ১৩৯
আবুল ফজল ১৩৬
আমাইপুরা ৯৯
আর্চার, ডব্লু, জি. ১১
আলমগঞ্জ ১০৪
আলি রাজা ১৭২
আশুতোষ ভট্টচার্য ২১
আসাম ১৭৩
আহ্‌মদ বেগ ১০৫

ইদাস ১৩৯
ইছাপুর গ্রাম ১৩৫
ইলামবাজার ১৭৩

ঈশ্বর দাস ৪৭
ঈশ্বর পুরী ৩৫
ঈশান নাগর ৭৫, ১১০

উড়িষ্যা ২০, ১৫২
'উজ্জ্বলনীলমণি' ৫৩, ৬৭, ৬৮, ৮৫, ১৫৯
উখরা ১০০ ১৩৯
উত্তরবঙ্গ ১৭
উদ্দণ্ড রায় ১০৫
উদয়নাচার্য ২২
উপনিষৎ ৬০
উদ্ধারণপুর ৮০
উদ্ধারণ দত্ত ১০১-১০২
উমাপতিধর ১৩

ঋভু গুপ্ত ১০

একাক্ষরী মন্ত্র ১৪৪
এড্ওয়ার্ড সি. ডিমোক ১২৭
এম. এন. শ্রীনিবাস ১৩২

কথকতা ১৬২-১৬৩
কপীন্দ্রী ৮৯
কবিকঙ্কন মুকুন্দ ৯৭, ১৩৬
কবি কর্ণপূর ৪৬, ৮৫-৮৬, ৮৮
কবিচন্দ্র ১০০
কবিরঞ্জন ১০০
কবিশেখর ৯২, ৯৮, ১০০, ১৫৬
কবীর ১৭০
কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন ১১২-
কমলাকর পিপ্পলাই ৮৮, ১০১-১০২
কমলাকান্ত দাস ১৬০
'কল্কিপুরাণ' ১৪
কর্ণাটক ৫২
কর্ণানন্দ ৮৬
কাঁচড়াপাড়া ৮০
কাঁথি ১০৫
কাঁদরা ৮৯
কাগজপুকুরিয়া ৮০
কাঞ্চনগড়িয়া ১১৬
কাজী-দলন ১৫৬
কাটাবনী ১২১
কাটোয়া ৮৭, ৯৯, ১০০
কাননডাঙ্গা ৯৯
কানাইনাটশাল ১৭
কানাড়া ১৫১
কানুরাম ১২৪
কানুপণ্ডিত ৭৫
কান্তবাবু ১১৬
কান্তজী মন্দির ১১৪
কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ২১
'কালচক্রতন্ত্র' ১৪
কালনা ৯৯, ১০২-১০৩
কালাকৃষ্ণ দাস ৯৭-৯৮, ১১৪
কালাচাঁদ বিদ্যালংকার ১৩৫
কালী ১৩৮
কালীনাথ আচার্য (কেশব ভারতী) ৯৯
কামদেবনাগর ৭৫
কামারহাটি ৩৫
কাশিমবাজার ১১৬
কাশীশ্বর ১০১
কাশীশ্বর ১০১
কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ ৮৮
'কিরণাবলী' ২২
কিশোরগঞ্জ ১০৯
কিশোরীভজন ১৩৫, ১৩৮
'কীর্তনানন্দ' ১৬০
কুক্কুটীমর্কটীব্রত ২১
কুচবিহার ১১৪
কুড়িগ্রাম ১১৪
কুজীবাই ১৩৯
কুমুদনাথ মল্লিক ২১
কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ১৬১
কুলশেখর ১৩
কুলীনগ্রাম ১৮, ৩৫, ৯৬-৯৭
'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' ১৮
কৃষ্ণ ১১, ৩০, ৩৩, ৫৯-৬০, ৬৩-৬৪, ৬৫, ১১৪, ১২৫-১২৬, ১৩১, ১৩৮
কৃষ্ণ মিশ্র ৭৫
কৃষ্ণ মিশ্র যতি ১১
কৃষ্ণকুমার মিত্র ১০৯
কৃষ্ণচরণ ১১৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৬, ২৮, ৩১-৩২, ৩৫-৩৬, ৪৫-৪৬, ৪৭-৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪-৫৭, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৭৩-৭৪, ৭৫, ৭৮, ৯৯, ১২৮, ১৩৪, ১৫২, ১৬২-৬৩
কৃষ্ণদাস ঠাকুর ১০২
কৃষ্ণদাস মুৎসুদ্দি ১১০
কৃষ্ণধামালী ১৭
কৃষ্ণনগর ১১৪
কৃষ্ণনগর গ্রাম ১১২
কৃষ্ণপুর ১০১

'কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' ১২৪
কৃষ্ণরাম বসু ১০২
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ২০
কৃষ্ণানন্দ দত্ত ৮৬
কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ১২১
'কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী' ৮৫
কেঁদুলী ১৩৯
কেওন্‌ঝর ১০৫
কেওরগ্রাম ১০
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ১৩৬
কেতুগ্রাম ১০০
কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ৮২৪, ১৪৫-১৪৬
কেরৌলি ৭৩
কেশব ছেত্রী ১১৩
কেশব ভারতী ৩৯, ৪২, ৭৬, ৯৯
কেশিয়ারি ১০৫
কোঙার পাড়া ১১৬
কোগ্রাম ৯৮, ১২১
কোটা ৭৩
কোতরং ৮০
কোনার্ক ১১
কোসাম্বি, দামোদর ধর্মানন্দ ১১
'কৌলিকার্চনদীপিকা' ২০
'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি' ১৫৯
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২১
'ক্রমদীপিকা' ১১৯
'ক্রিয়াযোগসার' ১৪

খঞ্জ ভগবান আচার্য ১০২
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬১
খড়দহ ৭৮, ১৪০
খাগরা ১১৫
খানাকুল-কৃষ্ণনগর ১০১, ১০২
খালিয়াজুরি পরগণা ১০৯
খালিমপুর লেখ ৯
খুড়ো ১৪৪
খেতুরী ৮৬, ১০৩, ১৫৮
খেতুরী উৎসব ৮৭-৮৯
খোট্টেগ্রাম ৯৯

খ্বাজা মইন্‌উদ্‌দীন চিস্তি ১৩৫

গঙ্গা দেবী ১০৩
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ১১৩, ১১৫
গজপতি ১০৫
গড়ানহাটি কীর্তন ১৫৮
গদাধর দাস ৭৮, ৮৭
গদাধর পণ্ডিত ৬৪, ৮৪, ৮৭, ৯৭, ১৪৩, ১৫৯
গদাধর সিংহ ১৭৩
গয়া ১০
গয়েশপুর ১১২, ১১৩
গর্ভেতা ১১২
গাইবান্ধা ১১৪
'গীতগোবিন্দ' ১২, ১৩, ১৫১-১৫২
'গীতচন্দ্রোদয়' ১৬০
'গীতাভাষ্য' ১১৫
'গুটিকা' ৯৩
গুড়াপ ১০২
গুণরাজ খান ১৮
গুণাইঘর লেখ ৯
গুপ্তিপাড়া ১০১-১০২, ১০৩
গুরুবাদী সম্প্রদায় ১৩৭
গোকুলদাস ১০৫
গোকুলানন্দ ঠাকুর ১২১
গোকুলানন্দ সেন ১০০
গোপাল ৭৫, ৯১
'গোপালচম্পূ' ৫৩, ১১৩, ১৪৫
গোপাল ঠাকুর ১০১
গোপাল দাস ৬৫
গোপালদাসপুর ৯৯
গোপালপুর ৮৭
গোপাল বসু ১০২
গোপালভট্ট গোস্বামী ৫২, ৭২, ৮৬, ১৩২
'গোপীচন্দ্রের গান' ১১৪
গোপীজনবল্লভ দাস ৮৬
গোপীনাথপুর ১৩৯
গোপীবল্লভপুর ১০৪, ১৩৩
গোবর্ধন ১০০
গোবর্ধন আচার্য ১১, ১৩

গোরিন্দ কর্মকার ৯৯
গোবিন্দ ঘোষ ১০০, ১৩১
গোবিন্দ দাস (মেদিনীপুর) ৪০৫
গোবিন্দদাস কবিরাজ ৮৮, ৯৮, ১৫৫, ১৫৬-১৫৮, ১৬২-১৬৩
'গোবিন্দদাসের কড়চা' ১০০
'গোবিন্দবল্লভ' ১২৪
গোবিন্দবল্লভপুর ১০৪, ১৩৩
গোবিন্দ বাঁড়ুয্যা ১১৩
গোবিন্দমাণিক্য ১০৯
গোবিন্দপুর ১০৪
'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' ১৫৯
গোবিন্দানন্দ ২১
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ১৩১
গোলোকমণি রাড় ১৩৯-১৪০
গোস্বামী-মালিগাড়া ১০২
গৌড়নগর ৫২, ১১৩, ১৪৫
গৌড় মার্গ ২০
গৌড় সম্প্রদায় (তান্ত্রিক) ২০
'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' ১০০
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রমাণ ৫৮
গৌড়ীয় মিশন ১৪৫
'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ৮৫
'গৌরগোবিন্দার্চনস্মরণপদ্ধতি' ৯৩
গৌরচন্দ্রিকা ৯৩, ১৫৮
গৌরনাগরবাদ ৮৩-৮৪, ১৭২
গৌরপারম্যবাদ ৮৯
গৌরীদাস পণ্ডিত ৯৭, ১০৩

ঘটি-বাঙ্গাল দ্বন্দ্ব ১০৮
ঘনশ্যাম ১০০, ১৫৯, ১৬৩
ঘাটশীলা ১০৫

চক্রপাণি ১৩
চক্রপাণি চৌধুরী ৯৮
চট্টগ্রাম ১০৯
চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য ১৮
চণ্ডী ২১
চণ্ডীদাস ১৭, ১৮, ১৫৭
'চণ্ডীমঙ্গল' ৯৭
চন্দননগর ১০১
চন্দ্রবর্মণ ৯
চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী ১১১
চন্দ্রভানু রাজা ১৩৫
চন্দ্রমণ্ডল ৯৭
চন্দ্রমণি রাঢ় ১৪০
চন্দ্রশেখর ১০০
চব্বিশ পরগণা ১৪৩
চম্পাহাটি ১০৩
'চর্যাগীতি' ১৫২
চাঁদ রায় ১১৩
চাঁদপুর ১১২
চিড়ামহোৎসব ৭৯-৮০
চিরঞ্জীব সেন ৯৮-৯৯
চুঁচুড়া ১০১
চূড়ামণি দাস ৭৬
চূড়াধারী ৮৯
চেঙ্গুটিয়া-প্রেমভাগ ১১১
চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর ১৩৯
চৈতন্যদাস (বীর হাম্বীর) ৮৭
'চৈতন্যবিজয় কীর্তন' ৪১
'চৈতন্য ভাগবত' (ঈশ্বর দাস-রচিত) ৪৭
'চৈতন্যমঙ্গল' ৯৭
চৌহট্ট ৮০

ছড়িদার ১৪৪
ছত্রভোগ ৮০
ছাতরা ৮০
ছোট হরিদাস ৪৩

জঙ্গলী ১১৩
জঙ্গলীটোলা ১১৩
জগদানন্দ ১০০, ১২৪
জগদানন্দ শর্মা ২০
জগদীশ পণ্ডিত-পরিবার ১৪৩
জগন্নাথ চক্রবর্তী ১১৫
জগন্নাথ দাস ৪৭
জগন্নাথ মিশ্র ৩৪
জগন্মোহনী সম্প্রদায় ১৩৫
জগাই ২৫, ৩৭
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ১৪৫
জপসা ১১১
জয়গোপাল তর্কালংকার ১৮
জয়গোপাল দাস ৮৯, ১৩৩, ১৬৩
জয়দেব ১১, ১২, ১৫১-৫২
জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৬৩
জয়পুর ৭৩
জয়সিংহ ৬৫
জয়ানন্দ ৯৭, ৯৯-১০০
জাঙ্গিপাড়া ১০২
জাহ্নবা দেবী ৭৮, ৮৬, ৮৭, ৯৭, ১০২, ১২০-১২১
জীব গোস্বামী ৩০-৩১, ৫২, ৬৫-৬৬, ৭৩, ৮৬-৮৭, ১০৩
জীমূতবাহন ২১
জেমস্ ওয়াইজ্ ১১০, ১৪৪
জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি ১৭১
জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য ১৫২
জ্ঞানদাস ৮৮, ১০০, ১৫৬, ১৭০

ঝাড়খণ্ডী-কীর্তন ১৫৯
ঝামটপুর ৫৪, ৯৯

টড্ ৭৩
টেয়া-বৈদ্যপুর ১১৬

ঠাকুর জীবন ১০৮
ঠাকুর বাণী ১০৮
ঠাকুর হরিচাঁদ ১৩৯

ডেভিড ম্যাককাচন্ ১০০

ঢাকা ১০, ৭৫, ১১০-১১১, ১৪৩
ঢাকাই বোষ্টম ১৪৫

'তন্ত্ররত্নাকর' ৬৬
তরাস ১১৪
তাম্বুলি ৮০
তালতলা হাট ১১২
তালেশ্বর গ্রাম ১১১
তিরহুত ৩০
তুক্ক ১৬০-১৬১
তেওতার জমিদারগণ ১১০
তেলিয়াবুধুরি ১১৬
তোডরমল ৭৩
ত্রিদন্ডী ভিক্ষু ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ৪১
ত্রিপুরা ১০

দক্ষিণ বিহার ৬৮
'দক্ষিণনায়ক' ৬৮
দধিয়া-বৈরাগীতলা ১০০
'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' ৯৪
দময়ন্তী ৪৬
দয়ারাম ১১২
দয়ারাম দেব ১০০
দশঘরা ১০১
'দশরূপক' ৬৮
দাক্ষিণাত্য কবি ১৩
'দানকেলিকৌমুদীভণিকা' ৫৩
'দানকেলিচিন্তামণি' ৫৩
'দানসাগর' ১৩
দামোদর যোগী ১০৩
দামোদরপুর লেখ ৯
দিনাজপুর ১০, ১১৪, ১৪৩
দিবাকর দাস ৪৭
দিব্যসিংহ ১০৮
দীনবন্ধু দাস ১৬০
দুরিকা ১০৩
'দুর্গমসঙ্গমনী টীকা' ৩০
'দুর্গোৎসববিবেক' ২১
দেওপাড়া লেখ ১০
দেনুড় ৯৯
দেবী সিংহ ১১৬
দোগাছিয়া ৮০
দ্বাদশ উপগোপাল ৭৯
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১২৪
দ্বারভাঙ্গা ১৬
দ্বিজ হরিদাসাচার্য ১১৫
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬

ধনঞ্জয় ৬৮
ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৯৭-৯৮
ধনাইদহ লেখ ৯
ধনেখালি ১০২-১০৩
ধর্মপূজা ২১
ধামাস গ্রাম ১২১
ধারেন্দা-বাহাদুরপুর ৮৬-৮৭, ১০৩-১০৪

নড়িয়া ১১১
নদীয়া ৭৫, ৮০, ১৪৩
নন্দকিশোর গোস্বামী ১৫৯
নন্দকিশোর প্রামাণিক ১০৯
নন্দনী ৭৫, ১১৩
নবদ্বীপ ২০-২১, ২২, ২৭, ৩৫, ৩৮, ৫৩-৫৪, ৬৬, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৩, ১০৩, ১২২
নবীনপুর ১০৯
নব্যন্যায় ২২-২৩
নব্যস্মৃতি ২১-২২, ২৪-২৫
নয়নানন্দ ১২৪-১২৫
নয়নানন্দ কবিরাজ ১০০
'নরসিংহপুরাণ' ১৪
নরহরি চক্রবর্তী ৮৬, ১১৫, ১৫৭-১৫৮, ১৬০
নরহরি সরকার ৬৬, ৮৩-৮৪, ৮৭, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১৫৬
নরহরিদেব আচার্য ১৩৯
নরোত্তম দত্ত ৮৬-৮৯, ৯১-৯২, ১০২-১০৩, ১০৫, ১১৩, ১৩২, ১৩৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৭২
নরোত্তম দাস ১৪০
নসিপুর ১১৬
নসির মামুদ ১৭৩
নাটোর ১১৩
'নায়িকাসাধনাটীকা' ১২৭
নারদ ১৬, ৩০
নারায়ণ ৩১
নারায়ণগঞ্জ ১১০, ১৪৫
নারায়ণ দাস ৭৫
নারায়ণ পাল ১০
নিত্যানন্দ অবধূত ৩৫, ৩৭, ৫৪, ৭৫-৮০, ৮৭, ৯১, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১৪৩, ১৭০
নিত্যানন্দ (জমিদার) ১১১
নিত্যানন্দ দাস ৮৬, ৯০-৯১, ১০০
'নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার' ৭৯, ১১০
নিমদা ৮০
নির্মলকুমার বসু ১৬৭
নিমাইতীর্থ ১০১
নিমানন্দ দাস ১৬০
নিমি খান্‌কি ১৩৯
নিম্বার্ক ১১, ৩০, ১৩৯
'নিষ্পন্ন যোগাবলী' ১৫
নীহাররঞ্জন রায় ১৫১
নৃসিংহ ভাদুড়ী ৭৪
নৃসিংহ মিত্র ১৫৯
নৃসিংহপুর ১০৪
নৃসিংহপূজন ১০
নেড়ানেড়ী ৭৯, ১১০
নৈহাটি (বর্ধমান) ৮০
নৈহাটি (মেদিনীপুর) ১০৪

পঞ্চতত্ত্ব ৯৩
পঞ্চশাখা ৪৭-৪৮, ৬৫
পঞ্চোপাসনা ৯-১০, ১৪-১৫
পটাশপুর ১০৫
পড়ুয়া ৩৯, ৫৪
'পদকল্পতরু' ১১৫, ১৬০
'পদমেরু' ১৬০
'পদরত্নাকর' ১৬০
'পদরসসার' ১৬০
পদাবলী কীর্তন ১৫৬-১৬২
'পদামৃত সমুদ্র' ১১৬, ১৬০
পদ্মনাভ চক্রবর্তী ১১১
'পদ্মপুরাণ' ১৪, ৩০, ১২৫
পদ্মাবতী ১৫১
'পদ্যাবলী' ১৩, ৩৩-৩৪, ৫৩
'পণ্ডিত মশাই' ১৪৫
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ৬৭
পরমেশ্বর দাস ৭৮, ১০২
পরিকরদের জাতি ৩৪
পরিণামবাদ ৬৩
পাঁচেত ১০৫
পাঞ্জ শাহ ১৩৯
পাটনার বাজার ১১৫
পাতিব্রত্য ২৩
পাথরাঘাটা ৮০
পাথুরা হাজোং ১০৮
পাদ্রি ওয়ার্ড ১৩৯, ১৭১
পানাগড় ১২১
পানিহাটি ৭৮-৮০
পানুঙা গোপাল ১২৪
পাণ্ডুয়া ১০১
পাবনা ১১৪
পালং ১১১
পালসিট ৯৭
'পাষণ্ডদলন' ১৪৭
পাহাড়পুর ৯
পিপিতকী ব্রত ২১
পীতাম্বর দাস ১০০, ১৫৯
পুরন্দর পণ্ডিত ৭৮
পুরী ১১, ৩৯, ৪৩-৫০, ৪৬-৪৭, ৫৩, ৭৪, ১৪০
পুরুষোত্তম দেব ১৩
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ৭৫
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ৬২-৬৩
প্রটেস্টান্ট ধর্মান্দোলন ৩৪
প্রতাপরুদ্র দেব ১৫, ৪৭
প্রতাপাদিত্য ১১২
প্রথম রজনীর বিধি ১০৫
'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ১১
প্রভু জগদ্বন্ধু ১৫৮, ১৬১
প্রয়াগ ৫৩
'প্রাকৃতপৈঙ্গল' ১৫১
প্রাণনাথ রায় (রাজা) ১১৪
প্রিয় দাস ৭১
প্রেমদাস ১২০-১২৪
প্রেমতলা ১৪৫
'প্রেমবিলাস' ৮৬, ৮৯-৯১, ১০৩, ১১৩
'প্রেমতাবিলাসবিবর্ত' ৪৪
'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ৮৯, ১৩২
'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব' ১২৪

ফরিদপুর ১১১
ফুরশাইল গ্রাম ১৩৫
ফৌজদার ১৪৪
ফ্রান্সিস বুকানন্ হ্যামিলটন্ ১১৪
ফ্রেডারিক এস, গ্রোউস্ ৭২

বংশীদাস ১৬৩
বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় ১২২
'বংশীশিক্ষা' ১২০-১২৪
বক্রেশ্বর (পণ্ডিত) ১৪৩
বঙ্কিমচন্দ্র ১২, ১৭৪
বঞ্চিত ঘোষ ১০৮
'বঞ্চিতচরিত্র' ১০৮
বগুড়া ৯, ৭৫, ১১৪
বজ্রযোগিনী ১০
বড়কোলা ১০৪
বড়গাছি ৮০
বড়তলার ঈশ্বর জীউ ১৪০
বড়নগর ১৭৩
বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাস ১৭, ১৮, ১৫৩-১৫৪
বড়ু ঠাকুর ১২১
বর্ধমান জেলা ১৮, ৭৫, ৮০, ৯৬-১০১, ১৪৩
বর্ধমানের শ্রীপাট ১০০
বনমালী (কবি) ১৩
বনমালী কবিচন্দ্র ৭৫
বনমালী চট্ট ১১৩
বরাহনগর ৮০
বরাহ অবতার ৯, ১০
'বর্ণরত্নাকর' ১৫২
বলদেব রিদ্যাভূষণ ৬১, ৬৫

বলরাম ৭৮
বলরাম জীউ ৯৯
বলরাম দাস (উড়িষ্যার কবি) ৪৫
বলরাম দাস (পদকর্তা) ৮৮
বল্লভ (কবি) ১১৪
বল্লভপুর ১০১
বল্লভাচার্য ৩৫, ৭১, ১৭০
বল্লাল সেন ১০, ১৪
বলাগড় শ্রীপাট ১০৩
বলিহার ১১৩
বসন্ত রায় ১১২
বসুধা দেবী ৭৮
বাঁকুড়া ৯
বাঁশবেড়িয়া ১০১, ১৭৩
বাগড়ি ১০৫
বাগবাজার ১০২, ১৪৫
বাঘাউড়া ৯
বাঘনাপাড়া ১২০
বাণীগ্রাম ১০৯
বাণীদীঘি ৮০
বাবাজী গোপালদাস ১০০
বামন অবতার ৯
বারাণসী ১৭০
বালকদাস বাবাজী ১১২
'বাল্যলীলাসূত্র' ১০৮
বাসু খাঁ ১০২
বাসুদেব ৮৯
বাসুদেব ঘোষ ৭৮, ১৩১, ১৫৬-১৫৭
বাসুদেব সার্বভৌম ৩৩, ৩৪, ৪৫-৪৬
বাহাদুরপুর ১১১
বিক্রমপুর পরগণা ১০, ১১০-১১১
বিজয় সেন ১১
বিজুর গ্রাম ৯৭
বিথংগল-আখড়া ১৩৫
'বিদগ্ধমাধবম্' ৫৩
বিদ্যাপতি ১৫, ১৬, ১৫২-১৫৩
বিনয়কুমার সরকার ২৬, ১৫৭
বিনু সিংহ ১১৪
বিপিনচন্দ্র পাল ১৪৬
বিপ্রদাস ২১
বিবর্তবাদ ৬৩
'বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ' ১২৬-১২৯
বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী ৮৩
'বিমলপ্রভাটীকা' ১৪
বিমানবিহারী মজুমদার ৮৫, ১২৪
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৬৫, ১১৫, ১৫৯
বিশ্বম্ভরানন্দ দেব ১৩৩
বিষ্ণুক্রান্তা ২০
বিষ্ণুদাস ৮৯
বিষ্ণুদাস আচার্য ৮৮
বিষ্ণুধর্ম ১৪
বিষ্ণুধর্মোত্তর ১৪
বিষ্ণুপদী ভজন ১৬৩
বিষ্ণুপুর ৮৭
বিষ্ণুপুরী ৩০
বিষ্ণুপূজা ১০
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ৪৩, ৬৬, ৯৩, ১০১
'বীজক' ১৭০
বীর হাম্বীর ৮৭, ১৩২
বীরচন্দ্র মাণিক্য ১০৯
বীরভদ্র ৭৯, ৮৭, ৮৯, ১০২, ১১০, ১৩৪, ১৬২
বীরভূম ১৫৯
বৃন্দাবন ৫২-৫৪, ৬৩-৬৪, ৭১-৭৪, ৮৩, ৮৬, ৯১, ৯৭, ১০৩, ১৪০, ১৫৬, ১৬২
বৃন্দাবন দাস ১৮, ২০, ২২, ২৫, ৩৫-৩৬, ৫৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৫, ৮৮, ১৫৬
বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ৫২-৫৪
'বৃহৎ তন্ত্রসার' ২০
'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ১৪, ২৩
'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' ৫৩
'বৃহৎ ভাগবতামৃতম্' ৫৩
'বৃহন্নারদীয়পুরাণ' ১৪
বুদ্ধদেব ১০, ৪৭
'বেদবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত রহস্য' ১৪
বেলতলী ১১১

বেলমুড়ি ১০২
বেলাভা লেখ ৯
বৈঁচি ১০১
বৈদ্যবাটি ১০১
বৈষ্ণব উপপুরাণ ১৩, ১৪
বৈষ্ণব দাস ১১৬, ১৪৭
ব্যাসাচার্য ৮৭-৮৮
ব্রজধাম ৭১
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ১২-১৪
'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' ১৪

ভক্ত প্রহ্লাদ ১০
ভক্তানন্দ ১১৬
ভক্তি ৩০-৩৪, ৫৮-৫৯
'ভক্তি চন্দ্রিকাপটল' ৯৮
'ভক্তিমার্তণ্ড' ৩০
'ভক্তিরত্নাবলী' ৩০-৩১, ৩২
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ৩০, ৫৩, ১৫৪
'ভক্তিসন্দর্ভ' ৩০
'ভক্তি রত্নাকর' ৮৬, ১৩৩, ১৬০
'ভগবদ্ভক্তিরসায়ন' ৩০
ভগবানগোলা ১১৬
ভগবানদাস বাবাজী ১০৩
ভঞ্জন অধিকারী ১০৫
ভঞ্জভূম ১০৫
ভবানন্দ ১০৯
'ভবিষ্য পুরাণ' ১৪
'ভবিষ্যোত্তর' ১৪
ভরতপুর ৭৩
'ভাগবতপুরাণ' ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ৩০-৩২, ৩৫, ৬১, ৬৩-৬৫, ১২৫
'ভাগবতপুরাণ' (উড়িয়া ভাষায় রচিত) ৪৭
'ভাগবততত্ত্ব মঞ্জরী' ১৪
ভাগবত মতবাদ ১০
ভাগলপুর লেখ ১০
ভাগ্যকুল ১১১
ভাটপাড়া-কলাগাছি ১১২
ভানুদত্ত ১৫৯
'ভাবনাসারসংগ্রহ' ৯৩
ভারতী সম্প্রদায় ৪২
ভিখনলাল ঠাকুর ১১০
ভীমধন ভুইঞা ১০৫
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৫
ভেক-গোসাঁই ১৪৪
ভেটে ৯৭
ভোজবর্মণ ১০

মগরা ১০২
মঙ্গলচণ্ডী ১৩৮
মঙ্গল ঠাকুর ৮৮, ১৫৯
মঙ্গলডিহি ১২৪-১২৫
মঞ্জরীতত্ত্ব ৯১-৯২
মতিলাল ঘোষ ১১২
মথুরদেব আচার্য ১৩৯
মথুরা ৭২
মদনগোপাল গোস্বামী ১৩৪
মধুপুর ১০৯
মধুবনগড় ১১০
মধুসূদন সরস্বতী ৩০
মনসা ২১, ১৩৮
'মনসাবিজয়' ২১
মনোহরচন্দ্র রায় ১০৩
মনোহরশাহী কীর্তন ১৫৮-১৫৯
'মন্ত্রচূড়ামণি' ১১৯
মন্দারিণী কীর্তন ১৫৯
মম্মট ভট্ট ১৫৯
ময়না (মেদিনীপুর) ১০৫
ময়নামতি ১০
ময়মনসিংহ ১০৯, ১৪৩, ১৭১
ময়ূরভঞ্জ ১০৫
মল্ল রাজা ৮৭
মল্লসারুল লেখ ৯
মহান্ত ১৩১-১৩২
মহাস্থানগড় ১১৪
মহেশ্বর দাস ১০১
মাতসর গ্রাম ৯৭
মাধব ৮৯
মাধব (কবি) ৩৩

মাধব ঘোষ ১৩১
মাধব দাস ১০৮
মাধব মিশ্র ১০৯
মাধবেন্দ্র পুরী ৩৫, ৪২, ৭৪, ৭৬
'মাধবমহোৎসবম্' ৫৩
মাধাই ২৫, ৩৭
মানিকগঞ্জ ১১০
মান্দা গ্রাম ১১৩
মামু ঠাকুর ১১১
মায়াবাদ ৪২, ৬২-৬৩
মালখানগর ১১১
মালদহ ৭৫, ১১৩
মালসা ভোগ ১৪৪
মালিহাটি ১১৫
মাহেশ ৮০, ১০১-১০২
মিত্র-মুস্তাফি পরিবার ১০৩
মিথিলা ১৫, ১৬, ১৫২
মীন অবতার ৯
মীনকেতন রামদাস ৮৮
মুকুন্দ ১৫৪
মুকুন্দ সরকার ৯৯
'মুক্তাচরিত্রম্' ৫৩, ৬৮
মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ১১০-১১১
'মুরলিবিলাস' ১২১, ১২৪
মুরারিচৈতন্য ৭৮
মুর্শিদাবাদ ৬৫, ৮৬, ১১৫-১১৬, ১৭৩
মুস্তাফি পরিবার ১০৩
মুহম্মদ এনামুল হক ২৭
মুহম্মদপুর ১১২
'মূলমাধব' ৬৪
মৃগা গ্রাম ১০৯
মৃদঙ্গবাদক দেবীদাস ১৫৮
মেজর রেনেল্ ১০১
মেছুয়াবাজার ১৩৯
মেদিনীপুর ১০৩-১০৫, ১৪৩
মেল্‌ভিল, কেনেডি ১৪৯
মেহার গ্রাম ১১২
মোক্ষলাভের স্তর ৬১
মোতিঝিল ১১৬
মোম্‌তাজুর রহমান তরফদার ২৮
'মোহান্তসুরতক্ষমা' ৬৮
ম্যাকস বেবর ১৩৬, ১৪৮

যদুনন্দন ৮৬, ১০০, ১৫৬
যদুনন্দন আচার্য ৭৫
যদুনাথ সরকার ৫৪, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪
যবন হরিদাস ৪৬, ৭৪, ৯৭, ১১২
যশড়া ১৪৩
যশোদল গ্রাম ১০৯
যশোহর ৫২, ৮০, ১১১-১১২
যশোহর-সমাজ ১১২
যাদবচন্দ্র গোস্বামী ১৪০
'যামল' ১১৯
যোগমায়া ৬৪
'যোগিনীতন্ত্র' ১১৪
যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩৪, ১৭২

রংপুর ১১৪, ১৪৩
রঘুনন্দন ২১
রঘুনন্দন গোস্বামী ১০০
রঘুনন্দন (শ্রীখণ্ড) ৯৭, ৯৯, ১৫৯
রঘুনাথ (সহজিয়াগুরু) ১২৭
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ৫২-৫৩, ৫৫, ৬৭-৬৮, ৭৯-৮০, ১০১
রঘুনাথ বৈদ্য ৭৮
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ৫২-৫৩, ১৬২
রঘুনাথ ভট্টাচার্য ১৩৫
রণবঙ্কমল্ল ১০
রবীন্দ্রনাথ ৬১, ১৭০
রবীন্দ্রনারায়ণ রায় ১১৩
রয়নী ১০৩
রস ৬০-৬১
'রসকদম্ব' ১১৪, ১২৫-১২৬
'রসকল্পবল্লী' ১৫৯
'রসগঙ্গাধর' ৬৭
রসরাজ কৃষ্ণ ১২২
'রসিকমঙ্গল' ৮৬, ১০৩
রসিকবিহারী ১২৭

রসিকানন্দ ৮৭-৮৮, ১০৩-১০৫
'রসিকপ্রিয়া টীকা' ১৫১
রসুনিয়া গ্রাম ১১১
রাউতভোগ গ্রাম ১১১
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫, ১৭৩
রাগ রাগিণী (বিদ্যাপতির পুথিতে) ১৫৩ ; ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ) ১৫৪
রাগানুগা ভক্তি ৫৯
রাঘব পণ্ডিত ৭৮
রাজধর মাণিক্য ১০৯
রাজশাহী ১০, ১১৩, ১৪৮
রাজা গণেশ ২৫
রাজা তিলকচাঁদ ১০১
রাজ্যধর রায় ১০৫
রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৬২
রাঢ় ১০, ১১
রাণা কুম্ভ ১৫১
রাণা রাজসিংহ ৭৩
রাধা ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ৪৭, ৬২, ৬৫-৬৬, ৮৪
রাধাকৃষ্ণ ৪১, ৪৩, ৬২, ৭, ৯১
রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী ৬৪, ৮৪
রাধাগোবিন্দ নাথ ৪৪, ৪৮, ৪৮, ৫৫, ৬৪, ৮৬
'রাধাতন্ত্রম' ১১৯
রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ১৬৩
রাধামাধব ঘোষ ১০২
রাধামোহন (বাউল কবি) ১৩৫
রাধামোহন ঠাকুর ১১৩, ১১৫, ১৫৮-১৫৯
রাধারমণ ঘোষ ১০৮, ১০৯
রাণী ভবানী ১১৩-১১৪
রাণী হেমন্তকুমারী ১০৯
রাম ঠাকুর ৭১
রামকানু গোস্বামী ৯৯
রামকৃষ্ণ ১২১
রামকৃষ্ণ গোস্বামী ১৩৫
রামকৃষ্ণ রায় ১১৪
রামকেলি ১৭, ৫২, ১১৩, ১৪৫
রামগোপাল দাস ১০০, ১৫৯
রামচন্দ্র ১২১
রামচন্দ্র কবিরাজ ৮৭, ১১৫, ১৫৯
রামচন্দ্র খান ৮০, ১১২
রামচন্দ্র গোস্বামী ১৪৭
রামচন্দ্র পুরী ৪৪-৪৫, ৪৬
রামদাস ১০৮
রামানন্দ বসু ১৩১
রামানন্দী বৈষ্ণব ১১৪
রামানন্দ রায় ৪৩-৪৪, ১৩১
রামানুজ ১২
রামানুজ সম্প্রদায় ১০৩
রামেশ্বর ১০৫
রাসলীলা ১১৪
রিজ্‌লি ১৪৩-১১৪, ১৪৬, ১৭০-১৭১
রুদ্রাণী গ্রাম ১০২
রুক্‌নুদ্দীন বর্‌বক্ শাহ্ ১৮
রূপ কবিরাজ ৬৫
রূপ গোস্বামী ১৩, ৩০, ৩২, ৫২-৫৩, ৫৫, ৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭১-৭২, ৭৩, ৮৬, ১১১, ১৩৪, ১৫৯
রূপচাঁদ গোঁসাই ১৩৯
রেনেসাঁস ১৭৪-১৭৫
রেবতী ৭৮
রেবতীমোহন সেন ৬৩
রেভারেন্ড জেম্‌স্ লং ৯৭
রেমুণা ৮৭

লক্ষ্মণ সেন ১৩, ১৪
লক্ষ্মী ২১
'লঘুভাগবতামৃতম্' ৫৩
'ললিতমাধবম্' ৫৩
লাউড় ৩৪
লাউপালা ১১২
লালগোলা ১১৬
লালন ফকির ১৩৯
লাল শশী ১৩৯
লিণ্ডা হেস্ ১৭০
লীলাকীর্তন ১৫৮-১৫৯
লীলাশুক ১৫২

লোকনাথ গোস্বামী ৮৬, ১১১
লোকনাথ দাস ৭৫
লোকানন্দ আচার্য ৯৮
লোচন দাস ৭৫, ৮৪, ৮৮, ৯৩, ৯৮, ১০০, ১৫৬, ১৫৭
লৌহজং ১১১

শঙ্কর দেব ১৫
শঙ্কর মিশ্র ১৫১
শঙ্করাচার্য ৪২, ৬২-৬৩
শচী দেবী ৪৩, ১১১
শনি ১৩৮
শবরোৎসব ২১
শম্ভুচাঁদ ১৩৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪৫
শরৎচন্দ্র রায় ২১
শশধর তর্কচূড়ামণি ১১১
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১২৮
শশিমোহন স্মৃতিভূষণ ১৩৫, ১৩৮
শশিশেখর ১০০
'শাখানির্ণয়' ৫৫
শাণ্ডিল্য ৩১
'শাণ্ডিল্য সূত্র' ৩০
শান্তিপুর ৩৪, ৩৮, ৭৫, ১০৩
শালডাঙ্গা মনসরপুর ১২৯
শায়েস্তা খান ১০৩
শিখরভূমি ৮৭
শিব ৬৩, ১৩৮
শিবচন্দ্র বাহাদুর ১৭১
শিবানন্দ সেন ১৩১
'শিবায়ন' ১০৫
শিয়াখালা ১০১-১০২
শিয়ালদি গ্রাম ১১১
শিশিরকুমার ঘোষ ১১২
শিশু কৃষ্ণদাস ১১২
শীতলা ১৩৮
শীতলা গ্রাম ৯৭
শূদ্রযাজী ২৩
'শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্' ২৩

শূলপাণি ২১
শেওড়াফুলি ১০৩
শের খাঁ ১০৩
শ্যামকিশোর ঘোষ ১৩৫
'শ্যামচন্দ্রোদয়' ১২৪
শ্যামচাঁদ-পরিবার ১৪৩
শ্যামসুন্দরপুর ১০৪
শ্যামাদাস আচার্য ৯৭
শ্যামানন্দ ৮৬-৮৭, ৮৮, ১০৩-১০৫
শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ১০৫
শ্রীকর ভুইঞা ১৩৫
'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' ১৫২
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৭-১৮, ১৫৩-১৫৪
'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' ৫৩
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার ২৩৫
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ১৮, ৯৬-৯৭
'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্' ১১৫
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ১০৩
'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' ১২৬
শ্রীচৈতন্য ১৫, ১৬, ২০-২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৪, ৩৫-৩৬, ৩৮-৩৯, ৪১-৫০, ৫২, ৫৫, ৬২, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৮-৮৯, ৯২, ৯৩-৯৪, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৮-১০৯, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩৫, ১৪৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৬, ১৭০
শ্রীদেবী ৭৪
শ্রীধর ৭৫
শ্রীনগর গ্রাম ১১১
শ্রীনিবাস আচার্য ৮৬-৮৭, ৮৮, ১০২-১০৩, ১০৫, ১১৩, ১১৫, ১৩১, ১৫৮, ১৬২
শ্রীমতী গোয়ালিনী ১৩৯
'শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্' ৫৪
'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ৫৪-৫৭, ৬৫, ১৬৩
'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমধর্ম' ১১১
'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' ৫৫

'শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা' ১৪৭
'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দচরিতম্' ১০৫

'ষট্‌সন্দর্ভ' ৫৩

'সংকীর্তনামৃত' ১৬০
'সখীচরণের কথা' ১৪১
সচ্চিদানন্দ ভারতী ১০৩
সত্যানন্দ সরস্বতী ১০২, ১০৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৭৩
'সদুক্তিকর্ণামৃতম্' ১৩
সনাতন আউলিয়া ১০০
সনাতম গোস্বামী ২৬, ৫২-৫৩, ৫৫, ৭১, ৭২, ৮৬, ১১১, ১৩২
সনাতন মিশ্র ১০১
সন্তোষ দত্ত ৮৭
সন্ধ্যাভাষা ১৫২
সপ্তগ্রাম ৭৯-৮০, ১০১
'সর্বোল্লাসতন্ত্রম্' ১১৯
সহজযান ১০
সহজিয়া-বৈষ্ণবতা ১০, ১২৬-১২৯
'সাধনাদীপিকা' ৬৪, ৮৪
'সাধনামৃতচন্দ্রিকা' ৯৩
'সাম্বপুরাণ' ১৪
সালোক্য ১০
সিরাজ সাঁই ১৩৯
সীতা দেবী ৭৪, ১১৬
'সীতাগুণকদম্ব' ৭৫
'সীতাচরিত্র' ৭৫
'সীতারাম রায় ১১২
সুকুমার সেন ১৫, ২১, ১৭১, ১৭৪
সুখাড়িয়া ১০৩
সুধারাম বাউল ১৩৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩, ২১, ২৫
সুন্দরানন্দ গোপাল ১২৪
সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ৬১
সুরা ৭৩
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১১, ৬২, ৬৩
সুলোচন সেন ৯৯
সুলোচনা ১৭১
সুশীলকুমার দে ৪২, ৫৬, ৭২
সুসং-দুর্গাপুর ১০৮
সূতিকা ষষ্ঠীব্রত ২১
সূফী ধর্ম ২৭
সূর্যদাস সরখেল ৭৮
সেন-রাজবংশ ১০, ১১
সেনহাটি (খুলনা) ১১৩
সৈদাবাদ ১১৫
সৈয়দ মর্তুজা ১৭২
সোনাগাছি ১৩৯
সোনাতলা ১১৪
সোনারং গ্রাম ১১১
স্ত্রীলোকের অধিকার ২৩-২৪
স্থায়ীভাব ৬১
স্বয়ম্ভুরাম দেব ১৩৯
'স্বরূপকল্পতরু' ১৪০
স্বরূপ দামোদর ৫৫, ১০২, ১০৯, ১৩১
'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' ৫৫

হরবোলা ১০৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২১
হরসুন্দরী দাসী ১৭১
হরি ঠাকুর ১২১
হরিচরণ ৭৫
হরিচরণ দাস ৭৫
'হরিচরিতকাব্যম্' ১৮
হরিট গ্রাম ১০৩
হরিদাস-চৈতন্য মঠ ৯৭
হরিদাস ঠাকুর ১২১
হরিদাস দাস ১০০
হরিনারায়ণ ১০৫
হরিনারায়ণ (রাজা) ৮৭
হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী ১১৬
'হরিবংশ' ১০৯
হরিবংশ সম্প্রদায় ৭১
হরিবল্লভ (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) ১১৫, ১৫৯
'হরিভক্তিবিলাস' ৫৩, ৭২, ৮৬, ১৩২
হরিরাম আচার্য ১১৫

হরিশ্চন্দ্র রায় ১১৩
হরেকৃষ্ণ গোস্বামী ১০৩
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯৩, ১৬৭
হরেন্দ্রনারায়ণ (রাজা) ১১৪
হলায়ুধ ১৪
হাঁসাড়া গ্রাম ১১১
হাজোং ১০৮
হাটিকুমরাইল ১১৪
হাতিয়াখণ্ড ৮০
হাতিয়াগড় ৮০
হালিসহর ৮০
হিরণ্য ১০১
হৃদয়চৈতন্য ৯৭, ১০৩-১০৪
হেতুবাদ ১৪
হেমলতা ঠাকুরাণী ৮৬, ১১৫-১১৬
হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৭১